তিন কুড়ি দশ

তৃতীয় খণ্ড

নতুন ভারত

১৯৪৮–৫৫

অশোক মিত্র



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

TIN KURI DASH (Part III)
A Biography by *Asok Mitra*
Dey's Publishing, 13 Bankim Chatterjee Street,
Calcutta 700 073

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৯৬০

প্রচ্ছদ : অপরূপ উকিল

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেশন্স
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪

নু-কে

যাঁর কাছে গত বাহান্ন বছর ধরে

দ্বিতীয় জোড়া চোখ ও কানের জন্য

আমি ঋণী

আর ভিন্নমত পোষণ করলে, নতুন আলো

ফেলতে যিনি কখনও দ্বিধা করেননি।

ভূমিকা

'তিন কুড়ি দশ'-এর প্রথম খণ্ড—প্রথম চব্বিশ বছর ১৯১৭-৪০—যখন ১৯৮৬ সালে লেখা শুরু করি, তখন কবি বায়রনের কথায় "কিছুই ভেবেচিন্তে শুরু করিনি, শুধুমাত্র একটু মজা করাই ছিল উদ্দেশ্য"। চুয়াত্তর বছর বয়সে যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড—স্বাধীনতার পথে ১৯৪০-৪৭ ও নতুন ভারত ১৯৪৮-৫৫—বাংলায় লেখা শুরু করি, তখন তাঁর মাকে লেখা গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের এই লাইনটি বারবার মনে হয়েছে: "আমার শরীর যতই তার যাত্রাপথে অগ্রসর হচ্ছে ততই আমার মন পিছনে ফেলে-আসা দিনগুলির মধ্যে ডুব দিতে চাচ্ছে"।

দুটি খণ্ড সম্পূর্ণ করার পর প্রকাশক মহাশয় প্রথমে দুটিকে একটি বই হিসাবে ছাপানোর কথা ভাবেন। সেই হিসাবে আমি সমগ্র রচনাটির জন্য একটি নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধ লিখি। সেটির সবটাই 'তিন কুড়ি দশ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেছে। অতএব সেই মুখবন্ধটি এই খণ্ডেও সমানভাবে প্রযোজ্য বলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত মনে করি।

এটি মুখ্যত আমার আত্মজীবনী। আত্মীয়-পরিজন, পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্যে দৈনন্দিন হাসিকান্না, ঠাট্টা, আড্ডার সঙ্গে আমার জীবনের প্রতি গ্রন্থিতে ভারতের ও বৃহত্তর জগতের ঘটনাবলী যেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে গেঁথে গেছে তারই ব্যক্তিগত বিবরণ এতে আছে। কালানুক্রমিক ঘটনাবলী যখন যে-ভাবে, যে-আলোয় দেখেছি তাই স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে লেখার চেষ্টা করেছি। পশ্চাদ্দৃষ্টি ও অধীত জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞ সাজার চেষ্টা করিনি। আমার স্মৃতিতে, মনে, চেতনায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে, জীবনদর্শনের উপর বৃহত্তর ঘটনাবলী ও তাদের সমসাময়িক প্রকাশ্য আলোচনা ও বোধ কিভাবে ছাপ ফেলে তাদের গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে, তারই নির্দেশ পাঠক এই খণ্ডে পাবেন। শেষ অধ্যায়টির শুরু দ্বিতীয় খণ্ডের উপসংহারের শুরুর অনুরূপ হলেও দেশভাগের কুফল কিভাবে পশ্চিমবঙ্গকে বিপর্যস্ত করে—এই বইয়ের উপসংহারে সেই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত বিচার ও মতামত পাঠক পাবেন।

আগের খণ্ডটির মত এই খণ্ডটিতেও শ্রীসুবীর ভট্টাচার্য বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিটি উক্তি, সন-তারিখ মিলিয়ে, ভুলত্রুটি আমার গোচরে এনে সংশোধন

করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রাথমিক ও সনিষ্ঠ সম্পাদনার জন্য আমি তাঁকে পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানাই। প্যাপিরাসের শ্রীঅরিজিৎ কুমারকে দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রীসুধাংশুশেখর দে এই খণ্ডের মুদ্রণের ভার অর্পণ করেন। অরিজিৎবাবু অতি সযত্নে, আমার যাবতীয় তাড়না ও আবদার হাসিমুখে সহ্য করে এই বইয়ের সৌকর্যসাধনে প্রবৃত্ত হন। স্নেহাস্পদ শ্রীঅভিজিৎ সেন মুদ্রণের সবকিছু ঝুঁকি, বারবার প্রুফ দেখা, নির্দেশিকা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি, নিজের স্বাস্থ্য ও অবসর উপেক্ষা করে, সম্পাদন করেন। এঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অশোক মিত্র

বিষয়সূচি

উল্লাসের বছর : ১৯৪৮

মালদা : প্রথম পরিচয়



দেশবিভাগের ফলে ভারতীয় রেলওয়ে ব্যবস্থার উপর আচমকা অসহ্য চাপ পড়ে। বিশেষত, যদি মনে রাখি ১৯৪৭ সালে সারা ভারতে, পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে, এমন-কি একই জেলার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সচরাচর চলনসই রাস্তার ব্যবস্থাও ছিল না। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের শিয়ালদা-দার্জিলিং লাইনে দুই বঙ্গের মাঝপথে, দর্শনা স্টেশনে, ছেদ পড়ে। ফলে এই রেলপথে কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারিদের পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গে যাতায়াত বন্ধ হয়। ১৯৪৮-এর ১৪ জানুয়ারি রাতে কিউলের ট্রেনে চড়ে পরের দিন ভোরে আমরা রাজমহল গিরিমালার কোলে গঙ্গার ধারে সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছলুম। তখনকার দিনে সাহেবগঞ্জ-কাটিহার পারাপারের কী অব্যবস্থা ছিল তা স্বচক্ষে যদি কেউ না দেখে থাকেন, তাঁর ধারণাই হবে না কী দৃঢ় সংকল্প ও ক্ষিপ্রতায় পূর্বভারত অঞ্চলে রেলওয়ে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি হয়।

সূর্যোদয়ের আগে ট্রেন থেকে নামামাত্র গঙ্গার বুক বেয়ে শীতের কনকনে হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিল। অথচ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, সূর্য ওঠার পর, গঙ্গার বুকে ও দু'ধারে যে বালির ঝড় উঠল তাতে, কী দেশে যাচ্ছি ভেবে বুক দমে গেল। যতদূর চোখ যায়, গঙ্গার বুকে দক্ষিণদিকে সীমাহীন চড়া। তার ধু ধু করা বালির উপর পারাপারের অপেক্ষায় যত্রতত্র পড়ে আছে নানা আকারের কাঠের বাক্সে ভরা মালপত্র। হঠাৎ অগুণতি যাত্রী ট্রেন থেকে নেমে অপেক্ষারত স্টিমারের দিকে ছুটল। সে কী হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি! সাহেবগঞ্জের স্টিমারগুলি গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ লাইনের আই-জি-এন স্টিমার, 'কিউই', 'পেলিক্যান'গুলির

তুলনায় আকারে নিতান্ত শিশু মনে হল। এই ডামাডোলের মধ্যে স্ত্রী আভা, মেয়ে জয়ন্তী, আমাদের আশ্রিত রাখাল, তার স্ত্রী সুশীলা, মেয়ে রেণুকে নিয়ে অসহায় অবস্থায় আমার যখন হাল ছাড়ার উপক্রম, তখন হঠাৎ মনে হল আমার দিকে তিনজন লোক হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। একজন নিজের পরিচয় দিলেন মালদার বড় নাজিরবাবু, অন্য দুজন মালদা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যক্তিগত আর্দালি : নাম, মজিদ আর তোজামল। নাজিরবাবুর হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম, নিঃশব্দে আমাদের মুস্কিল আসানের ভার নিলেন। সরু পাটাতনের উপর দিয়ে স্টিমারে ওঠার সময়ে, মজিদ জয়ন্তীকে কোলে নিয়ে সাবধানে স্টিমারে তুলে কেবিনে নামিয়ে দিল। দেশভাগের আগে কাটিহার থেকে যে লাইন ইংরেজবাজারে যেত সেটি মালদা পেরিয়ে রাজশাহীর গোদাগাড়িঘাটে গিয়ে শেষ হত। দেশভাগের পর মালদা পেরিয়ে মুচিয়া স্টেশনে যাত্রা শেষ করত, সমুখে আর এগোত না।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ কাটিহার থেকে মালদার ট্রেনটি ছাড়ল। কোন হৈ চৈ, হাঁকডাক না করে, প্রায় নিঃশব্দে সব কিছু অবলীলাক্রমে মজিদ আর তোজামল বালির চড়া থেকে স্টিমারে, স্টিমার থেকে গাড়ির কামরায় স্টেশনের কুলিদের সাহায্যে সুচারুভাবে চব্বিশটি বাক্স-প্যাঁটরা, বোঁচকাবুঁচকি গুছিয়ে রাখল, এত মাল সত্ত্বেও একটুও ঠাসাঠাসি হল না, বরং চলাফেরার অনেক জায়গা রইল,—তাতে আমরা দুজনে মনে বল পেলুম। কাটিহার-গোদাগাড়ি লাইনটি তখন আউধ-তিরহুত রেলওয়ের অন্তর্গত ছিল। কাটিহার থেকে ইংরেজ-বাজার পর্যন্ত পরপর রেলওয়ে স্টেশনগুলির নাম ছিল, কুমেদপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, ভালুকা রোড, কুমারগঞ্জ, একলাখী, আদিনা, নিমাসরাই (পুরাতন মালদা) আর মালদা, যার ডাকনাম ছিল ইংরেজবাজার।

দেশভাগের ফলে মালদা জেলা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে শেষ পর্যন্ত দুটি অসমান অংশে ভাগ হয়। সিরিল র‍্যাডক্লিফের দেশভাগসম্বন্ধীয় রায়ে স্পষ্ট লেখা ছিল না, মালদা শেষ পর্যন্ত কোনদিকে পড়বে : ভারতে না পাকিস্তানে। ফলে, ১২ থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত সমগ্র জেলাটি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রশাসনের অধীনে ছিল, এবং ১৪ অগাস্ট, অর্থাৎ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে, মালদা কালেক্টরেটের মাস্তুলে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা তোলা হয়। অবশেষে দুই পক্ষের চুক্তি অনুসারে ১৭ অগাস্ট এক পাকাপাকি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়, যার ফলে, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের অবিভক্ত মালদার পনেরোটি থানার মধ্যে দশটি

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়ে, বাকি পাঁচটি পূর্ব-পাকিস্তানে। ঐ পাঁচটি থানা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাদের নাম শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর। অবিভক্ত মালদার ২,০০৪ বর্গ মাইল আয়তনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের এখনকার মালদা জেলার ভাগে পড়ল ১,৪০৮ বর্গমাইল। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত যে দশটি থানা পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার ভাগে পড়ল তাদের নাম হল : হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা, রতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, মালদা, গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর। ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে, মালদা থেকে আমি চলে আসার বেশ কিছুদিন পরে বাগে ট্রাইবিউন্যালের রায়ের ফলে মালদা ও রাজশাহী জেলার নদীর সীমারেখার সামান্য কিছু অদল-বদল হয়।

দেশভাগের ঠিক আগে মঙ্গল আচার্য নামে এক ভদ্রলোক পাবনা জেলার এ-ডি-এম ছিলেন। পাবনা এখন বাংলাদেশের অন্তর্গত। ১৯৪৭-এর ১৭ অগাস্টের বিজ্ঞপ্তিতে এখনকার মালদা জেলাকে পশ্চিমবঙ্গে প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮ অগাস্ট মঙ্গল আচার্য মালদা কালেক্টরেটের মাস্তলে ভারতের পতাকা তোলেন। এই ধরনের হাতবদলের ফলে যে অনিশ্চয়তা ও আবর্তের সৃষ্টি হয়, ধীর, স্থির, শান্ত মাথায় শ্রীআচার্য, কোনরকম উত্তেজনা বা বিক্ষোভের অবকাশ না দিয়ে, সবকিছু তিক্ততার অবসান সুকৌশলে ঘটিয়ে, স্বাভাবিক পরিবেশ যেভাবে ফিরিয়ে আনেন, সে বিষয়ে চিন্তা করলে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও সাধুবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, উপরন্তু তাঁকে বলাও হয়েছিল তিনি অল্প কিছুদিনের জন্য থাকবেন। সুতরাং জেলাবাসীরা প্রথম থেকেই জানত তিনি অস্থায়ী, সুতরাং তাঁর পরে যিনি স্থায়ীভাবে আসবেন তার আশার অপেক্ষা করছিল। জেলায় সকলে জানত বড় নাজিরবাবু, মজিদ ও তোজামলকে নিয়ে নতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আনতে কাটিহারে গেছেন। ফলে, প্রতি স্টেশনেই ছোট-ছোট দল এসে হাজির, নতুন ম্যাজিস্ট্রেট কী ধরনের জীব স্বচক্ষে দেখার কৌতূহলে। মজিদ, তোজামলই ছিল জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের পরিচয়চিহ্ন, সুতরাং তাদের যে জানলায় দেখা যাবে, ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চয় সে কামরায় থাকবেন। দর্শন দিতে আমার পক্ষেও অবশ্য কোন কার্পণ্য ছিল না।

ইংরেজবাজারের স্টেশনেও এইরকম কয়েকটি দল স্বাগত জানাতে হাজির ছিল। এখানেও মজিদ যার তোজামল নিঃশব্দে, সুশৃঙ্খলে সব মালপত্র সযত্নে

অল্প সময়ের মধ্যে নামিয়ে নিল। স্টেশন-সংলগ্ন মহানন্দা নদীর উপর একটি খেয়া পার হয়ে আমরা একটি ধড়ধড়ে জীপে উঠে সার্কিট হাউসে গেলুম। সেচবিভাগের এঞ্জিনিয়ার বিশ্বেশ্বর মৈত্রের সঙ্গে আমাদের আগে থেকে পরিচয় ছিল। যেদিন পৌঁছব সেদিন দুপুরে তাঁদের বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করে আগে থাকতে লিখেছিলেন ; তাঁর বাড়ি গেলুম বেলা সাড়ে বারোটায়।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আলাদা বাড়ি ছিল না। সার্কিট হাউসেরই একদিকটা ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য আলাদা করা : একতলা, তবে বেশ বড় ও প্রচুর খোলা জায়গা। চিরাচরিত সরকারি-প্ল্যানে তৈরি। পূর্ব ও পশ্চিম দু'দিকে নিচু ভিতের উপর বাড়িটির লম্বাদিক ধরে একটি করে সমুখে খোলা ঢাকা বারান্দা, বাড়িটি পূর্বমুখী। পুবদিকের সমুখের চওড়া বারান্দা পেরিয়ে ঢুকতেই সমুখে বেশ বড় বসার ঘর, তার ঠিক পিছনে অর্থাৎ পশ্চিমে ঐ আকারেরই বড় খাবার ঘর। বসার ও খাবার ঘরের দক্ষিণদিকে দু-পাশে দুটি দুটি করে চারটি মাঝারি সাইজের থাকার ঘর ; তাঁদের প্রতিটির সঙ্গে একটি অফিসঘর, একটি শোবার ঘর, একটি পোশাক পরার ঘর, আর দুটি স্নানের ঘর। রান্নাবাড়ি ছিল আলাদা। তাতে ছিল দুটি রান্নাঘর, আর লোকজনের থাকার ঘর। বাড়ির উত্তরভাগে পরপর ও পাশাপাশি আরো যে-চারটি ঘরের কথা বলেছি সেগুলি ছিল সার্কিট হাউসের অংশ, অর্থাৎ গণ্যমান্য কর্মচারি বা মন্ত্রীস্থানীয়রা এলে সেখানে থাকতেন। মন্ত্রীদের কেউ একসঙ্গে অনেকের সাথে দেখা করতে চাইলে আমি বড় বসার ঘরটি ছেড়ে দিতুম।

বাড়িটির চারদিক ঘিরে ছিল অনেক খালি জমি, সবটি চতুষ্কোণ বুক-সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পুবমুখো বাড়ি, সেই কারণে পাঁচিলের প্রধান গেটও বাড়ির মাঝবরাবর পুবদিকে। দেয়ালের বাইরে, গেটের পরেই প্রকাণ্ড একটি মাঠ, তার উপরে বছরে একবার হত জেলার হাতিদের দৌড়, আর বাইরে থেকে ফুটবলের দল এলে, খেলা। মাঠ পেরিয়ে, আরো পুবদিকে ছিল মহানন্দা নদীর বাঁধ, উত্তর-দক্ষিণ বরাবর মহানন্দার তীর ধরে চলে গেছে। সার্কিট হাউসের হাতায় কয়েকটি বড় বড় সুদৃশ্য গাছ ছিল, তাদের শিরোমণি ছিল একটি আম গাছ, নাম বৃন্দাবনী। যেমন তার বয়স আর নয়নাভিরাম শাখাপ্রশাখা তেমনি ছিল তার পাতার বাহারে ঘেরা ছাতার মত গোল মাথা। পুবের হাতার গেট দিয়ে বাঁয়ে উত্তরে যেতে হত কালেক্টরেট দপ্তরে। পশ্চিমের গেটটি পড়ত উত্তর-দক্ষিণ-বরাবর শহরের প্রধান রাস্তায়। রাস্তার ওপারে পশ্চিমে-উত্তরে ছিল আসল

শহর। সার্কিট হাউসের দক্ষিণে, বড় রাস্তার পুবদিকে, ছিল বড় বড় খেলার মাঠ, এই মাঠের উপরই পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নতুন বাড়ি হয়। 'বিনয়রঞ্জন সেন প্রত্নতত্ত্বাগার' ছিল এইখানে। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন প্রমথনাথ মিশ্র, জাতিতে মালদার প্রক্ষিপ্ত মৈথিল ব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত ও নিবেদিতপ্রাণ, কালেক্টরেটটি ছিল আঠারো শতকে তৈরি রেশম কুঠিবাড়ি। রেশমকুঠিটি পর্তুগীজ স্থাপত্যরীতি ও প্ল্যানে তৈরি।

যেদিন ইংরেজবাজার পৌঁছলুম, সেদিন কাজের ভার নিইনি। দুপুরে বিশ্বেশ্বর মৈত্রের বাড়ি খাবার পর স্বভাবতই আমার কাজকর্ম কিছু ছিল না। কালেক্টরের গাড়ির মধ্যে ছিল যুদ্ধত্যক্ত তিনটি ভগ্নপ্রায় আমেরিকান ওয়েপন ক্যারিয়ার আর একটি ঠকঠকে জীপ। সূর্যাস্তের তখনও ঘণ্টা আড়াই বাকি। অতএব একটি ওয়েপন ক্যারিয়ার বার করিয়ে আভাকে আর জয়তীকে পাশের সীটে আর পিছনে চাপরাশি মজিদ, তোজামল আর ড্রাইভার যতীন দাসকে বসিয়ে আমি চালক হয়ে রাস্তায় উঠে, দক্ষিণে গৌড়ের দিকে চললুম। তখন প্রায় তিনটে বাজে। নামেমাত্র রাস্তা, কারণ সারাবছর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় ক্রমাগত গরুরগাড়ি চলে চলে সারা রাস্তা গভীর নালার মত সমান্তরাল কাটাকুটিতে ভর্তি। উপরন্তু খাঁজকাটা নালিগুলি এত গভীর, ফলে মধ্যের আলটি এত উঁচু যে একটু অসাবধান হয়ে চালালেই জীপের চাকা গর্তে পড়ে যাবে, তখন জীপ ধরে তুলে সমান জমিতে রাখা দুষ্কর কাজ হয়। বিশেষত গাড়ির যদি ডিফারেন্সিয়াল গর্তে ঢুকে যায়। এইসব গর্তের মাঝে মাঝে ছিল বিরাট বিরাট বালির ও ধুলোর গভীর দহ, সময়ে সময়ে এত গভীর যে জীপের তো বটেই, এমন-কি ওয়েপন ক্যারিয়ারের চাকা ডুবে গিয়ে গাড়ি উদ্ধার করা দুষ্কর হত। উদ্ধার পেতে হলে স্থানীয় লোকজন ডেকে, অনুনয়-বিনয় করে তাদের দিয়ে কসরৎ করিয়ে ও সেইসঙ্গে এঞ্জিন চালিয়ে চেষ্টা করাই ছিল একমাত্র উপায়। বর্ষাকালে আবার যেখানে এঁটেল মাটি হত সেখানে একটুতে গাড়ি এমন পিছলে যেত যে রাস্তার ধারে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগত।

সেদিন বিকালে গৌড়ের পথ ছেড়ে ফারাক্কার সড়ক ধরে কয়েক মাইল চলার পর একটি বড় ঘনবসতির গ্রামে পৌঁছলুম। রাস্তায় দুধারের বাড়িগুলি থেকে আসছে খটাখট তাঁত চলার আওয়াজ, তার সঙ্গে বড় বড় চরকায় রেশম সুতো পাকানোর ঘরর ঘরর শব্দ। মজিদ বলল গ্রামটির নাম সুজাপুর, কালিয়াচক

থানার মধ্যমণি, রেশমের গুটি চাষ, রেশমের সুতো তৈরি ও রেশমের কাপড় বোনার জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রামটি দেখলেই মনে হয় বেশ বর্ধিষ্ণু। মজিদ বলল দুর্ধর্ষতায় বিখ্যাত শেরশাবাদিয়া মুসলমানদের ঘাঁটি। শেরশাবাদিয়াদের পূর্ব-পুরুষরা ছিল পাঠান বাদশা, শেরশাহের নিজস্ব ফৌজ। গৌড় জয়ের পর আদিনা প্রতিষ্ঠা করে সারা কালিয়াচক, মানিকচক, শিবগঞ্জ অঞ্চলে গঙ্গার ধার ধরে সমস্ত উর্বর দোআঁশ জমিতে চাকরাণ সত্ব দিয়ে তাদের পত্তন করে যান। গ্রামের মধ্যস্থলে রাস্তার চৌমাথায় জীপ থামালুম। গ্রামটি ঘুরে দেখার ইচ্ছায় বাঁ-দিকে চেয়ে দেখি একটি বড় বাড়ি, বর্ধিষ্ণু ঘর মনে হল। মজিদকে বললুম, চল ঐ বাড়িতে যাই। বলে রাস্তা থেকে গাড়ি নামিয়ে যেই ওদিকে যেতে শুরু করেছি, মজিদ ও তোজামল যেন প্রমাদ গুণে হাঁ হাঁ করে বারণ করার গলায় বলল, বাড়ির মালিক ১৭ অগাস্টের রায় অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে মালদার আসার বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালায়। মজিদ বলল, ঐ যে দেখছেন পতাকার মাস্তুল, এর মাথায় ২১ অগাস্ট অবধি পাকিস্তান পতাকা উড়েছিল; পুলিশ সেটি নামাতে গিয়ে শূন্যে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়। একজনের বেশী অবশ্য হতাহত হয়নি।

ইতিমধ্যে আমার গাড়ি বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছে গেছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখি ঘরে তক্তপোষের উপর লম্বাদাড়িওলা একজন কর্তাব্যক্তি লোক। প্রকাণ্ড মাথা, শক্ত শরীর। একই গড়নের, প্রায় একই ধরনের দেখতে, আরো কয়েকজন লোক, ভদ্রলোককে ঘিরে তক্তপোষে বসে আলাপ করছে। ঐটি তাহলে বৈঠকখানা ঘর। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার চরের মাতব্বরদের কথা মনে পড়ে গেল। গৃহস্বামী ও তাঁর পার্শ্বচরদের ত্রস্ত সংকুচিত হাবেভাবে মনে হল ঘরের ভিতর চট্ করে লুকোতে পারলে অথবা দরজা দিয়ে ছুটে পালাতে পারলে বাঁচে। আমার গায়ে তখন একটি আমেরিকান খাকির মোটা ফৌজি জার্কিন, দূর থেকে মনে হতে পারত আমিও ফৌজি লোক, শরীরটা গাঁট্টাগোট্টাই ছিল। তাদের হয়তো ধারণা হয়ে থাকতে পারে আমরা ফৌজ বা পুলিশের আগাম বাহিনী, পিছন পিছনে আসল ফৌজ আসছে। ভয়ের চোটে গাড়ির ভিতরে যে মহিলা ও শিশু আছে তা বোধহয় বুঝতে পারেনি। আমরা গাড়ি থেকে নামছি, মনে হল বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে হঠাৎ একদল মহিলা ছুটে পালাল, ঠিক যেন এক-ঝাঁক ত্রস্ত পায়রা। মজিদ ঘরের ভিতরে গিয়ে আমাকে নতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলে পরিচয় করিয়ে দিল। ফলে গৃহস্বামী আরো ঘাবড়ে গেলেন, হয়তো ভাবলেন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে গেছি। পরমুহূর্তেই আভা আর জয়তীকে দেখে ত্রাসের

পরিবর্তে মুখে চোখে ফুটে উঠল বিমূঢ় বিস্ময়। হতভম্ব হয়ে তিনি একবার এদিক একবার ওদিক তাকিয়েই চলেছেন, এমন সময়ে আমি বললুম, আজই মালদায় পৌঁছেছি, যত শীঘ্র পারি সুজাপুর দেখতে এসেছি; শুনেছি সুজাপুর মালদা সিল্কের পীঠস্থান, অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাস। বললুম, সেই কারণেই আরো স্ত্রীকে আর মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছি। আমার নিজের রীতিসিদ্ধ, দাবার প্রথম বোড়ের চাল মনে পড়ে গেল, বললুম, ঘণ্টা তিনেক আগে ভাত খেয়েছি, তাই সকলের খিদে পেয়ে গেছে। গৃহস্বামীর যেন আরো পুরো দু'মিনিট লাগল সম্বিত ফিরে আসতে। ইতিমধ্যে আমি গলা উঁচু করে আভাকে বলেছি অন্দরমহলে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করতে।

যেই না বলা, কী যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, যদি দেখতেন! চোখের পলকে গ্রামের সব মহিলা ভিড় করে ভিতরের বারান্দায় আর উঠোনে জড়ো হলেন। দেয়াল-আলমারিগুলি থেকে তাড়াতাড়ি ভাল দামী চীনেমাটির কাপ-প্লেট, ছুরি-কাঁটা সশব্দে বার করা হল। বেশ বোঝা গেল এসব পরিবারে সাহেবী কেতায় অভ্যস্ত অতিথিদের আপ্যায়ন করার অভ্যাস আছে। আধঘণ্টার মধ্যে ট্রে-তে চা, দুধ, চিনি আলাদা পাত্রে সাজিয়ে আনা হল, তার সঙ্গে এল পরিপাটিভাবে তৈরি ডিমের অমলেট আর অতি উপাদেয় সুজির হালুয়া। সারা গ্রামে উৎসবের হাওয়া বয়ে গেল। গ্রামের অনেক লোকজনকে আমাদের সঙ্গে চা খাওয়াতে গৃহস্বামীর নিশ্চয় অনেক খরচ হল। সাড়ে সাতটায় যখন ফিরলুম তখন শীতের সন্ধ্যায় বেশ রাত হয়ে গেছে। প্রথম দিনটি ভালই কাটল।

পরের দিন অর্থাৎ ১৯৪৮-এর ১৬ জানুয়ারি সকালে কার্যভার নিয়ে দপ্তরের ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেক অফিসার ও কেরানির সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে আলাপ করলুম। স্বাধীন ভারতের 'প্রথম' কালেক্টরের এই নতুন 'কায়দা' বেশ কাজ দিয়েছিল। পরের কয়েকদিন প্রত্যেককে ঘরে ডাকিয়ে তার ব্যক্তিগত ও পরিবারগত মোটা খবরগুলি আমার নতুন 'কালো' বইতে টুকে রাখলুম, ভবিষ্যতে কাজ দেবে ভেবে। সকলের সঙ্গে আলাপ করে একটি কথা ভেবে বেশ ভাল লাগল: জেলার খুব কম মুসলমান কর্মচারিই দেশবিভাগের ফলে পাকিস্তান বরণ করেছিলেন।

দেশভাগের আগে মালদায় বড়দরের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বিশেষ হয়নি। বরং ঠিক উল্টোটাই বলা যায়। অন্যান্য জেলায় আগে যতখানি হাঙ্গামা হত, তুলনায় মালদায় খুব কম হত। মুখে মুখে খুব তাড়াতাড়ি কথা ছড়ায়। কার্যভার

নিয়ে যখন অফিসের লোকের সঙ্গে একে একে কথা বলছি তখন অনেকেই আগের দিন আমার সুজাপুর যাবার কথা বললেন। সুজাপুর যাওয়াটা শীঘ্রই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে বেশ বড় খুঁটি হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪৮-এর সারা বছর যখনই কোনখানে সামান্য গোলযোগের গুঞ্জন শোনা গেছে, আমাদের সুজাপুরের গৃহকর্তা, খাঁ সাহেব, সর্বাগ্রে ছুটে গেছেন, ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে এনেছেন। আচমকা হোঁচট খেয়ে কীভাবে সৌভাগ্যের কোলে পড়েছিলুম, এখনও মনে পড়লে ভাল লাগে।

প্রথম কয়েকদিন সকালে জেলার গণ্যমান্য সাক্ষাৎপ্রার্থীদের দেখা দিতে কেটে গেল। প্রথমেই এলেন জেলাবোর্ডের সভাপতি, ভালুকার জমিদার জ্যোতির্মোহন মিশ্র। বয়সে আমার থেকে প্রায় বিশ বছরের বড়। আমার নিজস্ব স্টেনো, আর্দালি মজিদ বলল, জেলার তিনি সব থেকে সম্মানার্হ, আত্মসম্মানসম্পন্ন, সজ্জন ব্যক্তি। প্রথম সপ্তাহে প্রায় পঞ্চাশজন সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন জমিদার বা ঐ-স্থানীয় ব্যক্তি। কয়েকটি নাম ও পরিচয় দিলেই পাঠক বুঝবেন। রামকিঙ্কর রায় ও তাঁর বড় ছেলে রামপ্রসন্ন রায় হরিশ্চন্দ্রপুরের বড় তরফের জমিদার। রামপ্রসন্ন পরে কেন্দ্রীয় সংসদসভার সভ্য নির্বাচিত হন। হরিশ্চন্দ্রপুরের ছোট তরফের জমিদার মোহিনীমোহন হরিশ্চন্দ্র-পুরের পাট উঠিয়ে ভালুকায় নতুন করে ভিটাবাড়ি পত্তন করেন। তাঁরই বড় ছেলে জ্যোতির্মোহনের সঙ্গে রামকিঙ্কর রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ব্রজর বিবাহ হয়। তারপর উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইংরেজবাজারের জমিদার যদুনন্দন ও তাঁর ভাই আশুতোষ চৌধুরী। এঁদের পর বাবুলচণ্ডীর ও সিংহাবাদের জমিদারবংশ। বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন কোতোয়ালি গ্রামের আবুল হায়াৎ খাঁ চৌধুরী, মালদার সবথেকে প্রাচীন বংশ। তার ছেলে আবদুল গণি খাঁ চৌধুরী বড় হয়ে প্রথম হন পশ্চিমবঙ্গ সরকারে মন্ত্রী, পরে বেশ কিছু বছর ছিলেন, কেন্দ্রে মন্ত্রী। এখনও ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা। আর ছিলেন নুরপুরের জমিদার জহিরুদ্দিন চৌধুরী। জমিদারদের সকলেই ছিলেন অব্যর্থ শিকারী, প্রত্যেকেরই হাতিশালে ছিল একাধিক হাতি। এঁদের হাতি এবং সরকারের হাতি নিয়ে বছরে একবার কালেক্টরের বাড়ির সমুখের মাঠে হাতিদৌড়ের প্রতিযোগিতা হত। এ বিষয়ে পরে আসছি। জেলার সবথেকে জমিদার, এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ, চাঁচল রাজরা, আমি মালদায় যাবার আগেই চাঁচল ত্যাগ করে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। দৈবক্রমে ১৯৪৮-এর ৩১ জানুয়ারির ভোরে

তাঁদেরই রাজবাড়ির অতিথিশালায় আমি ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর প্রাণনাশের সংবাদ পাই। আমি তখন খরবা থানায় ঘোরাফেরা করছিলাম।

যুগপরিবর্তনের মুক্ত, হালকা হাওয়া সারা আকাশ যেন ঝলমল করে ভরে দিল। চন্দননগর ত্যাগ করার সময়ে যত অনুভব করেছিলুম তার থেকেও সুখকর। ১৯৪০ সালে কৃষ্ণনগরে যখন প্রথম কাজে ঢুকলুম, উচ্চপদস্থ কর্মচারী দেখলেই লোকের শরীরে যেমন ঈষৎ সন্ত্রস্তভাব আপনিই ফুটে উঠত, মালদায় তার কোন চিহ্নই দেখলুম না। অথচ কোন উদ্ধত বা স্পর্ধাভাবও নেই। কথায় কথায়, গর্ব ও আত্মপ্রসাদে, লোকে স্বাধীনতার উল্লেখ করত। খুব গরীব বা উপজাতিস্তরের লোকে অবশ্য নতুন যুগেও সময়ে সময়ে অস্বস্তিকরভাবে নতশির হয়ে থাকত, তবে সেই নতভাবেও আগেকার দাসভাব কম থাকত, আত্মসম্মান ফুটে উঠত। মালদার ঐতিহ্যে সম্ভবত আগের যুগের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কৃপায়, বুক টান করে চলার কিছুটা রেওয়াজ ছিল। জেম্‌স্‌ পেডী—যিনি মুন্সীগঞ্জে আমার বিশ বছর আগে এস-ডি-ও ছিলেন—তিনি মালদাতেও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দুই স্থানে তাঁর নাম লোকে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করত। বিনয়রঞ্জন সেন, যতীন্দ্রনাথ তালুকদার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ছিলেন জনপ্রিয় ও হিতব্রতী। আরো মস্ত কথা, মুন্সীগঞ্জের মত, মালদার লোকেদের স্বাস্থ্য ছিল ভাল। খাদ্যশস্য তো ভাল হতই, রেশমচাষ ও শিল্প ছিল সোনাফলানো বৃত্তি, নানারকমের ফল, বিশেষত আম, হত অপর্য্যাপ্ত। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের চাষীদের যে ধরনের উৎপীড়ন বা অত্যধিক খাজনার বোঝায় কষ্ট পেতে দেখেছি, মালদার প্রজাদের অবস্থা অনুপাতে ছিল অনেক ভাল। এম-ও কার্টারের সেট্‌ল্‌মেণ্ট রিপোর্টেও তার প্রমাণ পাই। আম, কাঁঠাল ও কলার ফলন ছিল অঢেল। রেশম ও আম রপ্তানি থেকে অর্থাগম হত প্রচুর। হরিশ্চন্দ্রপুর, কালিয়াচক, মানিকচক, খরবা, রতুয়া ও ইংরেজবাজার থানার মাটি ছিল, স্থানীয় ভাষায়, দো-আঁশ (বেলে ও পলিমাটি), উপরন্তু প্রতি বছর গঙ্গার প্লাবনে সারা জেলার উর্বরতা বাড়ত। এই অঞ্চলকে বলত দিয়ারা বা তাল এলাকা। অনুর্বর ছিল বরিন্দ এলাকা—এটি পুরনো মালদা, গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর থানা, এবং খরবা ও রতুয়া থানার উত্তরভাগ ব্যেপে ছিল। বরিন্দ এলাকার মাটি ছিল হয় লাল কাঁকড় না হয় ভীষণ ঘন এঁটেল। দিয়ারা বা তাল এলাকায় ধান যেমন হত ভাল, তেমনি হত গম, নানাবিধ ডাল, আখ, কিছু পাট, রেশমের তুঁত, আর অন্যান্য রবিশস্য। বরিন্দ

এলাকার এঁটেল মাটিতে লাঙ্গল চালানো ছিল দুষ্কর, উর্বরতা ও ফলনও ছিল খুব কম, ধানের ফলনও ভাল হত না, রবিশস্য প্রায় হতই না। তা সত্ত্বেও বরিন্দের সাঁওতালরা—পরে দেখলুম—বীরভূমের রামপুরহাট-নলহাটির সাঁওতালদের থেকে —চাষী হিসাবে ভাল ছিল, বেশী ফসল ফলাত। যুক্তি হিসাবে এগুলিকে যদি মালদার মুক্তির স্বাদের কারণ বর্ণনা করেন, তাহলেও মালদাবাসীর এই স্বাধীন ও স্ফূর্তির ভাবের সবটুকু ব্যাখ্যা হয় না। অবশ্য, আরেকটি বিষয়ও মনে রাখতে হবে। সাদা মনিব চলে গেছে, আর আসবে না, এবার থেকে সবাই নিজের লোক। এর ফলে সরকারি কর্মচারির প্রতি ভীতি, এবং সাধারণ নাগরিকের আড়ষ্টভাব স্বভাবতই অনেক কমে গেল। অন্তত সোজাসুজি দাবি করতে শিখল। লোকে সহজভাবে নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস নিতে শিখল। একদিকে সাহেবের বুটের যুগ চলে গেছে, অন্যদিকে কুড়ি-বাইশ বছর পরের রাজনৈতিক সন্ত্রাস তখনও মনের আকাশে একফালি কালো ঈশানের মেঘের মতও দেখা দেয়নি। আশ্চর্য শান্তি ও উল্লাসের যুগ।

আকাশ বাতাস থেকে যেন আলো ঝরে পড়ত। খুশিতে মন ভরে থাকত। সকলেরই ব্যবহারে আন্তরিকতা ও বন্ধুভাব। যাঁদের কথা উল্লেখ করেছি তাঁরা সকলেই নিজের দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতেন, অতএব প্রতিটি ব্যাপার তলিয়ে দেখে, বুঝতে সাহায্য করতেন। জ্যোতির্মোহন মিশ্রের মেজভাই সৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, অক্লান্ত কর্মী, গ্রামে গ্রামে সংগঠনে ওস্তাদ। অথচ মাতব্বরি বা হাঁকডাক ছিল না। ওঁদের দিদি, সুরেন্দ্রবালা রায়, ছিলেন গান্ধীপন্থী সর্বোদয় কর্মী। অন্য রাজনৈতিক—যথা ফরোয়ার্ড ব্লক বা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা বা সভ্যরাও ছিলেন সমান বিনয়ী ও ঔদ্ধত্যবর্জিত। কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যদের সঙ্গে আলাপ হবার সুযোগ বেশীদিন হয়নি, কারণ মালদা যাবার অল্পদিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সে পার্টি নিষিদ্ধ হয়। সকলেই জানাবার, শেখাবার, সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে কিছু প্রস্তাব দিলে কেউ আপত্তি করতেন না, উল্টে কাজে করে দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

রাজনীতি

১৯৪৬-৪৭ সালে গান্ধীজির প্রার্থনাসভায় আমি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে প্রথম দূর থেকে দেখি, তখন কেন জানি না তাঁকে একটু গ্রাম্য ও ঘরকুণো স্বভাবের মনে হয়েছিল, যদিও বিদ্বান ও সজ্জন বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭-এ তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন—১৯৫০ সালে নতুন সংবিধান চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বলা হত। বিধানচন্দ্র রায়কে তখন পর্যন্ত আমি একবারই কাছ থেকে দেখেছি, ১৯৩৮ সালে মাকে তাঁর অসুখের সময়ে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। অসুখ সারার নয় বলেন বলে তাঁর প্রতি মন একটু বিরূপ হয়। তা সত্ত্বেও নতুন রাজ্য গড়ার পক্ষে যে ঔদার্য ও মনের প্রশস্তি আবশ্যক বলে আমার মনে হত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মধ্যে তা কম ছিল মনে হত। অন্যপক্ষে ওঁর স্থানে ১৯৪৮-এর ২৩ জানুয়ারি অর্থাৎ আমি মালদায় যোগ দেবার একসপ্তাহ পরে—বিধানচন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন তখন আমার ভালই লাগল, মনে হল একজন প্রমাণ সাইজের মানুষ এলেন, যেটা যা বলতে পিছ্‌পা হবেন না। প্রধান, তথা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ডাঃ বি-সি রায় নলিনীরঞ্জন সরকারকে অর্থমন্ত্রী, প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে খাদ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য সুযোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রিসভায় নিলেন। কিরণশঙ্কর রায়কে তিনি নিলেন গৃহমন্ত্রী হিসাবে, যদিও তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সভ্য ছিলেন না। কিরণশঙ্কর ছিলেন ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র, নিজে ঐতিহাসিক, উপরন্তু প্রবন্ধ ও ছোটগল্প রচনায় বিশেষ দক্ষ। অতি সুন্দর বাংলা লিখতেন, তাঁর ছোটগল্পের সমষ্টি 'সপ্তপর্ণী' একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। বাংলা গদ্য রচনায় তাঁকে অতুল গুপ্ত'র শ্রেণীতে স্থান দিই। উপরন্তু তিনি ছিলেন দক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক। পূর্ববঙ্গে, ঢাকার মানিকগঞ্জ মহকুমায় আদি নিবাস ছিল বলে, দেশভাগের আগের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে পূর্ব-পাকিস্তান বিধানসভায় ১৯৪৭-এর ১৪ অগাস্ট বিরুদ্ধ পক্ষের নেতা নির্বাচিত হন। ডাঃ রায় তাঁকে নিমন্ত্রণ করে পশ্চিমবঙ্গের গৃহমন্ত্রী পদ গ্রহণ করতে রাজি করান। ফলে ১৯৪৮-এর ১০ ফেব্রুয়ারি যখন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু হল, তখন বিধানসভার কক্ষে সরকারের পক্ষে প্রথম সারিতে বসলেন ডাঃ রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার ও কিরণশঙ্কর রায়।

১৯৪৮-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে পি-সি যোশীর স্থলে বি-টি রণদিভে পার্টির সম্পাদক হলেন। সম্পাদক হয়ে

রণদিভে ক্ষমতা হস্তগত করার উদ্দেশে চাষীমজুরদের প্রতি সংগ্রাম শুরুর আবেদন জানালেন। বললেন : এই মুহূর্তে এক ঘায়ে জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে আমাদের সমূহ সুযোগ এসেছে। ইতিমধ্যে তেলেঙ্গানায়, কেরলে, বিহারে ও অন্যান্য প্রদেশে চাষীমজুরের নতুন নতুন ক্যাডার সৃষ্টি হয়েছে। মালদায় অবশ্য এই নতুন ঢেউ এসে পৌঁছয়নি। সাধারণের ধারণা হয় নতুন গৃহমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় সি-পি-আইকে বেআইনি ঘোষণা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রণদিভে পার্টি সম্পাদক হবার পর, পার্টি ঘোষণা করল ২৯ মার্চ সারা দেশময় কেন্দ্রীয় কর্মচারিদের ধর্মঘট শুরু হবে, সরকারের কাজ বন্ধ হবে। ২৫ মার্চ কিরণশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিস্ট পার্টিকে সহসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পার্টির পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিলেন। প্রধানমন্ত্রী, জওহরলাল নেহরু ; তাঁর ১ এপ্রিল, ১৯৪৮-এর চিঠিতে সব মুখ্যমন্ত্রীদের লিখলেন :

> আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করেছে। এই আদেশ জারির আগে আমাদের আদৌ জানানো হয়নি। এই ধরনের এক-তরফা নীতি স্বভাবতই অনুচিত, কারণ কোন যুক্তরাষ্ট্রে কোন বিশেষ প্রদেশের আদেশের ঘাতপ্রতিঘাত সেই প্রদেশেই আবদ্ধ থাকে না। তার প্রতিক্রিয়া অন্য রাজ্যে হতে বাধ্য। সুতরাং এ ধরনের সবকিছু প্রথমেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তবে করা উচিত। (আমাদের দিক থেকে) কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা, অথবা ব্যাপক ধরপাকড় করার কোন অভিপ্রায় ছিল না। আশাকরি একথাটি আপনার সরকার ভবিষ্যতে মনে রাখবে এবং শুধু তাদেরই আটক করবে যাদের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক কার্যকলাপের অভিযোগের প্রমাণ আছে।

পণ্ডিতজীর এই উক্তি আমি অবশ্য অনেক বছর পরে দেখেছি। সে সময়ে অবশ্য কোনমতেই এর কোন প্রকাশ্য উল্লেখ করা হয়নি। এর আগে কিরণশঙ্কর রায়কে এক সাহিত্যসভায় দূর থেকে দেখেছি। মালদা থেকে যখন পূর্বের নির্বাচিত মুসলমান এম-এল-এ পূর্ব-পাকিস্তান চলে যান, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সেই শূন্যস্থানে নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস তখন কিরণশঙ্কর রায়কে মনোনীত করলেন। বলাবাহুল্য, সে প্রস্তাব আমার মোটেই ভাল লাগেনি। অথচ গৃহমন্ত্রী হিসাবে কাজ করতে গেলে কিরণশঙ্কর রায়ের পক্ষে বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক। আমি তখনই মনে মনে স্থির করলুম, তাঁকে অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে প্রকাশ্যে বা পরোক্ষ নির্বাচনে সাহায্য উদ্দেশ্যে উপর থেকে যদি

কোন চাপ বা প্রচ্ছন্ন সুপারিশ আসে তাহলে আমি মানব না বা মানতে দেব না। নিরপেক্ষতা অবশ্য আমার একান্ত কর্তব্য, কিন্তু সেই সংকল্পের সহায় হল মনে মনে তাঁর প্রতি এক বৈরীভাব। তখনকার দিনে পেট্রোলই ছিল সবথেকে কাম্য দুর্লভ সাহায্য। এ বিষয়ে একটু পরে আসছি।

দৈনন্দিন জীবন

মালদার জমিদারদের কার কত দৌলত তার একটি মান ছিল, কার ক'টি হাতি, তার হিসাবে। হাতি ছিল অপরিহার্য বাহন। শুধু যে জলা বা বিলে শিকারের জন্য তা নয়—যেমন গৌড়ের কাছে বিল ভাটিয়া; ভালুকার শিয়ালী বিল, হরিশ্চন্দ্রপুরের সাদলিচক—একস্থান থেকে অন্যস্থানে, বিশেষত বর্ষাকালে, যেতে হলে হাতি ছাড়া উপায় ছিল না। রাস্তা-ঘাট ছিল খুব খারাপ। যাঁরা শুধু বর্তমানকালের মালদার সঙ্গে পরিচিত তাঁদের কোন ধারণাই হবে না ১৯৪৮ সালে মালদার রাস্তাঘাটের কী দুরবস্থা ছিল। আজকের দিনে যে ৩৪ নং জাতীয় রাজপথ দেখে লোকে মুগ্ধ হয়, ১৯৪৮ সালে সেটি ছিল অসংখ্য বিরাট বিরাট গর্তের উপর বালির ও থকথকে আঠার মত এঁটেল মাটির ফাঁদের অফুরন্ত মালা। ইংরেজবাজার থেকে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কাঘাটের মুখোমুখি এপারে মালদার খেজুরিয়াঘাটে যেতে হলে জীপের ভিতর কোদাল, কুড়ুল, গাঁইতি নিয়ে যেতে হত। প্রয়োজন হলে অগম্য পুরনো রাস্তা ফেলে মাঠ কেটে নতুন রাস্তা তৈরি করে জীপ চালাতে হত।

জমিদারদের সঙ্গে পাল্লা রাখার জন্য, সরকার মালদার কালেক্টরের জন্য দুটি হাতি পুষতেন। সব খরচ ছিল সরকারের। দুটি হাতির মধ্যে একটি পাকিস্তানের ভাগে যায়। অন্যটি, নাম জয়মণি, মালদার কালেক্টরের ভাগে পড়ে। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে সার্কিট হাউসের সমুখের মাঠে মালদার হাতিদের দৌড়ের প্রতিযোগিতা হত। সারা জেলা থেকে প্রায় দু'ডজন হাতি এসে জড়ো হত। প্রত্যেকের পিঠে জরির কাজকরা রংচঙে হাওদা, সঙ্গে উপযুক্ত পোশাক ও মালিকের তকমাপরা মাহুত ও সহিস। আমাদের জয়মণির একটি ছোট বাচ্চা ছিল। জয়ন্তী তার নাম রাখল, গুড়গুড়ে। গুড়গুড়ে উঁচু ছিল বড়জোর সাড়ে তিন ফুট বা চার, যেমন দুরন্ত, তেমনি দুষ্টু। দৌড় প্রতিযোগিতা কিন্তু জবরদস্ত ছিল, তার মধ্যে কোন ঢিলেঢালা ভাব ছিল না। আবুল হায়াৎ খাঁর (ডাকনাম

কোতোয়ালি মিঞা) হাতিটি প্রথম হল : তিনশ' গজ দৌড়লো পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডে। গো-হারান হেরে গিয়ে মায়ের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে গুড়গুড়ের সে কী কান্না! তাকে শেষ পর্যন্ত শান্ত করা হল দু'সের আখের গুড় খাইয়ে, আর গলায় একটা গাঁদাফুলের গোড়ের মালা পরিয়ে। মালাটি অবশ্য সে তৎক্ষণাৎ চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। অল্পদিন পরে জয়মণির সামনের ডান হাঁটুতে একটা ফোড়া হল। পশু চিকিৎসক কলার পাতায় আধসের এম-বি ৬৯৩-র বড়ি মুড়ে একটি আস্ত কলাগাছের গুঁড়ি কেটে তার মধ্যে গর্ত করে মোড়কটি পুরে দিয়ে জোর করে তাকে হাঁ করিয়ে গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। একসপ্তাহ পরে আবার ঐ চিকিৎসার পুনরাবৃত্তি হল। ফোড়া সম্পূর্ণ সেরে গেল। ফোড়া সারায় আমাদের সকলের কী আনন্দ! পরের রবিবার জয়মণি ও গুড়গুড়ের আমাদের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ হল। জয়মণি খেল দু'তিনটি কচি কলাগাছ আর গুড়গুড়ে খেল একতাল আখের গুড় আর ঐ ধরনের সুখাদ্য। মাহুতের উপর আদেশ ছিল প্রতিমাসের প্রথম রবিবার বিকালে জয়মণিকে আর গুড়গুড়েকে নিয়ে এসে আমাকে দেখতে হবে। মাসে একবার 'চায়ে'র পর জয়মণি জয়ন্তীকে আদর করে পিঠে চড়িয়ে সার্কিট হাউসের হাতার মধ্যে দু'এক পাক ঘুরত। সে সময়ে পশুর ডাক্তারও উপস্থিত থেকে তাকে পরীক্ষা করতেন, তাদের দুজনের শরীর ঠিক আছে কিনা।

ডিভিশনাল কমিশনার, যতীন্দ্রনাথ তালুকদার, একটি ছোট বাইপ্লেনে একদিন সকালে মালদায় উপস্থিত। মালদা কলেজের পশ্চিমে ছোট ট্রেনিং-প্লেনের উপযুক্ত একটি এয়ার স্ট্রিপ ছিল। শুনেছি স্বনামধন্য বিনয়কুমার সরকারের বসত-ভিটা ওর কাছেই ছিল। যখনই ইংরেজবাজারে আসতেন, স্থানীয় লোকেরা তাঁকে যেভাবে শ্রদ্ধা ভালবাসা দেখাত তাতেই বুঝতুম ১৯৩২-৩৫ সালে কালেক্টর হিসাবে তিনি কত জনপ্রিয় ছিলেন। প্লেন থেকে নেমে বললেন দুটি জিনিস আমাকে তিনি জানাতে এসেছেন। সরকার শীঘ্রই গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মালদার শূন্য অ্যাসেম্বলি আসনের নির্বাচন তারিখ ঘোষণা করবেন। সরকারের পার্টির তরফ থেকে কিরণশঙ্কর রায় সম্ভবত প্রার্থী হবেন।

দ্বিতীয় বিষয়ে আরো ঔৎসুক্য হল। আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৪৭-এ, জীতেশ তালুকদার বলে একটি ছেলে আই-এ-এস চাকরিতে ভর্তি হয়। চাকরিতে আসার আগে সে ভারতীয় আর্মির একটি প্রসিদ্ধ ক্যাভালরি রেজিমেন্টে ছিল। যুদ্ধ শেষে খালাস পেয়ে আই-এ-এসে স্থান পায়। নদীয়া থেকে সে অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট

হিসাবে আমার জেলায় বদলি হয়ে আসছে। নদীয়ার কালেক্টর, দেবব্রত মল্লিক বিশেষ নিরীহ ও অমায়িক ব্যক্তি, জীতেশের মত ছোকরা জঙ্গী অফিসারের তিনি প্রতি শনিবার কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা যাওয়া বন্ধ করতে পারছেন না। কখনও কখনও জীতেশ শুক্রবার অপরাহ্ণে চলে যায়, শনিবারের জন্য অপেক্ষা করে না। কলকাতার এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার ভীষণ ঘনিষ্ঠতা। ভদ্রমহিলার স্বামী সিনিয়র আই-সি-এস অফিসার, ডিভিশনাল কমিশনার হিসাবে চুঁচুড়ায় থাকেন, স্ত্রী একলা থাকেন কলকাতার বাড়িতে। এই ঘটনার সাত মাস পরে আমি আইভান স্মরিটা বলে আরেকটি আই-এ-এস অফিসারকে মুর্শিদাবাদে পাই। অলইণ্ডিয়া রেডিওর সুবিখ্যাত ক্রিকেট মন্তব্যকার পিয়ার্সন স্মরিটার ভাই। যুদ্ধের পর বিখ্যাত রাজপুতানা রাইফ্‌ল্‌স্‌ রেজিমেণ্ট থেকে ছাড়া পেয়ে আই-এ-এসে ভর্তি হয়। যুদ্ধের সময়ে তার রেজিমেণ্ট রমেলের জার্মান ফৌজের বিরুদ্ধে লড়ে। বেনগাজির যুদ্ধে স্বীয় প্রাণ তুচ্ছ করে শৌর্যপ্রকাশের জন্য আইভান দু'-দু'বার মিলিটারি ক্রস পদক পুরস্কার পায়। পর পর দুবার মিলিটারি ক্রস পেলে বলত এম-সি এণ্ড বার। একদিন নদীতে স্নান করার সময়ে আইভান যখন গা খোলে, দেখি তার সারা বুক-পিঠ আষ্টেপৃষ্ঠে গভীর ক্ষতের কাটাকুটিতে ভরা, কোথাও বাদ নেই। বেঁচে উঠেছে, তাই আশ্চর্য। পরে শুনি তাকে শুশ্রূষা করে বাঁচায় তার নিজস্ব ব্যাটমান, অর্থাৎ সৈনিক ব্যক্তিগত আর্দালি। আইভানের ঘরে তার প্রসাধনের টেবিলে ব্যাটম্যানের ছবি শোভা পেত। জীবিতকালে তাকে তো প্রতিমাসে মোটা টাকা পাঠাতই, উইল করে যায় মৃত্যুর পর সে আইভানের সম্পত্তির কী কী পাবে। সে যাই হোক, পরে বহরমপুরে জীতেশের সমুখেই আইভান বলে, প্রতি শুক্রবার বা শনিবার কীভাবে নদীয়ার কালেক্টরের খাসকামরায় গটগট করে ঢুকে, মুখের কোণে চালিয়াতি কায়দায় বাঁকা করে পাইপ ঝুলিয়ে, নাকটা ছাতের দিকে তুলে, ঘোঁত করে বলত, 'ভাবছি, আজ দুপুরের পর কলকাতায় যাব, সোমবার ফিরব। আপত্তি আছে কি?' জীতেশের ছিল বেশ লম্বা, ছিপছিপে অথচ শক্তিশালী গড়ন, শ্যামবর্ণ সিংহকটি, অল্পবয়স, অত্যন্ত সুপুরুষ। দেহের প্রতি ইঙ্গিতে যেন ক্যাভালরি অফিসারের ছাপ। পুশ্‌কিন্‌ বা টলস্টয়ে যেমন পড়ি। হুইস্কি-খাওয়া খসখসে গলায় কথাগুলি সে যেন তার কর্তার দিকে হেলায় ছুঁড়ে দিত। আইভান বলল, কালেক্টর সাহেব সসব্যস্তে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত কচলিয়ে, অনুনয়ের সুরে, যেন তিনিই নিচে. জীতেশ উপরে. বলতেন, 'মোটেই নয়, মিঃ তালুকদার, নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

কমিশনার বললেন, এই ধরনের যাতায়াত প্রায় কেলেঙ্কারিতে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা জীতেশকে এমন এক জেলায় পাঠানো হোক যেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যখন তখন ছুটি চাইতে পারবে না, উপরন্তু সেখান থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করতেই দু'দিনের বেশী সময় লাগে, সুতরাং শনি-রবিবার কলকাতায় কাটানোর প্রশ্ন উঠবে না। এদিক দিয়ে মালদাই প্রকৃষ্ট জেলা। আমি যেন দেখি জীতেশ যেন কোন ছুতোয় ইংরেজবাজার ছেড়ে পালাতে না পারে, অর্থাৎ কড়া হই। মুখ্যমন্ত্রীর এই ইচ্ছা। শুনে মজা লাগল, কারণ ঠিক এই সময়ে কলকাতার পথে-ঘাটে একটি ছড়া মুখেমুখে খুব ঘুরছে, 'বাংলার মসনদে নলিনী, বিধান, বাংলার কুলবধূ হও সাবধান।'

মাসখানেকের মধ্যে জীতেশ এসে উপস্থিত। তার জ্যেঠতুতো দিদির সঙ্গে আভা এক স্কুলে পড়েছে, আমরা পরিবারটিকে জানতুম। তাকে দেখে মনেই হয় না সে মহিলাশিকারে তৎপর হতে পারে। উল্টে মনে হল বেজায় লাজুক, মুখে মাখনটি গলবে না। যে মহিলাটি সংশ্লিষ্ট, তাঁকে আর তাঁর স্বামীকে আমরা ১৯৪১ সালে কৃষ্ণনগরে সুশীল দের অতিথি হিসাবে দেখেছি। মহিলার থেকে তাঁর স্বামী অন্তত কুড়ি বছরের বড়, কারণ তাঁর স্বামীর জন্ম ১৯০১ সালে। 'জীতেশকাকু'কে দেখামাত্র জয়তী তাকে পেয়ে বসল। জ্যোতিদাদার সঙ্গে কথা বলে ডাকবাংলায় তার জন্য একটা পুরো দিক ঠিক করা হল। তার ব্যবহার আর সুন্দর স্বভাবে সে কালেক্টরেটের সকলকে অল্পদিনের মধ্যে আপন করে নিল। ছোট সাহেবের পাশে বড় সাহেব ম্লান হয় আর কি! প্রতিদিন অধিকাংশ সময়ে সে হয় আমার সঙ্গে না হয় বিভাগে বিভাগে কাজ শিখে কাটাত। মনেই হত না তার মন অন্য কোথাও পড়ে থাকতে পারে!

পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হবার প্রায় এক সপ্তাহ আগে পার্টির স্থানীয় অল্পবয়স্ক এক সভ্য আমাকে স্নেহাংশু আচার্যর হাতে লেখা একটি চিঠি দিলেন। স্নেহাংশু লিখেছে, আমি যেন যত শীঘ্র পারি তার বাড়ি থেকে আমার মালপত্র সরিয়ে নিয়ে যাই। যে-কোন মুহূর্তে তার বাড়িতে পুলিশের খানাতল্লাসী হতে পারে। যদি হয় তাহলে পুলিশ আমার সব মালপত্র খুলে ছত্রাকার করে দেবে। ছোট নাজিরবাবু তার দিনদশেকের মধ্যে সব মালপত্র পরিপাটি করে নিয়ে এলেন।

কিরণশঙ্কর রায়ের নির্বাচন

পাঠকের নিশ্চয় ধারণা হয়েছে কিরণশঙ্কর রায়ের নির্বাচনে আইনত অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর যা প্রাপ্য তার থেকে তাঁকে একতিলও বেশী সাহায্য আমি সরকার পক্ষ থেকে করতে রাজি ছিলুম না। আইন-নির্দিষ্ট নিরপেক্ষতার সঙ্গে আমার সংকল্পে বোধহয় একটু ব্যক্তিগত জেদও ছিল। সি-পি-আইকে নিষিদ্ধ করা এবং সেই সঙ্গে আমার বন্ধু স্নেহাংশু, তার সঙ্গে আমাকে, অসুবিধায় ফেলা তার হয়তো একটা কারণ ছিল, যদিও সে কারণ যদি মনের কোণে লুকিয়ে থাকে তা নিতান্তই অবান্তর ও অযৌক্তিক। কিরণবাবু তালুকদার সাহেবের মত সরকারি প্লেনে মালদায় এলেন না। আজকালকার মত নির্বাচন কমিশনের আইন অমান্য তখনকার মন্ত্রীরা করতেন না। তখনকার দিনে এসব নীতিবোধ বেশ প্রখর ছিল, এবং জনসাধারণও অনেক সজাগ ছিলেন, এখনকার মত পদলেহী ছিলেন না। সি-পি-আই বেআইনি করার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ট্রেনে করে মালদায় এলেন। মন্ত্রী হিসাবে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে আমি কলকাতায় চিঠি লিখেছিলুম, চিঠিতে যেদিন পৌঁছবেন সেদিন আমাদের সঙ্গে বিকেলে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। রেলওয়ে স্টেশনে তাঁকে আনতে গেলুম। মালদায় জমিদার আশুতোষ চৌধুরীর মোটরে তিনি সার্কিট হাউসে এলেন। আলাপ করার জন্য অনেক কংগ্রেস সদস্য ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি সার্কিট হাউসে উপস্থিত ছিলেন। ফলে, আমার বসার ঘরটি তাঁকে ছেড়ে দিতে হল, কারণ তাঁর ভাগের সার্কিট হাউসের অফিসঘরটি নিতান্তই ছোট। প্রথানুসারে এসব ক্ষেত্রে বড় ঘরটি ছেড়ে দিতে হয়। আভা মাত্র জনাছয়েকের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু তার বদলে সার্কিট হাউসে প্রায় ত্রিশজন লোক গ্যাঁট হয়ে বসে, নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। আশ্চর্য ব্যাপার! ঠিক চারটে বেজে পাঁচিশ মিনিটে কে-এস রায় ঘরের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত করে নিজের হাতঘড়ি নিরীক্ষণ করে, সমবেত ভদ্রলোকদের বিদায় করার অভিপ্রায়ে গলা তুলে বললেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর এখন জরুরী কথাবার্তা আছে, সেই সঙ্গে বললেন পরের দিন সকাল ন'টায় আবার দেখা হবে। ঠিক চারটে আটাশ মিনিটের সময়ে ঘরভর্তি লোক ফাঁকা হয়ে গেল। আমরা নিরিবিলিতে পাঁচ-ছয়জন বসে চা খেলুম।

দেখলুম ভদ্রলোক আলাপে লোককে মুগ্ধ করতে পারেন। গল্পতেও ওস্তাদ।

শ্রোতা যাতে নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তে বসে শোনে, সেইভাবে ধীরে, নিচু গলায় মজার মজার গল্প বলতেন। প্রথমেই তিনি ঢাকা বিধানসভায় যে কয়মাস কাটিয়েছেন, তার গল্প করলেন, সেই প্রসঙ্গে অবিভক্ত বাংলার দুটি সেরা কর্মনিষ্ঠ আই-সি-এস, আজিজ আহম্মদ ও এন-এম খানের প্রশংসা করলেন। চা ও গল্পশেষের মুখে আভার দিকে তাকিয়ে, পেটের দোহাই দিয়ে বললেন, যে-ক'দিন থাকবেন, উনি কি তাঁর সব আহারই আমাদের কাছে করতে পারেন? ঐদিন রাতে অবশ্য তিনি জ্যোতিদাদার কাছে খাবেন। সুরাবর্দীর হাতে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার সঙ্গে এর কত তফাৎ! (পাঠক, আমার আগের খণ্ড স্মৃতিকথা স্মরণ করবেন)। পরের দিন তাঁর অনুরোধমত সব আহার আমাদের সঙ্গে বসে করলেন, প্রাতরাশ, দুপুরে, রাত্রে। রাতে খাবার সময়ে উনি বললেন, তিনি পরের দিন দুপুরে মালদা ত্যাগ করবেন, তিনি কি একটু সকাল সকাল, সাড়ে দশটা নাগাদ, দুপুরের খাওয়া খেতে পারেন! বিলক্ষণ, নিশ্চয় পারেন, আভা বলল। কিরণবাবু আবার বললেন, ট্রেনে খাবার জন্য কয়েকখানা লুচি আর সব্‌জির তরকারি বেঁধে দিলেই চলবে। তার সঙ্গে সেইদিন দুপুরে আভা যে অতি চমৎকার আমের আচার দিয়েছিল, তার কিছুটা হলে খুব ভাল হয়। এই ধরনের ভদ্রসভ্য ব্যবহারে কার মন ভিজবে না বলুন!

আরো কিছু চমক কপালে লেখা ছিল। সার্কিট হাউস ছাড়ার আগে আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'মিঃ মিত্র, আপনাকে স্পষ্ট করে বলি; আমার নির্বাচনে আমার প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না, যা কিছু আপনার দেবার সব প্রার্থীকে সমানভাবে দেবেন। আমার যেটুকু ন্যায্য পাওনা, তার থেকে আমি একটুও বেশী প্রত্যাশা করি না।' এই ধরনের কথায় আমি খুব খুশি হয়েছি দেখিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিলুম। মনে মনে ভাবলুম, সমান ব্যবহার শেষ পর্যন্ত তাঁর কতখানি সহ্য হবে, ভাল লাগবে, আমিও দেখতে চাই। আমি কী চিজ আমি তো জানি!

নলিনীরঞ্জন সরকার প্রসঙ্গে কিরণবাবু মালদায় যে গল্পটি বলেন, সেটি আমার স্মৃতিকথার "প্রথম চব্বিশ বছর: ১৯১৭-৪০" খণ্ডে বলেছি। গল্পটি এতই ভাল, এখানে আরেকবার বললে দোষ হবে না। কিরণবাবু বললেন, নলিনীরঞ্জন সরকার সে-সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে, প্রতিবাদী হিসাবে তখনকার টি-টি-পড়া রাজাকাকা মামলায় কিছুটা বিধ্বস্ত (অভিযোগ ছিল অল্পবয়স্কা এক মহিলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়)। উপরন্তু অসুখে শয্যাগত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মারা

গেছেন, ১৯৩৮-এর ১৬ জানুয়ারি। কেওড়াতলায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর কিরণবাবু সোজা নলিনীবাবুকে সন্ধ্যাবেলা দেখতে গেছেন। নলিনীবাবু নিস্তেজ হয়ে বালিশে মাথা গুঁজে পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। কিরণবাবু ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বিছানার পাশে বসাতে, নলিনীবাবু বললেন, 'সব শেষ করে ফিরছেন ?' কিরণবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু বাঙালীর ব্যাপার দেখুন, কেওড়াতলায় বড়জোর সত্তর-পঁচাত্তরজন উপস্থিত ছিলেন। অতবড় এক দিকপাল!' 'বলেন কি!' বলে নলিনীবাবু চুপ করে রইলেন। কিরণবাবু বললেন, 'তবে কি জানেন, নলিনীবাবু, আপনি-আমি মারা গেলে অন্তত হাজারখানেক লোক আসবে।' নলিনীবাবু যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন, আরেকটা বালিশ গুঁজে, মাথা তুলে, আধশোয়া অবস্থায় বললেন, 'আপনি তাই মনে করেন ?' কিরণবাবু বললেন, 'নিশ্চয়, তার মধ্যে অন্তত ন'শ' নব্বইজন আসবে স্বচক্ষে দেখতে, শালা সত্যিই মরেছে কিনা!' নলিনীবাবুর মাথা নিস্তেজভাবে আস্তে আস্তে নিচের বালিশে ঢলে পড়ল। এর মত মজলিশি গল্প আজকাল কটা শোনা যায়! আজ যদি কেউ সামান্যতম কেউকেটা হয়, সেও, নাভিশ্বাস ওঠার মুহূর্ত পর্যন্ত তরোয়াল ঘুরিয়ে নিজের মাহাত্ম্য জারি করবে!

তাঁর আরেকটি গল্পও খুব মজার। আগেই বলেছি, ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে কিরণবাবুর বিশেষ সুনাম ছিল। ইতিহাস এককালে পড়াতেনও। ভারতের ঐতিহাসিক গৌরব স্বচক্ষে দেখার জন্য বছরে একবার সফরে বেরোতেন। সেবার গেছেন রাজস্থানে, সঙ্গে বহুকালের বাঙালী ভৃত্য। রাজস্থানে ঘুরে ঘুরে জয়পুরের অম্বর প্রাসাদ দ্বিতীয়বার দেখে কলকাতায় ফিরবেন। থাকতেন ইওরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে, মাছের সেরা বাজার বৈঠকখানা বাজারের কাছে। প্রায় দু'মাস মাছ না খেতে পেয়ে মানিকগঞ্জের পুরনো ভৃত্যের মেজাজ টঙে উঠেছে। শীতকালে অম্বর প্রাসাদের উপরে সরোবরের বাঁধানো পাড়ে বসে কিরণবাবু ভৃত্যকে বোঝাচ্ছেন : এটি রানীদের ব্যবহারের জন্য বাঁধানো সরোবর ছিল, আজকালকার সুইমিং পুলের মত। রানীরা স্নান করতেন, সাঁতার কাটতেন, জলে মাছ খেলে বেড়াত। 'মাছ বললে, দাদাবাবু, কোথায় মাছ ?' বলে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে, ভৃত্য ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারদিক দেখে হতাশ হয়ে আবার কিরণবাবুর পায়ের তলায় শানের উপর বসল। তাঁর 'মাছ ও বাঙালী' বইটি লেখার আগে রাধাপ্রসাদ গুপ্তকে গল্পটি বললে ভাল হত।

নির্বাচনজ্বরের তড়কা শীঘ্রই তুঙ্গে উঠল। মালদার ভারপ্রাপ্ত প্রধান ডেপুটি

কালেক্টরকে আমার বিশেষ নির্দেশ ছিল, তিনি যেন সব প্রার্থীকে সমানভাবে পেট্রোল এবং অন্যান্য সুবিধা বণ্টন করেন। কারোকে কম-বেশী নয়। কোন সরকারি জমির উপর কোন প্রার্থীর স্বপক্ষে মিটিং করা চলবে না।

নির্বাচনের দিনপনেরো বাকি আছে, একদিন সকালে খাসকামরায় বসে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময়ে দরজার বাইরে চেঁচামেচি। কে নাকি 'কিউ' ডিঙিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে জুলুম করছে। মজিদকে ডাকায়, সে বলল গৃহমন্ত্রীর ছেলে আমার সঙ্গে আগেভাগে দেখা করতে চায়। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে এই পুত্রটি পরে বেশ সুনাম করেন; তাঁর রাজনীতি বাবার থেকে পৃথক ছিল। যতক্ষণ না তাঁর পালা এল, ততক্ষণ তাঁকে বাইরে অপেক্ষা করতে হল। ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ক্ষেপে গেছেন, ঘরে ঢুকে তিনি উত্তেজিত গলায় কংগ্রেসপ্রার্থীর জন্য বেশী পেট্রোল ও অন্যান্য সুখসুবিধা দাবি করলেন। বলতে বাধ্য হলুম, সম্ভব নয়। মেজাজ হারিয়ে, অঙ্গভঙ্গী করে বললেন, এর জন্য আমার কপালে দুর্ভোগ আছে। উত্তরে বললুম, আমি তাঁর বাবার মত লোকের ছেলের কাছ থেকে এরকম ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি, তিনি আমার যথাসাধ্য ক্ষতি করতে পারেন, নমস্কার, বলে বিদায় দিলুম। খবরটা তক্ষুনি ছড়িয়ে গেল। জেনে ভাল লাগল, এর ফলে প্রশাসনের প্রতি শহরে শ্রদ্ধা বাড়ল।

কিরণশঙ্কর রায় অবশ্য অক্লেশে জিতলেন। কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসের অনুকূলে ঢেউ-এর জন্য তো বটেই; সৌরীন্দ্রনাথ মিশ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমও সেই বিজয়ের জন্য দায়ী ছিল। পেট্রোলের অভাবে ভদ্রলোক সারা জেলা গরুর-গাড়িতে চড়ে নির্বাচন চালান। জ্যোতিদাদার কাছে শুনেছি সারা নির্বাচন চালাতে মোট ছয় হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। এই টাকার অধিকাংশই খরচ হয় প্রাচীরপত্র, হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে আর লাউডস্পীকার ভাড়া করতে। ১৯৯০ সালে ১৯৪৮-এর ছ' হাজারের মূল্য হয় প্রায় এক লাখ টাকা। আজ এক লাখ টাকায় নির্বাচন জেতা কেউ কল্পনা করতে পারেন!

নির্বাচন জেতার পর কিরণবাবু মালদাবাসীকে ধন্যবাদ দিতে মালদায় এলেন। আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও সৌজন্যের একটুও কমতি দেখলুম না। আগের মতই তিনি নিজে যেচে আমাদের সঙ্গে সব কয়বেলাই আহার করলেন।

যেদিন ফিরে যাবেন, তার আগের দিন রাত্রে খাবার পর, গল্প করে ঘরে শুতে যাবার সময়ে গলা নিচু করে আমাকে বললেন, ছেলের অভব্যতার কথা

শুনে তিনি কত ব্যথিত হয়েছেন। বললেন, 'ছেলেকে বলেছি কখনও যেন সে না ভোলে সে কোন্ বংশের ছেলে।'

ওঁর সঙ্গে কলকাতাতেও আর দেখা হয়নি। উনি মারা গেলেন ১৯৪৯-এর ২০ ফেব্রুয়ারি।

মালদার জাতি-প্রজাতি

১৯৪৮-এ মালদা ছিল নানা জাতি-প্রজাতি ও ভাষার স্ফূর্তিময় সমন্বয়। বাংলা ছাড়া (যার মধ্যে শেরশাবাদিয়াও ধরা যায়) দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা ছিল মৈথিলী। বাংলারই পূর্বপুরুষ বলা যায়। মৈথিলীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমথনাথ মিশ্র। আমার কালেও মৈথিলরা মালদার সাংস্কৃতিক জীবনের পুরোধা ছিলেন। আরেকটি চিত্তাকর্ষক সম্প্রদায় ছিল শেরশাবাদিয়ারা। অবাঞ্ছিত বিবাহিতা স্ত্রীদের চটপট ব্যবস্থা করার পদ্ধতি মুন্সীগঞ্জের চরের মাতব্বরদের পদ্ধতি থেকেও ছিল বিচিত্র ও অভিনব, তদুপরি রোমহর্ষক। বিশেষত তখনও বাঙালীর ঘরে যখন তখন বৌ পুড়িয়ে মারা চলন হয়নি। শেরশাবাদিয়াদের বাস ছিল মুখ্যত গঙ্গার ধারের থানাগুলিতে। পৌষের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত এক ধরনের হাওয়া জোর এবং অবিরাম চলত, প্রায় সিমুমের মত, যাকে বলত পচ্ছিয়া হাওয়া (পশ্চিমী হাওয়া)। এই হাওয়ার ফলে দিয়ারা অঞ্চলে, বিশেষত কালিয়াচক, মানিকচক থানায়, চলত প্রচণ্ড ধূলার ঝড়। শুকনো ধুলোর ঝড়ের প্রকোপে খড়ের চালের, দরমার দেয়ালের অথবা মাটির দেয়ালের, কুটিরে আপনা আপনি আগুন লেগে যেত। একবার আগুন লাগলে একটা পুরো খড়ের চালা পুড়ে কয়েকমুঠো ছাই হয়ে যেত। প্রৌঢ় বিয়েপাগলা শেরশাবাদিয়াদের মধ্যে একটা রগড়ের খেলার প্রচলন ছিল। পচ্ছিয়া হাওয়া বইতে শুরু করেছে, এমন সময়ে এধরনের খড়ের কুঁড়ে-ঘরে অবাঞ্ছিত বয়স্থা স্ত্রীদের কোনরকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে একবার তার মধ্যে ঢুকোতে পারলে, বাইরে থেকে কপাটে শিকল তুলে দিয়ে খড়ের চালে দেশলাই জেলে আগুন লাগিয়ে দিত। কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিপাটিভাবে কাজ হয়ে যেত, পুলিশে কিছু করতে পারত না। এই ধরনের 'রগড়প্রিয়তা' ছাড়া অন্যসব কাজকর্মে শেরশাবাদিয়ারা ছিল যেমন বিশ্বস্ত, তেমনি পটু ও নির্ভরযোগ্য। যে কোন গঠনমূলক কাজে বিশেষত অর্থকরী উদ্যমে বিশেষ পটু ও অগ্রণী।

মুসলমানদের আরেকটি ছোট, কিন্তু বিশিষ্ট সম্প্রদায় ছিল, নাম নাদেগুষ্টি বা নদেগুষ্টি। প্রবাদ দিল তাদের আদি নিবাস ছিল নদীয়ায়। আরেকটি সম্প্রদায় ছিল মালদার দিয়ারা অঞ্চলের বিশিষ্ট অধিবাসী, হিন্দু, নাম চাঁই মণ্ডল। তাদের সমাজে ছিল চার ঘর : নাগর, চাষী, গঙ্গট, চাষাট। মাদারীপুরের মণ্ডলদের থেকে তারা নৃতত্ত্বশাস্ত্র হিসাবে পৃথক। তাছাড়া ছিল গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর আর পুরাতন মালদা থানার সাঁওতালরা। সাঁওতালদের থেকে সংখ্যা-গৌণ সম্প্রদায় ছিল রাজবংশীরা। তারা ছিল তিন ধরনের : পোলিয়া, দেশী ও কোচ। উচ্চবর্ণদের মধ্যে ছিল বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র। মালদাকে প্রান্তিক বরেন্দ্রভূম বলা যায়।

চৈত্রমাসে চড়ক উৎসবের সময়ে আমরা পুরো এক সপ্তাহ গাজোল থানায় এক সাঁওতাল গ্রামে সাঁওতালদের মধ্যে তাঁবু ফেলে ছিলুম। সাঁওতাল জীবনের সঙ্গে এই হয় আমার প্রথম অন্তরঙ্গ পরিচয়। দিনের বেলা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখতুম তাদের খাবার জলের কুয়ো, চাষের খেত আর তাদের দখলের দলিল। আইনমতে সাঁওতালদের জমি হস্তান্তরিত করা ছিল নিষেধ, তবুও প্রচ্ছন্নভাবে জমির হস্তান্তরকরণ চলত। সন্ধ্যাবেলা শুরু হত নাচগান, হাঁড়িয়া খাওয়া আর সাঁওতাল বাজনা, মুখ্যত বাঁশের বাঁশি ও মাদোল। শুক্লপক্ষে গভীর রাত্রে দূরে যখন বাঁশি ও মাদোল বাজত, ভেসে আসত মহুয়াফুলের গাঢ় গন্ধ তখন মনে, এমন-কি শরীরে সুদ্ধ, একটা অজানা অস্থিরতা আসত, অনেকক্ষণ ঘুম আসত না, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়তুম। প্রতিটি মেয়ে ছিল যেন পাথরে কোঁদা, উড়িষ্যা-মন্দিরভাস্কর্যের আদর্শ। এক সপ্তাহ থাকার পর আমার দৃঢ় প্রতীতি হল সাঁওতালরা পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে সভ্য আত্মসম্মানী সম্প্রদায়। পরে আবার যখন এক সপ্তাহ বামনগোলা থানায় সাঁওতালদের মধ্যে থাকলুম, সে ধারণা আমার দৃঢ় হল। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত আমি কলকাতার নানা দপ্তরে কাজ করি। সেন্সাসে কাজ করার সময়ে এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের অনুগ্রহে অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত, রয়াল সোসাইটির সভ্য এমন-কি নোবেল বিজয়ীদের সঙ্গে আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়। অনেক সময়ে তাঁরা আমার কাছে অন্ত বাঙালী বাড়ি বা গ্রাম দেখতে চাইতেন। জানাশোনা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে নিয়ে যেতে সাধারণত সংকোচ হত। প্রথমত, সাদা চামড়া দেখলেই তাঁদের প্রকাশ পেত ধন্য হওয়া, গলে-পড়া ভাব, যাতে যে-কোন আত্মসম্মানী ব্যক্তি অস্বস্তিবোধ করবে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ সংসারই হত কিছু পরিমাণে অপরিচ্ছন্ন ও বিস্রস্ত। সেই

কারণে অধিকাংশ সময়ে আমি তাঁদের কোন সাঁওতাল গ্রামে নিয়ে যেতুম। তারা তো আমাদের পূর্বপুরুষ একথা মানতেই হবে। গিয়ে তাঁরা বিশেষ পুলকিত হতেন। বাড়িগুলি যেমন পরিষ্কার, তেমনি আবর্জনা বা বাহুল্যহীন, এমন-কি নিরাভরণ বলা যায়। তা সত্ত্বেও বাড়ির দেয়াল, ভিতগুলি, হত অতি পরিচ্ছন্নভাবে লেপা, তার উপরে নানারকম রঙিন জ্যামিতিক ছবি ও ছক, লৌকিক অলঙ্কার বা আলপনা। দেয়ালে লেপের দাগে মনে হত যেন ভ্যান গখের তুলির মোটা পোঁচড়। উপরন্তু, যে প্রথায় তারা আগন্তুকদের মধ্যে শ্বেত-কৃষ্ণ পার্থক্য না করে প্রত্যেককে সমানভাবে অভ্যর্থনা জানাত, তাতে বিদেশীদের মন ভরে যেত। অতিথি গেলেই আসত একটি ঝকঝকে মাজা বড় কাঁসার জামবাটিভরা জল, পা ধোবার জন্য। তার সঙ্গে আসত ঝকঝকে কাঁসার থালায় একটু আখের গুড়, অতিথি মুখে পুরে গৃহস্বামীকে তুষ্ট করবেন। আত্মমর্যাদা ও গাম্ভীর্যের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা, আত্মসচেতনতা নেই, সে যে বয়সের নারী-পুরুষ হোক না কেন। মুখে হাসির রেখা। সব মিলিয়ে অতিথি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। গাজোলে, বামনগোলায় সাঁওতালরা আমাদের খেতে দিত ঢেঁকিছাঁটা সেদ্ধচালের ভাত, এক হাতা ডাল, পাতা দিয়ে একটি তরকারি, ছোট একটুকরো কাঁচা তেঁতুল। পরিবেশন করত ঝকঝকে মাজা কাঁসার থালায়। খাবার জল দিত ঝকঝকে সোনার বর্ণ কাঁসার গেলাসে। মনে হত সব যেন মাজা সোনা। জয়ন্তী বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেত। প্রথম যেদিন এই ধরনের নিমন্ত্রণ খেল তখন তাঁবুতে ফিরে মাকে প্রথম কথাই হল: 'মা, আমরা কেন ওরকম ঝকঝকে সোনার থালায় খাই না! কী সুন্দর আর আশ্চর্য লাগল।'

স্বাধীনতার পরেই নিরক্ষর উপজাতি ও 'নিম্ন'জাতিদের মধ্যে সাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রসারের দাবি ওঠে। ১৯৪৮ সালে মালদা জেলায় সাঁওতাল, রাজবংশী, ও মণ্ডলদের মধ্যে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রগাঢ় উৎসাহ দেখি। প্রথম দাবি ছিল প্রাথমিক স্কুল, দ্বিতীয় দাবি ছিল খাবার জলের ব্যবস্থা, এই যুগে দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বৈচিত্র্য বা প্রাচুর্য ছিল না বললেই হয়। ১৯৫৪ সালে আমি যখন পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিভাগ ছেড়ে যাই তখন অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দাবি শুরু হয়েছে। খুবই সঙ্গত কারণে ১৯৫৪ সালে পুরোগামী দাবিগুলি হল, প্রথম, বাইসিক্‌ল্ (নাগপুর প্ল্যানের কৃপায় রাস্তা-ঘাটের দ্রুত উন্নতি শুরু হয়); দ্বিতীয়, হাতঘড়ি (সময়ের দাম বেড়েছে), তৃতীয়, রেডিও (সংবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় খবরের চাহিদা বাড়ে এবং

জনগণও দ্রুত রাজনীতিমনা হতে শুরু করেছে)। অর্থাৎ এই কয় বছরে মজুরির হার বৃদ্ধি পেয়েছে; নানাবিধ শিল্পসৃষ্টির ফলে বহু সাংসারিক নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য মফস্বল বাজারে আসতে শুরু করেছে। অন্যপক্ষে, প্রাথমিক শিক্ষা আর পানীয় জলের ব্যবস্থা এত শম্বুকগতিতে এগোচ্ছিল যে সাধারণ লোক হতাশ হয়ে পড়ে। এখনও সেই হতাশাই চলছে। এইভাবে যদি চলে তবে বিশ্বব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক এক হিসাবমতে আগামী শতকের গোড়ায় পৃথিবীতে যত নিরক্ষর থাকবে তার অন্তত অর্ধেক থাকবে ভারতে, এবং ভারতের অর্ধেক নিরক্ষর থাকবে পূর্বভারতে।

প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তদানীন্তন একটি আলোচনার স্মৃতি আমার মনে এখনও গেঁথে আছে। শিক্ষার এই ক্ষেত্রটি সম্বন্ধে ঐ আলোচনাটি আজ চল্লিশ বছরেরও পরে আরো যেন বেশী অর্থবহ হয়ে উঠেছে। বিশেষত যুক্ত—ও পরে বামফ্রণ্টের অধীনে গত পনেরো বছর ধরে ভারতের সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের স্থান অন্যরাজ্যের তুলনায় যখন ধড়ধড় করে নেমে যাচ্ছে, অথচ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে, এবং সাক্ষরতা অভিযানের খাতে শিক্ষকদের মাহিনা, সুখসুবিধা, ভাতার উপর খরচ যখন বোঁ-বোঁ শব্দে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, এবং তারা এখন একক হিসাবে সবথেকে বড় ও সর্বত্রগামী রাজনৈতিক 'ক্যাডার' হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাজোল-বামনগোলায় পক্ষকাল থাকার পর ইংরেজবাজারে ফিরে, আগে থেকে পরিচিত সি-পি-আইয়ের একজন সভ্যকে ডেকে পাঠাই। যখন এলেন চেপে ধরলুম। বললুম, এখনও সি-পি-আই বিরোধীপক্ষে, সরকারি নীতি চালু করার দায়িত্ব নেই, কেন তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার দাবি করছেন না। প্রশ্ন করলুম, তিনি স্বীকার করেন কিনা নিরক্ষর ও সাক্ষরের মধ্যে তফাৎ প্রায় জন্মান্ধ ও চক্ষুষ্মান মানুষের মত। ঘাড় নেড়ে আমার উপমাটি মানলেন, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বার সাক্ষাতেও উত্তর মিলল না। তাঁর দেখা পাওয়া তখন দুষ্কর, তার কারণ পার্টি নিষিদ্ধ, তাঁর পক্ষে নিজে আসা উচিত নয়। তৃতীয়বার যখন কোনমতে তাঁর দেখা মিলল, তিনি লাজুকভাবে আস্তে করে বললেন, 'কি জানেন, মিঃ মিত্র, আমাদের নেতারা প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি জোর দিতে নারাজ। তাঁদের আশঙ্কা একেবারে নিচের স্তরের ছেলেপুলেরা লেখাপড়া শিখতে শুরু করলে, শুধু তারা নয়, তাদের বাবা-কাকারাও বিনা বিচারে নেতাদের কথা বেদবাক্য বলে মেনে নেবে না। উল্টে তর্ক করার প্রবৃত্তি বাড়বে।' আমি বললুম, কেরলে তো বহুদিন

থেকে সাক্ষরতা বেশী, তাহলে কেরলে কেন কম্যুনিস্ট আন্দোলনের এত প্রতাপ? সে-প্রতাপ কি সাক্ষরতা থেকে আসেনি? ভদ্রলোক (কম্যুনিস্টরা তখনও 'ভদ্রলোক' বলে সম্বোধিত হলে আপত্তি করতেন না) চুপ করে রইলেন। তাঁর এই উত্তর এককথায় মার্ক্সের সারপ্লাস ভ্যালুর সারা জগৎটি আমার মনে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হল, কারণ সমাজের নিম্ন ও নিম্নতম আর্থিক ও সামাজিক স্তরের লোককে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রাখতে নিরক্ষরতার মত অন্যকিছু অত মোক্ষমভাবে সাহায্য করে না। জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয় এমন মজুরিতে, এমন-কি চিরকালের জন্য ঋণে বাঁধা রেখে বেগার খাটিয়ে, অনায়াসে প্রাপ্য বাড়তি-কর্মিদের অফুরন্ত ভাণ্ডার মজুদ রাখার পক্ষে নিরক্ষরতার মত এতবড় সহায় আর কিছু নেই। সে আধপেটা খেয়ে আপনার জমিতে অমানুষিক পরিশ্রমের জন্যই হোক, অথবা বিনাবাক্যে আপনার আদেশ শিরোধার্যের জন্যই হোক। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের বিরুদ্ধে সরকারি ও বেসরকারি মহলে এই অনীহা এমন-কি বিরোধিতার আর্থিক ও অন্তর্নিহিত ভিত্তি হচ্ছে মার্ক্সের সারপ্লাস ভ্যালু। বিদ্যালয়ে চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষা দেয় মানুষকে বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান, নিজস্ব বিচারের শক্তি, ঔৎসুক্য, জাগতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা। শিক্ষিত পিতামাতা চাইবেন শিক্ষিত সন্তান, শিক্ষিত সন্তানের আকাঙ্ক্ষাই আনবে জন্মনিয়ন্ত্রণেও ইচ্ছা, কারণ সন্তানকে শিক্ষিত করা প্রভূত খরচসাপেক্ষ। শিশুর মেহনতে সংসারে সাশ্রয় আসার পথ রোধ হয়। অধুনা সাক্ষরতা অভিযানের রংদার, প্রভূত অর্থনষ্ট ও অপচয়সাপেক্ষ প্রচারের প্রলেপ দিয়ে, নিজের প্রিয় পোষ্যদের পিছনে অজস্র টাকা ঢেলে, বহু-কীর্তিত প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার নামে আমাদের চিরাচরিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করা সম্ভব হবে, উপরন্তু লোকহিতব্রতে সমস্ত কিছু শক্তি উৎসর্গের দাবিও সার্থক হবে।

রাজনৈতিক দলাদলি ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

জেলায় কাজ করার সময়ে সহমর্মী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পাবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। ভাগ্যবলে মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় কাজ করার সময়ে মদন হুজা আর মুসা আহমদের মত বন্ধু ও সহকর্মী পেয়েছিলুম। মালদায় গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীকে

এস-পি পেয়ে আমার অর্ধেক উদ্বেগ যেন চলে গেল। জীবনের অনেক বছর তিনি রাজনৈতিক (আই-বি) ও আইনশৃঙ্খলার (সি-আই-ডি) গোয়েন্দা বিভাগে কাটিয়েছিলেন। স্বাধীন মালদার প্রথম এস-পি হয়ে তিনি যেন নিজেকে মুক্ত-পুরুষ বোধ করলেন। পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস জন্মানর পর স্থির করলুম সপ্তাহখানেকের জন্য কলকাতা গিয়ে ভাঙাচোরা জীপ ও ওয়েপন ক্যারিয়ার-গুলি জমা দিয়ে কয়েকটি ভাল অবস্থার গাড়ি নিয়ে আসব। চিঠি লিখে একাজ করতে গেলে মাসের পর মাস কেটে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি-সি রায়, চীফ সেক্রেটারি স্কুমার সেন ও হোম সেক্রেটারি রণু গুপ্ত আমার প্রয়োজন বুঝলেন। কলকাতা থেকে একদিন ভোরে সাঙ্কেতিক রেডিওগ্রামে খবর পেলুম, যে-কয়টি ভাঙা গাড়ি ফেরত দেব, প্রতিটির বদলে একটি ভাল গাড়ি পাব, উপরন্তু একটি বাড়তি জীপও পাব।

১৯৪৮ সালের প্রথমার্ধে স্থলপথে মোটরে চড়ে কলকাতা যাওয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রার সামিল ছিল। শুনলুম ইতিহাসে এই প্রথম স্থলপথে, গঙ্গা পার হয়ে, মোটরে করে ইংরেজবাজার থেকে কলকাতা যাবার প্রস্তাব করেছি। এক ইঞ্চিতে চার মাইল হারে একটি পুরো সেট বিশদ ভৌগোলিক বিবরণীসহ টোপোগ্রাফিক মানচিত্র নিলুম। তার সঙ্গে গাঁইতি, কোদাল, শাবল, খোন্তা ইত্যাদি রাস্তা সাফ করার অথবা ধানজমির উপর আল কেটে কোনমতে জীপ চলার মত কাঁচারাস্তা তৈরির যন্ত্রপাতি। গোপাল চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে দু'জন বন্দুকধারী সেপাই আর-এক হাবিলদার দিলেন। আমরা অভিযানে রওনা হলুম। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ও ধুলোর যথেষ্ট দাপট ছিল, কিন্তু মোটে খারাপ লাগেনি। প্রতিদিন ভোরে স্নান করে কিছু খেয়ে যাত্রা শুরু করার একঘণ্টার পর আভা, জয়তী আর আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপাদমস্তক ধুলোয় ভর্তি হয়ে ভূতের মত দেখতে হতুম। মালদার খেজুরিয়াঘাট থেকে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কাঘাট পার হওয়া একটি বিরাট পর্ব হল। ফারাক্কাঘাট থেকে নিমতিতা, জঙ্গীপুর হয়ে আমরা বহরমপুর যখন পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বহরমপুর সার্কিট হাউসে এবং মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আগে থেকে খবর দিয়ে-ছিলুম। মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত যত্ন করলেন; বহরমপুর সার্কিট হাউসে আমরা প্রথম রাত্রি কাটালুম। প্রবাদ আছে বহরমপুরের সার্কিট হাউসটি ক্লাইভের আদেশে তৈরি হয়। এখন তার উপরতলা ও নিচের তলার অর্ধেক নিয়ে হয়েছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থাকার বাড়ি, বাকি একতলার

অর্ধেক সার্কিট হাউস হিসাবে ব্যবহার হয়। পরের দিন মুর্শিদাবাদ থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত রাস্তা ছিল চলনসই। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি।

ফিরতি পথে আমাদের কনভয়ে ছিল তিনটি ওয়েপন ক্যারিয়ার আর দুটি জীপ। সবগুলির অবস্থা মোটামুটি ভাল। নিজের ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা যদি কারোর থাকে, তার কিছুটা অপব্যবহার কোন-না-কোন সময়ে হবেই। আর সে অপব্যবহারের স্বপক্ষে অজুহাতের অভাব হয় না। মাথায় চাপল, ফেরার পথে বর্ধমানে শ্বশুরবাড়িতে সকলকে একবার দেখে গেলে মন্দ হয় না। অনেকদিন দেখা হয়নি। অতএব মনকে বোঝালুম নতুন গাড়ির পক্ষে কলকাতা-কৃষ্ণনগর-মুর্শিদাবাদের রাস্তার থেকে কলকাতা-বর্ধমান-কাটোয়ার রাস্তা ধরে ভাগীরথী পার হয়ে পলাশী থেকে মুর্শিদাবাদের রাস্তা আরো ভাল হবে। বর্ধমান, কাটোয়া হয়ে ভাগীরথী পার হয়ে পলাশী পর্যন্ত বেশ গেলুম। পলাশীতে যখন পৌঁছলুম সন্ধ্যা সাতটায়, তখন ঘন অন্ধকার হয়ে গেছে। পলাশী থেকে বেলডাঙ্গা একটি বিরাট তেপান্তরের মত মাঠ, যার বুকে দিগ্‌দর্শনী নিশানা খুবই কম, বসতিবিহীন বললেই হয়। ফলে দিক্‌ভ্রম হয়ে গেল। পকেটের কম্পাসে বিশেষ ফল হল না। ঘোর কালো রাত্রি। রাত্রি সাড়ে আটটার সময়ে দিশাহারা হয়ে প্রমাদ গণছি এমন সময়ে একটি লোকের সঙ্গে দেখা। রাস্তা জিজ্ঞেস করায় বলল আমরা উল্টোপথে যাচ্ছি। তার কথামত আমরা গাড়িগুলি ঘুরিয়ে যখন শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ পৌঁছলুম তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। এবারেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী অত্যন্ত যত্ন করলেন; চটপট সব কিছু আয়োজন করে একঘণ্টার মধ্যে আমাদের খুব ভাল করে খাইয়ে দিলেন। উনুন থেকে সদ্যনামানো ভাত, সেদ্ধ আলু, ডিম আর মাখন। অমৃতের মত লাগল। পেট ভরে খেয়ে খুব ঘুমোলুম।

পরের দিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নমস্কার করতে সার্কিট হাউসের একতলায় তাঁর বাড়ির খাসকামরায় গেলুম। ঘরটি প্রকাণ্ড। কিংবদন্তী আছে ক্লাইভ ঘরের চকমিলানো অংশটি একটি বিরাট জলের চৌবাচ্চা বা সুইমিং পুল হিসাবে তৈরি করিয়েছিলেন। বাইরে থেকে ঘরে ঢুকতেই তিনদিক ঘিরে ছিল খিলান-দেয়া একটি বারান্দা; প্রতিটি খিলান ছিল পদ্মকাটা পাড় দেয়া। ঢুকতে হত দক্ষিণদিকের ঘেরা বাগান থেকে ঘরের মাঝখানে ফোটানো প্রকাণ্ড একটি উঁচু দরজা দিয়ে, ফরাসীমতে যাকে বলে ফ্রেঞ্চ উইন্‌ডো। দরজাটি যেমন চওড়া তেমন উঁচু; ক্লাইভ নাকি বাইরে থেকে ঘোড়ায় পিঠে চড়ে ঘরে ঢুকে ঘোড়ার পিঠ

থেকে সোজা জলের মধ্যে ঝাঁপ দিতেন। পরবর্তীকালে সুইমিং পুলটি ভরাট করে প্রকাণ্ড একটি হলঘর তৈরি হয়, বাদশাদের ছোট সাইজের দেওয়ানি-আমের মত, অর্থাৎ প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে আবার খিলান-দেয়া খোলা ঘর। ভিতরকার দরজা দিয়ে খাসকামরায় ঢুকে দেখি সারা হলটির জানালাদরজা কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বসে আছেন সবুজ বনাতে মোড়া একটি বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের অপর পাশে। মাথার ঠিক উপরে ছাত থেকে তার দিয়ে ঝোলানো, গাঢ় সবুজ রঙের কাঁচের চোঙার মত শেড-লাগানো একটি বিজলি বাতি, যাতে আলোটি সোজা টেবিলের উপর তাঁর সম্মুখে পাতা কাগজের উপর পড়ে, চারিদিকে না ছড়িয়ে যায়। তাঁর পিছনে দেয়ালে টাঙানো একইঞ্চি এক মাইল মাপের মুর্শিদাবাদ জেলার প্রকাণ্ড একটি ম্যাপ, তার গায়ে নানা রঙের মুণ্ডি দেয়া পিন সাঁটা, বিশেষত রাজশাহী জেলার সীমার উল্টোদিকে পদ্মার দক্ষিণ পাড়ে লালগোলা, ভগবানগোলা, জলঙ্গী থানার। পরে যখন তাঁর কাছ থেকে চার্জ নেবার জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এলুম তখনও দেখি তিনি টেবিলের ওপাশে একইভাবে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এবার মাথায় একটি পুরনো টোল খাওয়া জার্মান নাৎসি হেলমেট, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কুড়িয়ে পাওয়া স্মৃতিচিহ্ন, আইভান স্থরিটার দেয়া উপহার। দেখে, মুহূর্তের জন্য হতবাক হতে হয়।

কলকাতায় থাকার সময়ে ডাঃ রায়কে গদিচ্যুত করার প্রথম জোর প্রয়াসের কথা শুনলুম। লম্বা, জটিল কাহিনী, এ রাজ্যের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী। এককথায় বলতে গেলে ডাঃ রায় সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেন। ২২ এপ্রিল অমরকৃষ্ণ ঘোষ, কংগ্রেস পার্টির মুখ্য হুইপ, ডাঃ রায়ের প্রতি অনাস্থাকল্পে চমকিয়ে দেবার মত লম্বা এক সইয়ের তালিকা সংগ্রহ করেন। সইগুলির মধ্যে ছিল দু'জন মন্ত্রী ও তিনজন পার্লামেণ্টারি সচিবের। ২৬ এপ্রিল ডাঃ রায় এক বিবৃতি দিলেন, যাঁরা সই দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের সই প্রত্যাহার করেছেন। আরো বললেন, যে গুজব উঠেছে যে সইয়ের তালিকায় তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েকজন মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি তাঁদের সই দিয়েছেন, সে বিষয়ে তিনি যথাযথ ব্যবস্থার চিন্তা করছেন, কারণ তাঁদের এই সিদ্ধান্তের ফলে সংবিধানের কতগুলি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে।

দুই পক্ষই লড়াইয়ের জন্য উন্মুখ বলে মনে হয়েছিল। ৫ মে ডাঃ রায়ের

বাড়িতে কংগ্রেস বিধায়কদের এক বৈঠক বসে। উপস্থিত থাকেন ৫৩জন সদস্য, আর চারজন মন্ত্রী যাঁরা এম-এল-এ নন। তিনজন মন্ত্রী—ভূপতি মজুমদার, হেমচন্দ্র নস্কর, মোহিনীমোহন বর্মন—বৈঠকে আসেননি। কংগ্রেস অ্যাসেম্বলি পার্টির সচিব দেবেন সেন, মুখ্য হুইপ অমর ঘোষ, ডাঃ রায়ের চালমাৎ করার কথা শোনামাত্র তাঁদের অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন। ডাঃ পি-সি ঘোষ ও জে-সি গুপ্ত প্রভৃতি এই প্রত্যাহার সমর্থন করেন।

ডাঃ রায় সময় নষ্ট না করে ৫ ও ৬ মে ভূপতি মজুমদার (উনি আগেই ইস্তফা দিয়েছিলেন), হেম নস্কর ও মোহিনী বর্মনকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করলেন। ১৯৪৯ সালে যখন সরকারি সফরে মুর্শিদাবাদে আসেন তখন হেমচন্দ্র নস্কর নিজে আমাকে গল্প বলেন, কী উপায়ে তিনি ডাঃ রায়কে তুষ্ট করেন। বরখাস্তের কথা শুনেই, সেদিন সন্ধ্যায় ভাইপো অর্ধেন্দু নস্করকে নিয়ে তিনি ডাঃ রায়ের বাড়ি যান। ডাঃ রায়ের দপ্তরের বন্ধুভাবাপন্ন কর্মচারির সাহায্যে তিনি চুপচাপ ডাঃ রায়ের শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। ডাঃ রায় অত্যন্ত উষ্মার ভান দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, 'অন্যদের কথা না হয় বুঝলুম, এর মধ্যে, হেম, তুমিও ছিলে? হতভাগা, অকৃতজ্ঞ, কী করে এরকম কাজ করতে পারলে?' ইত্যাদি ইত্যাদি। বকুনির তোড় চলেছে আর হেমবাবু অনুতপ্ত গলায় অনুনয় করে চলেছেন, 'শুনুন, ডাঃ রায়, একটিবার আমার কথা শুনুন, তারপর বিচার করবেন।' রাগ করে গাল দেয়া কমলে, ডাঃ রায় বললেন, 'শুনব আবার কী? শোনার আছে কী?' তখন এল লাখ কথার এক কথা, 'তবে বলি, শুনুন, ডাঃ রায়, ওরা যে বলল আপনার হার অনিবার্য, সেজন্যই তো আমি সই দিয়েছিলুম। আপনি কি মনে করেন আমি এতই বোকা, ঘুণাক্ষরেও যদি জানতুম যে অনাস্থা প্রস্তাব টিঁকবে না, তা সত্ত্বেও আমি সই দিতুম!' প্রত্যুত্তরে ডাঃ রায়ের হো হো করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠা ছাড়া আর কী গতি ছিল, বলুন! কয়েকদিন পরে হেম-নস্করকে মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে নিলেন।

আরেকটি গল্প না বলে পারছি না, এও তাঁর নিজের মুখে শোনা। এটিও হেমবাবুর রাজনৈতিক অবিনশ্বরতা ও সবকিছু অবস্থায় চিরপ্রস্তুতি সম্বন্ধে। কথায় কথায় গর্ব করে বলতেন তিনি দেশসেবা শিখেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পদতলে বসে। কলকাতার মেয়র পদে নির্বাচনপ্রার্থী হলেন। বিপক্ষে ছিলেন এক মহারথী, হেমবাবুর জয় হবে মোটেই জোর করে বলা যায় না। নির্বাচনে তাঁর জয় হল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে

বিনয়ভাবে নম্রকণ্ঠে সকলকে ধন্যবাদ জানালেন। সভার সকলে অবাক, তিনি এত নিশ্চিত হলেন কী করে যে আগে থেকে ধন্যবাদজ্ঞাপনটুকুও লিখে এনেছেন! তলে তলে নিশ্চয় কিছু কু-কাজ করেছেন। যেই পড়া শেষ হওয়া সকলে তাঁকে ছেঁকে ধরল। হেমবাবু যেন এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। পাঞ্জাবির অন্য পকেট থেকে আরেক টুকরো কাগজ বার করে সকলের নাকের ডগায় নেড়ে বললেন, 'মিথ্যেই কি দাশ মশায়ের পদতলে শিক্ষা নিয়েছি! এই দেখ, ডান পকেটে জয়, বাঁ পকেটে পরাজয়। যদি হারতুম, এটি পড়তুম।' সকলের অট্টহাসিতে ছাত ভেঙে পড়ল।

ইতিমধ্যে—পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের ঢেউ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নানা উপায়ে এই ঢেউ শান্ত করার চেষ্টা করে চললেন। ডাঃ রায়ের পীড়াপীড়িতে পণ্ডিতজী পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে ঢাকায় ভারতের একজন ডেপুটি হাই কমিশনার নিতে রাজি করালেন। কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র সন্তোষকুমার বসু ডেপুটি হাই কমিশনার নিযুক্ত হলেন। ১৯৪৮-এর এপ্রিল মাসে দুই ডোমিনিয়নের একটি বৈঠক হল। ১৮ এপ্রিল, ১৯৪৮-এ একটি বিস্তারিত চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও উদ্বাস্তুদের স্রোত কমল না। ১৯৪৮-এর অগাস্টে উদ্বাস্তুদের ঢেউ তুঙ্গে উঠল। ১৯৪৮-এর অক্টোবরের মধ্যে কলকাতা এবং আশেপাশের জেলাগুলিতে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চাশটি উদ্বাস্তু ক্যাম্প ভর্তি হয়ে উপছিয়ে পড়ল। ভাগ্যক্রমে মালদায় কোন ক্যাম্প খুলতে হয়নি। উদ্বাস্তুরা এসে হয় আত্মীয়দের সাহায্যে বাস শুরু করল, না হয় ইতস্তত ছড়িয়ে নতুন ঘর বাঁধলেন।

মালদায় থাকতে কতগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলি। ১৯৪৭-এ দেশভাগের কিছুদিনের মধ্যেই বিস্তৃত অঞ্চল ধরে পাকিস্তানের কাশ্মীর সীমান্তের ওপার থেকে হামলা শুরু হয়। ১৯৪৭-এর ২৫ অক্টোবর হামলাকারীরা শ্রীনগরের পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বারামুল্লা শহরে পৌঁছয়। ১৯৪৭-এর ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠানিকভাবে কাশ্মীর ভারতের সামিল হয়। ২৭ অক্টোবর হামলাদারদের হঠাবার উদ্দেশে ভারত কাশ্মীরে সৈন্য পাঠায়। ১৯৪৮-এর ১৬ অগাস্ট সিংম্যান রী সোল শহরে দক্ষিণ কোরিয়াকে কোরীয় প্রজাতন্ত্র বলে জারি করেন। এর কিছু পরে ৯ সেপ্টেম্বর উত্তর কোরিয়ায় প্রজাতান্ত্রিক

গণতন্ত্ররাজ্যের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়, সেইসঙ্গে সারা কোরিয়ার সার্বভৌমত্ব দাবি করা হয়। ১৯৪৮-এর ১৭ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ফৌজের কাছে দক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ রাজ্য আত্মসমর্পণ করে, ও ভারতীয় ইউনিয়নের সামিল হবার সম্মতি জানায়। মালদার প্রধান উকিল পঞ্চানন মজুমদার মুখ ফসকে একটি মজার শব্দ উচ্চারণ করেন: 'হিজ এক্সহস্টেড্ হাইনেস' (বৃটিশরা নিজামকে 'হিজ এক্জল্টেড হাইনেস' পদবী দিয়েছিল)। আমেরিকার আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হ্যারি ট্রুম্যান ১৯৪৮-এর ২ নভেম্বর নিজেকে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেন।

আমের ফসল ও অর্থাগম

মালদার উন্নতিকল্পে একটি বিষয়ে আমার কিছুটা অবদান ও নেতৃত্ব আছে বলে হয়তো দাবি করতে পারি। সারা জেলাময় প্রায় পঞ্চান্নটি বিভিন্ন জাতের আমের ফলন হত, তারমধ্যে সবথেকে প্রসিদ্ধ ছিল বৃন্দাবনী, গোপালভোগ, ক্ষির-সাপাতি ও ফজলী। ফজলী আমের আকার থেকেই ইংরেজিতে পেজ্‌লি (paisley) নক্শার সৃষ্টি হয়। ফজলী আমের কল্যাণে আমের মৌসুম অগাস্টের শেষ পর্যন্ত গড়াত। মালদায় যাবার কয়দিনের মধ্যেই আমি যখন পুরাতন মালদা বা নিমাসরাই যাই, তখন স্থানীয় নেতারা যত্ন করে আমাকে যেখানে প্রথম ফজলী আমের কলম লাগানো হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে, সে স্থানটি দেখান। পুরাতন মালদা ছিল ইংরেজবাজার থেকে অনেক প্রাচীন, সেখানে বহু পুরাকাল থেকে দাদনদার মহাজনদের ছিল বড় বড় আড়ত, সেই সঙ্গে স্বভাবতই ছিল বিস্তৃত সোনারুপার বন্ধকী কারবার। একটি মজার গল্প প্রচলিত ছিল। ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হবার পর, অন্যান্য রাজকর্মচারিদের দুর্নীতিমূলক আচরণ কমলেও, নিম্নস্থানীয় পুলিশ, বিশেষত দারোগাদের উপদ্রব ছিল অব্যাহত। পুরাতন মালদা থানায় এক দুর্ধর্ষ পুলিশ অফিসার ছিলেন। প্রবাদ আছে, একদিন ভর দুপুরবেলা তিনি বড় রাস্তার সবথেকে ধনী মহাজনের গদিতে গিয়ে তাঁকে সিন্ধুক থেকে সব গচ্ছিত সোনারুপা বার করতে আদেশ করেন। সেই সঙ্গে আদেশ করেন ঐ দুপুরের রোদে সারা দোকানময় অনেক বাতি জ্বালিয়ে দিতে। বাতি জ্বালা হলে তিনি ধীরেসুস্থে দিনের ও বাতির আলোয় সমস্ত গহনাপত্র পরীক্ষা করে সেগুলি পোটলা বেঁধে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান করলেন। গৃহস্বামীকে বললেন, তিনি যেন কোন আদালতে নালিশ করার

কল্পনাও না করেন ; কারণ ঠিক দুপুরবেলার কটকটে রোদে বড় রাস্তার উপরে সারা দোকানময় বাতির ঝাড় জ্বালিয়ে কেউ ডাকাতি করতে পারে, একথা বিশ্বে কোন হাকিম বিশ্বাস করবে না। এডগার অ্যালান পো'র "দি পার্লয়নড্ লেটারে"র কথা মনে পড়ল।

সে যাই হোক। পূর্ব-পাকিস্তানে, বিশেষত যে-সব জেলা পদ্মা ও মেঘনার তীরে অবস্থিত ছিল, সেগুলিতে গোপালভোগ ও ফজলী আমের চাহিদা ছিল। মুন্সীগঞ্জে থাকতে আমের ব্যাপারীদের কাছে শুনেছি, নদীর হাওয়া লেগে নৌকার আম ভাল থাকে, এবং প্রায় গাছপাকার মত ভাল স্বাদ হয়। ১৯৪৮ সালে মালদার আমের ব্যবসায়ীরা কালেক্টরের কাছে প্রস্তাব করল সকলে মিলে একটি আম-রপ্তানি সমিতি করবে, এবং তাদের পক্ষ নিয়ে যদি আমি পূর্ব-পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে ব্যবস্থা করি। সেই সঙ্গে সমিতি হিসাবেও তারা পূর্ব-পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষদের কাছে যাতায়াত করবে। প্রস্তাবটির অনুসরণে মালদা জেলার উন্নতিকল্পে একটি স্থানীয় ফাণ্ড তোলার সুযোগ দেখলুম, যে-ফাণ্ডের কল্যাণে জেলার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনমত টাকা দেয়া যায়। পূর্ব-পাকিস্তানে আম রপ্তানির ব্যাপারে কালেক্টরের সাহায্য মিলবে, তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার হিসাবে আম-রপ্তানি সমিতি নিজেরা সব কিছুর হিসাব রাখতে প্রতিশ্রুত হলেন, এবং আমের ঝুড়ি পিছু মাত্র এক আনা করে কালেক্টরের উন্নতি ফাণ্ডে চাঁদা দিতে স্বীকার করলেন। রপ্তানি ব্যবসা এত ফেঁপে উঠল যে সমিতি নিজের থেকেই চাঁদার হার ঝুড়ি পিছু এক আনা থেকে আট আনা করে দিলেন। ১৯৪৮ সালের আমের মৌসুমে এই উপায়ে মোট পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা, ১৯৪৯ সালে হয় সাতান্ন হাজার, ১৯৫০-এ বিয়াল্লিশ হাজার, ১৯৫১-তে বিরাশী হাজার, ১৯৫২-তে এক লাখ ফাণ্ডে জমা হয়। এই চাঁদা থেকে অনেক প্রতিষ্ঠান একে একে সাহায্য পায়, তার মধ্যে সব থেকে বেশী সাহায্য পায় মালদা কলেজ ও বার্লো বালিকা বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত বলি, ১৯৪৮-এ কালেক্টরের বাড়ির হাতার মধ্যে বৃন্দাবনী গাছে অনেক বছরের পর খুব ভাল ফলন হয়। এই গাছের আম আমরা কী কাজে লাগাই তার বিবরণ পাঠক এই অধ্যায়ের শেষে মুদ্রিত, ১৯৪৮ সালের ৩ ডিসেম্বর জেলাত্যাগের সময়ে আমার উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ যে মন্তব্যগুলি রেখে যাই, তাতে পাবেন।

আমার এগারো মাস অবস্থানকালে সেপ্টেম্বর মাসে খরবা, রতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচক ও ইংরেজবাজার থানার উত্তরাংশে যে ভয়াবহ প্লাবন হয় তাতে

মালদা বিশেষভাবে পর্যুদস্ত হয়। মালদায় গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই দুই ঋতু কোন কোন বছর বেশ দুঃসহ হয়। হাওয়া খুব গরম হয় এবং সেই সঙ্গে অত্যন্ত গুমোট ও ভ্যাপসা। দিনে ও রাত্রে তাপমাত্রায় পার্থক্য সাধারণত দু' তিন ডিগ্রির বেশী হত না। আপাতদৃষ্টিতে অসুস্থতার কোন কারণ নেই, অথচ গ্রীষ্মের শেষে, বর্ষা পড়ার সঙ্গে জয়তীর জ্বর শুরু হল, প্রায় সারাদিনই একজ্বরী থাকত। জেলার সরকারি বড় ডাক্তার, সিভিল সার্জন, তাকে একাধারে টনসিলাইটিস, রক্তামাশয়, জণ্ডিস ও প্যারাটাইফয়েড সন্দেহে ওষুধের পর ওষুধ দিয়ে চললেন। জ্বর তবু থামে না। শেষে ডাক্তার সাহেব পরিচিত বন্ধুদের বললেন, বেচারী জয়তীর যকৃতের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ভাগ্যক্রমে জে-এন তালুকদার কার্যোপলক্ষ্যে এসে বললেন, আর কিছু নয়, এই ঋতুতে ছোট ছেলেমেয়েদের ওরকম হয়, কিছুদিনের জন্য ওর স্থান পরিবর্তন প্রয়োজন। ওষুধের দরকার হবে না। যে-কোন স্থানে পাঠালেই হবে। আমরা যাতে ওকে বর্ধমানে আমার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসতে পারি, তার জন্য তিনি কলকাতায় আমার কাজে যাবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর অনুগ্রহে শাশুড়িঠাকুরণের কাছে জয়তীকে রেখে এলুম। বর্ধমানে পৌঁছবার তিনদিনের মধ্যে জয়তীর জ্বর ও যাবতীয় উপসর্গ উবে গেল। চার-পাঁচদিনের মাথায় বর্ধমানের বাড়ির উঠোনস্থিত টিউবওয়েলের নিচে মাথা পেতে কুড়ি মিনিট ধরে মহানন্দে স্নান করত, তার দিদিমা তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতেন। সম্ভবত এইসব ক্ষেত্র মনে রেখেই প্রাচীন গ্রীসে একটি কথার চলন হয়, যেটি বর্তমানকালে চিকিৎসাশাস্ত্রে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে—আয়াট্রোজেনিক, অর্থাৎ যে-সব অসুখের উৎপত্তি হয়, হয় ভুল ওষুধ থেকে, নয় ভুল চিকিৎসা থেকে।

সেপ্টেম্বরের প্লাবন

কলকাতায় চারদিন থাকার মাথায় মালদা থেকে এক রেডিওগ্রাম পেলুম, সারা জেলায় প্রচণ্ড প্লাবন হয়েছে। আমার বাড়ির সমুখে মহানন্দার বাঁধ ভাঙে ভাঙে অবস্থা। কলকাতা থেকে মালদায় ফেরার ট্রেন যেই সকালে খুমেদপুর স্টেশনে পৌঁছল দেখি কাতারে কাতারে লোক স্টেশনে হাজির, পীড়াপীড়ি, আমাকে নেমে অবস্থাটি স্বচক্ষে একবার দেখে যেতে হবে। বিপদে সমবেদনার জন্য আগ্রহ নিশ্চয় স্বাভাবিক, কিন্তু ইংরেজবাজার বাঁচানো ছিল তখন সবথেকে জরুরী,

কারণ ইংরেজবাজারে মহানন্দার বাঁধ ভাঙলে সারা জেলার মনোবল ভেঙে যাবে, সুষ্ঠুভাবে ত্রাণকার্য সম্ভব হবে না। সুতরাং প্রতি স্টেশনে এই ধরনের অনুনয় উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়ে, ইংরেজবাজারে নেমে সোজা মহানন্দার বাঁধ রক্ষার্থে যেখানে মাটিভরাটের কাজ হচ্ছিল সেখানে গেলুম। নিজের হাতে কত মাটি কেটেছি বা ভরেছি তা আমিই জানি, তবে কাজের ভান করেছি প্রচুর : যেমন মজুররা যেখানে মাটি বা পাথরের ঝুড়ি মাথায় তুলছে, তাদের মাথায় সেটি তুলে দিতে সাহায্য করার ভান। তবে দুপুর থেকে সারা রাত পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ও জেগে থেকে তাদের সঙ্গে চলাফেরা করেছি। এর দরুণ কাজে ঢিলে পড়েনি। মজুরদের ও ঠিকাদারদের আপ্রাণ চেষ্টায় মহানন্দার বাঁধ সে রাত্রে টিকে গেল, ইংরেজবাজার শহর বাঁচল।

শহর বেঁচে গেল, কিন্তু আমার যা কিছু সঞ্চয়—বারো শ' টাকা—যা স্থানীয় 'কলকাতা কমার্শিয়াল' ব্যাঙ্কের শাখায় ছিল, তা গেল। তার আগের দিন থেকে শুরু করে, যেদিন মালদায় পৌঁছলুম, সেদিন সারাদিন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার হিড়িকে, বিকালে ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করল। পরের দিন কাগজে দেখি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া প্রার্থনা করে আদালতে দরখাস্ত করেছে। আরেকজন অফিসার —নাম ছিল সুধাংশুমোহন গাঙ্গুলী, খুব ভাল থিয়েটার করতেন—প্রায় সর্বস্ব হারালেন, বহু বছর ধরে মেয়ের বিয়ের জন্য যে যৌতুক সঞ্চয় করেছিলেন, তাও।

মালদার প্লাবনের বীর হল জীতেশ তালুকদার। ছোটখাটো বীর হল অল্প-বয়স্ক কয়েকজন কেরানী, নাজির, সহকারী নাজির, কয়েকজন পিওন। প্রতিদিন সন্ধ্যায়, প্রায় ষোল ঘণ্টা ঘোরাঘুরি এবং মোটামুটি অনাহারের পর জীতেশ রাত্রে এসে আমাকে সবকিছু ত্রাণকাজের রিপোর্ট দিত। বগলে থাকত লেখার জন্য কাঠের বোর্ড, কাগজ, হাতে কলম। সব কিছুর তন্ন তন্ন করে বিবরণ দিত। পরের দিন কী করতে হবে তার সিদ্ধান্ত হত। কী ধরনের, কতখানি খাদ্যদ্রব্য, চিকিৎসার সরঞ্জাম, জীবাণুনাশের ওষুধপত্র, শুকনো খাবার, গুঁড়ো দুধ, প্রতিষেধক, মানুষ ও জন্তুর টীকা ইত্যাদি, কোথায়, কেমনভাবে, কত পরিমাণে পাঠাতে হবে তারই বিশদ ফর্দ। এত নিবেদিতপ্রাণ হয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে, নিজের স্বাস্থ্য তুচ্ছ করে কাজ করত, যে তার স্বাস্থ্য বিষয়ে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লুম। এক রাত্রির ঘটনা বললেই পাঠক বুঝতে পারবেন, কেন। জেলার অন্যত্র বানের প্রকোপ ও ত্রাণব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য একদিন দুপুরের ট্রেনে আমরা কুমারগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে গেলুম, কয়েকদিন চারদিকে ঘুরে-ফিরে বেড়াব এই

আশায়। আভা সঙ্গে ছিল, জয়ন্তী তখন বর্ধমানে। রেলওয়ে লাইন এবং স্টেশন একমাত্র স্থান ছিল যা বানে ডুবে যায়নি। স্টেশনের যে ঘরটি অপেক্ষা করার বা মালপত্র রাখার জন্য ছিল তাতে ত্রাণকাজের যাবতীয় সামগ্রীর ভাণ্ডার ছিল বলে সর্বদা তালাচাবি দেয়া থাকত। খোলা প্ল্যাটফর্মে, আকাশের তলায় শোয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না; দুর্ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি পড়লে সরু ঢাকা বারান্দায় গুটিগুটি বসে থাকার জায়গা ছিল। জীতেশ ভোরের আগে রওনা হয়ে গেছে মালগাড়ির গার্ডের কামরায় চড়ে, রাত বারোটার আগে ফিরবে না শুনলুম। খোলা প্ল্যাটফর্মে আমাদের চারপাশে ত্রাণকাজের পিয়ন ও আমাদের চাপরাশিরা ঘুমোচ্ছে। মধ্যরাত্রে জীতেশ মালগাড়িতে এসে হাজির। আভা অনেক বলে-কয়ে একটু হাতেগড়া রুটি, ডাল, তরকারি, আর চা খাওয়াল। আমাদের পাশে আরেকটি চারপাইতে শুল। ভোর চারটে, আমরা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছি, জীতেশ জামাকাপড় পরে তৈরি। আভা ঘুম ভেঙে উঠে কোনরকমে স্টোভ জেলে তাকে একটু চা আর বাসি রুটি খাইয়েছে, এমন সময়ে ট্রেন এসে হাজির। এইরকম একপক্ষকাল চলল যতক্ষণ না বান নেমে গেল, জেলাটি বেঁচে গেল।

কুমারগঞ্জ থেকে আমরা ছোট নৌকায় এদিক ওদিক ত্রাণকার্য দেখতে যেতুম। খানিকটা জলিবোটের মত গড়ন, তার পিছনে দড়ি দিয়ে আউট-বোর্ড মোটর বাঁধা, পেট্রোলে চল্‌ত। মাঝিরা বেশ নিপুণ ছিল, প্রমাণ পাওয়া গেল। একদিন নৌকায় করে পারভালুকা থেকে দূরে মানিকচকের ভিতরে বেশ খানিকটা চলে গিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। কৃষ্ণপক্ষের রাত, তার উপর আকাশে মেঘ। তাল (বা টাল) ভূমির মজাই হচ্ছে বর্ষা হলেই চতুর্দিক থেকে কুলকুল করে ছোট ছোট নালা বা মজা নদীর রেখা বেয়ে মাঝে মাঝে বিপজ্জনক ঘূর্ণির সৃষ্টি করে। রাত তখন আটটা, ঘোর অন্ধকার, নৌকার ড্রাইভার কোনরকমে দিক আন্দাজ করে চালাচ্ছে। হঠাৎ জ্যোতিদাদাদের রতুয়ার হরিবাগানের কাছে নৌকাটি, তিনদিক থেকে তোড়ে বানের জল আসা এক বিরাট ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে প্রায় যায় যায়। অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতি দেখিয়ে মাঝি প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাশের উঁচু ডাঙায় লাগালো। সাহস করে আর না এগিয়ে নৌকায় রাত-কাটানোর সিদ্ধান্ত করে সকলে বসে আছি, এমন সময়ে দেখি দুটি করে পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন নিয়ে দুটি দল দু'দিক থেকে আমাদের নৌকায় আমাদের সাড়া পেয়ে পৌঁছল। অথচ সেই হরিবাগানে তার মাত্র মাস দেড়েক আগে জ্যোতিদাদাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে তাঁবু খাটিয়ে আমরা তিনদিন খুব আনন্দে আম খেয়ে

কাটিয়েছি। জয়ন্তীর তখন সাড়ে পাঁচ বছর বয়স, মালদার আম খেয়ে প্রকাণ্ড ভুঁড়ি হয়েছে। জ্যোতিদাদার এক দৌহিত্রের সঙ্গে তার খুব আলাপ জমেছে। ফড়িং ইত্যাদি দেখলেই ছেলেটির মারতে ইচ্ছা করত, জয়ন্তী বাধা দিত। ছেলেটি বলত, 'দাও না, পোকাটাকে একটু কষ্ট দাও না!' অর্থাৎ ডানা দুটি ছিঁড়ে দাও।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা এই প্লাবনে কাজে লাগল। গ্ল্যান ডেভিস, যাঁর কথা আগের খণ্ডে লিখেছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারে তখন গ্রামোন্নয়ন ডিরেক্টরের কাজ করছেন। আমার অনুরোধে যাবতীয় প্রতিষেধক, নাশক, ইনজেকশন, জল পরিস্রুত করার বড়ি, ব্লিচিং পাউডার, গুঁড়ো দুধ, চিকিৎসার নানা সরঞ্জাম, ওষুধ, ত্রিপল, কম্বল, জামাকাপড়, ভাল জল রাখার জন্য নানারকম পাত্র-ড্রাম-ব্যারেল, তাছাড়া রোগীদের জন্য বিশেষ ধরনের চিঁড়ে, চাল, যব ইত্যাদি দিয়েছেন। কিরণশঙ্কর রায়ের এলাকা বলেও মালদা একটু বিশেষ তৎপরতা ও খাতির পেল, স্বীকার করতেই হবে। জে-এন তালুকদারের পুরনো জেলা বলে তারও সুযোগ আমরা নিই। সারা জেলাময় দুর্যোগে পুলিশও খুব তৎপরতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে।

বান নেমে গিয়ে জেলা শুকনো হবার পর দৈনন্দিন জীবন যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরল, তখন জীতেশ (বাড়িতে ডাক নাম ছিল কচি, আমরা বলতুম চৌকি; জীতেশ ফক্কুরি করে আমাকে ডাকত, ফাদার) হল সকলের নয়নের মণি। চাইবার আগেই আমি তাকে সাতদিনের ছুটি দিলুম, কলকাতা গিয়ে শরীর সারিয়ে আসতে। এই কয়েক সপ্তাহে তার যে মহৎ গুণটি প্রকাশ পেল তা হচ্ছে, কালক্টরেটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মচারিদের সঙ্গেও তার নিখাদ একাত্মতা, সবকিছু কষ্ট ও অসুবিধা একসঙ্গে বরণ করার ইচ্ছা। ফলে এরা জীতেশকে যেমন শ্রদ্ধা করত, তেমন ভালবাসত। সেই ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল, পূজার পরে, গৌড়ে আয়োজিত একটি পিকনিকে। কালেক্টরেটের সব কর্মচারি ও অফিসার উপস্থিত হলেন। পিকনিকের মধ্যমণি হল জীতেশ।

এই প্রসঙ্গে আমার দু'জন আর্দালি, মজিদ ও তোজামলের উল্লেখ করা একান্ত কর্তব্য। মালদার ভিতরে ঘোরাফেরার সময়ে তোজামল আমাদের রান্নাখাওয়া, ঘর গোছানো, পরিষ্কার রাখা থেকে সব কিছুর ভার নিত। ওদিকে, কলকাতা যখন যেতুম মজিদ আমার সঙ্গে সর্বদা ছায়ার মত ঘুরত। রাত্রে ট্রেনে যাবার সময়ে সারারাত রেলের কামরার দরজার কাছে ভার নিজের বন্দুক নিয়ে

দাঁড়িয়ে থাকত, তার অবর্তমানে তোজামল বাড়ি পাহারা দিত। উপরন্তু দুজনে আভার যাবতীয় টাকা-পয়সার হিসাব রাখত। মজিদ ও তোজামলের সঙ্গে সব থেকে অন্তরঙ্গতার দিন আসত বকর-ঈদের দিনে। সেদিন মজিদের বাড়িতে আমাদের থাকত দুপুরে বিরিয়ানি আর রায়তা খাবার নিমন্ত্রণ আর বিকালে ও সন্ধ্যায় তোজামলের বাড়িতে কাবাব আর ফিরনি খাবার নিমন্ত্রণ। মালদায় মজিদ আর তোজামল, মুন্সীগঞ্জের সামাদ ও জলিলের স্থান পূর্ণ করে। তাদের প্রিয় স্মৃতি যতদিন বাঁচব, আশা করি, অম্লান থাকবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের ঠিক আগে, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের মেজর জেনরল বি-এন সরকারের সঙ্গে জীপে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, ফারাক্কা পুলের জাতীয় রাজপথ ধরে মালদায় গিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটাই। তখন মজিদ ও তোজামল দুজনেই গত হয়েছে। তাদের ছেলেদের সঙ্গে তাদের কবরের পাশে গিয়ে তাদের আত্মার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাই। এইসব মুহূর্তে নাস্তিকেরও মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।

মালদা হয় আমাদের আনন্দ ও উল্লাসের বছর। একে স্বাধীনতা, তার উপরে আয়তনে মালদা এমন একটি জেলা যাকে বড় মহকুমা বলা যায়, ফলে জেলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত, ধুলো বালি কাদা ও রাস্তার অভাব সত্ত্বেও সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হয়। তবে সবকিছু ছাপিয়ে যে-গুণ মালদা আমাদের অপার তৃপ্তি দেয়, সেটি ছিল প্রতিটি লোকের স্নেহ-যত্ন। উপরস্তরের ব্যক্তিরা ছিলেন যেমন সভ্য, তেমন উদার প্রকৃতির, কোনদিন নিজেদের স্বার্থে কিছু চাননি বা করতে অনুরোধ করেননি, উপরন্তু সাধারণের হিতার্থে সবকাজে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসে হাত দিতেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের রামকিঙ্কর রায়, তাঁর সব পুত্রকন্যা, পুত্র প্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক পিনাকীরঞ্জন রায়, ওদিকে ভালুকার জ্যোতির্মোহন মিশ্র ও তাঁর ভাইরা, তাঁর দিদি সুরেন্দ্রবালা দেবী, ইংরেজবাজার শহরের প্রতিষ্ঠিত উকিল মোক্তাররা, আবুল হায়াত খাঁ ও জহিরুদ্দীন চৌধুরী প্রভৃতি মুসলমান জমিদাররা, উপরন্তু প্রতি বিভাগের বড় ছোট কর্মচারিরা সকলে যেন এক বড় একান্নবর্তী পরিবারের মত সদ্ভাবে ছিলেন। মালদা থাকতে জ্যোতিদাদা 'শাজাহান' নাটক মঞ্চস্থ করান, সে নাটকে আমাকে জোর করে 'দিলদারে'র পার্ট করান। হরিবাগানে জ্যোতিদাদাদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটানোর কথা আগে লিখেছি। জ্যোতিদাদার কাছে একবার যশোহরের বিখ্যাত স্বদেশী কর্মী হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এসে কয়েকদিন থাকলেন। তাঁকে ও জ্যোতিদাদাকে

জীপে চড়িয়ে আমরা একদিন পদ্মা পেরিয়ে রাজমহল পাহাড়ে গেলুম। সেখানে ফসিল হয়ে যাওয়া চালডাল ইত্যাদি বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস সংগ্রহ করলুম। যাবার সময়ে একটি রেলওয়ে পুলের উপর দিয়ে জীপ নিতে গিয়ে আমি গলদ্‌ঘর্ম হই, সে স্মৃতি এখনও স্পষ্ট। হেমবাবু খুব ভাল যশোরের টান দিয়ে কথা বলতে ভালবাসতেন। বধূ ও ননদের বচসা বর্ণনা করতে গিয়ে, ননদের প্রতি বধূর উক্তি যশোরের টান দিয়ে যা বললেন তা এখনো মনে আছে: 'ওলো, ওলো, করিস্ কেন? ওলো কি অমনি এয়েলো! কত ড্যাম বাজিলো, কত উলু দেয়েলো, তবে ত ওলো এয়েলো।' শুনে আমরা হেসে গড়াগড়ি যেতুম।

নভেম্বরের শেষে বদলির হুকুম পেলুম। ৬ ডিসেম্বর মালদা ত্যাগ করে বহরমপুর পৌঁছলুম, ১৯৪৮-এর ৭ ডিসেম্বর প্রত্যূষে। ৩ ডিসেম্বর আমি আমার পরবর্তীদের জন্য এই বিশদ মন্তব্য লিখে যাই। ১৯৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারি রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আমার অনুরোধে মালদার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে আমার স্বহস্তে লেখা বারো পাতার ফোটোকপি আনিয়ে দেন। তার কিছু কিছু অংশ নিচে দিলুম। এইরকম বিশদভাবে লিখে রেখে যাওয়া ছিল তখনকার কালে অবশ্য কর্তব্য। চল্লিশ বছরের স্মৃতির কুয়াশা সত্ত্বেও, আমার বর্তমান লেখায় তখনকার মন্তব্যের সমর্থন পাওয়ায়, কিছুটা আত্মবিশ্বাস হল।

"আমার পশ্চাদ্‌গামীদের জন্য"

এ জেলায় কাজ করার মত সুখ ও সৌভাগ্য অন্যান্য জেলায় আপনার যে হবে না সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। মালদাবাসী আপনাকে অকুণ্ঠ স্বাগত জানাবে। আপনার কাছে তারা অনেক কিছু প্রত্যাশা করবে। প্রথম প্রথম আপনার প্রতি বিরুদ্ধভাব থাকবে না বরং পাবেন সম্পূর্ণ সহযোগিতা। আপনার উপরে নির্ভর করবে সেই ভাব বজায় থাকবে কি না। প্রথম মাসখানেকের মধ্যেই বুঝতে পারবেন, উভয় পক্ষে সে হৃদ্যতা বজায় থাকবে কি না।

সকলেই আশা করবে, আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মালদার উন্নতিকল্পে অনেক কিছু প্রস্তাব করবেন। বাইরের জগতের সঙ্গে জেলাবাসীর ওতপ্রোত যোগাযোগ না থাকায়, উপরন্তু এখানকার দরিদ্রতম লোকও অন্য জেলার

তুলনায় কিছুটা সচ্ছল বলে, তারা স্বভাবতই কিছুটা অলস, অনীহাপূর্ণ, পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন। এমন অবস্থায় শুভার্থী জেলাধিপতি পেলে তারা কৃতজ্ঞবোধ করে, তিনি শুভকাজে উদ্যোগী হলে সে উদ্যম ভাল মনে নেয়, যথাসাধ্য সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। সুতরাং মালদাবাসীর শুভবুদ্ধি ও ভালমানুষসুলভ মনোভাবের অভাব নেই। আপনার উপর নির্ভর করবে এই মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখার।

আমার পূর্বসূরীরা ছিলেন কর্মবীর, জনপ্রিয়তায় দুর্জেয়: পেডি, কার্টার, বি-আর সেন, জে-এন তালুকদার। আরো অতীতে ছিলেন জে-এন গুপ্ত, বি দে, এম-কে অগস্তি। তাঁদের স্মৃতি আপনার ব্যবহারে ও মনে বিনয়-নম্রভাব ও অকিঞ্চিৎবোধ আনতে বাধ্য। বিশেষত স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে যখন শুনবেন তাঁদের উদ্দেশে অনাবিল প্রশংসা। কিন্তু তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই, যদি-না আপনার মনে খ্যাতিলাভের প্রতি অন্যান্য লালসা থাকে।

তাদের মেজাজ বিগড়ে না দিলে, আত্মসম্মানে আঘাত না করলে, আপনি সব ব্যাপারে জেলাবাসীর সহযোগিতা আশা করতে পারবেন। সহযোগিতা পাবার প্রথম ধাপ হচ্ছে আপনি যে সম্মানে ও সাদরে মানী-গুণীদের স্বাগত জানাবেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন, দীনাতিদীন আগন্তুকের প্রতিও একই সম্মান দেখাবেন। যে কেউ দেখা করতে আসবে তাকে নিজের চেয়ার থেকে উঠে, নমস্কার করে আগে আগন্তুককে বসাবেন, তারপর নিজে বসবেন। তিনি যখন বিদায় নেবেন, আবার উঠে নমস্কার করে, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, নিজের চেয়ারে ফিরে এসে, পরের ব্যক্তিকে ভিতরে আসতে খবর পাঠাবেন।

সমান হাতে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করলে সাম্প্রদায়িকতা সহজেই নির্মূল করা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে স্মরণ থাকে যেন, হিন্দুদের মাঝেমাঝেই মনে হবে মুসলমানদের শায়েস্তা করার সময় এসেছে। জেলায় এসে সর্বাগ্রে কালিয়াচকের সুজাপুর গ্রামে একবার যাওয়া উচিত। প্রথমেই যদি একবার যান তবে মুসলমানরা আপনার এই যাওয়াকে তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি শুভেচ্ছা ও ভালবাসার চিহ্ন হিসাবে মনে রেখে আশ্বস্ত হবে। ভবিষ্যতে অনেক কাজে তাদের সাদর সহযোগিতা পাবেন।

মুসলমানদের পরেই বরিন্দ অঞ্চলের সাঁওতাল ও অন্য উপজাতিরা আপনার নজর ও সদিচ্ছা পাবার অধিকারী হবে। তাদের উপরে নানা ধরনের

উপদ্রব নিত্য লেগেই আছে। কুটিল পদ্ধতিতে যে-সব উপদ্রবের সৃষ্টি করা হয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য হয়, চুপিসাড়ে, আইনের ছিদ্রের সুবিধা নিয়ে, কী করে জমির উপর তাদের আইন-রক্ষিত স্বত্ব নষ্ট করে, অল্পে অল্পে তাদের ভূমিহীন নিঃস্ব করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া যায়। একাজ নিঃশব্দে, অক্লান্তভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন বরিন্দ অঞ্চলের বর্ণহিন্দু জমিদার-জোতদার, গোমস্তার দল। তাদের প্রায় সকলেই নীতিজ্ঞানহীন, দুর্নীতিপূর্ণ বাঙালী। সাঁওতালদের সাহায্যার্থে আপনি যদি তেভাগা কথাটি মুখে আনেন, বা সেই উদ্দেশ্যে কড়ে আঙুলটিও ওঠান, তাহলেই জেলাময় ঢি ঢি পড়ে যাবে আপনি আপাদমস্তক লাল (অর্থাৎ কম্যুনিস্ট)। তবে, ভাগ্যক্রমে কমিশনার তালুকদার আপনার পক্ষে আছেন (আগে এখানে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বলে তিনি অনেক কিছু জানেন শোনেন), যাঁর কৃপায় আদিমজাতির স্বার্থ আপনি কিছু পরিমাণে রক্ষা করতে পারবেন। মাত্র কয়েকদিন আগে কয়েকটি জমিদার কিছু আদিম-জাতি আধিয়ারকে জমি থেকে উৎখাতের চেষ্টায় ছিলেন। সে চেষ্টা আমি ব্যর্থ করতে সমর্থ হই, এবং তারপর ঘোষণা করি পুনরায় যদি এধরনের কেস ধরা পড়ে তবে তা বন্ধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা হবে। এমন-কি আদিম-জাতির চাষি যাতে পুনরায় নিজের জমি কিনে নিতে পারে, সরকার থেকে তার ব্যবস্থা হবে। সরকার কেনার টাকা ধার দেবে। এ ছাড়াও, বরিন্দের *সার্কল অফিসার এবং ঐ এলাকার দু'জন সাঁওতাল স্পেশাল অফিসারকে এই নির্দেশ দিয়েছি ১৯২৩ সাল থেকে শুরু করে যে-সব জমি ও দাগ* আদিম-জাতিদের দখল ও মালিকানা থেকে হস্তান্তর হয়ে গেছে তার একটি বিশদ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে, যার উপরে ভিত্তি করে নতুন এক আইন জারি করা যায়। এই আইনের মূল কথা হবে জমি বিক্রির সময়ে আদিমজাতির চাষি যে দাম পেয়েছিল তার উপরে বছরে শতকরা সোয়া ছয়টাকা সরল হারে সুদ যোগ করে, আসল ও সুদ মোট অঙ্কের টাকা শোধ করে বিক্রিত জমি কিনে নিয়ে, আবার ভোগদখল করতে পারবে। আমার কন্‌ফিডেন-শিয়াল অফিসের গোপনে সংরক্ষিত দলিলপত্রের যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন তিনি আপনাকে এসব বিষয়ে কাগজপত্র দেখাতে পারবেন। অতীতে কম্যুনিস্ট আন্দোলন রোধকল্পে জে-এন তালুকদার এই ধরনের আইন চালু করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হন, এবং তাঁরই উৎসাহ পেয়ে আমরা এই তালিকা প্রস্তুত করা শুরু করেছি। ভবিষ্যতে শক্ত হাতে হাল ধরে এই

উদ্দেশ্যটি সফল করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই অভিযান বানচাল করার জন্য জমিদার, জোতদার প্রভৃতিরা আপনার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করবেন, তাতে দমে গেলে চলবে না। বিরুদ্ধ আন্দোলনের পুরোভাগে অবশ্য থাকবেন হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেস। সম্ভবত তাঁরা কিছু দাঙ্গাহাঙ্গামারও সৃষ্টি করবেন।

আমার গোপন দপ্তরের সহকারী সচিব আপনাকে পুরনো, নতুন সব কাগজপত্র দেখাতে পারবেন। সবকিছু প্রশ্নের আলোচনা ও সমাধানের উপায় পদ্ধতিরও ইঙ্গিত আছে। যেমন, তাদের সঙ্গে কীভাবে বা কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত; তারা যে-সব মামলায় জড়িয়ে পড়েছে, তাদের বিচার সমাধানের ব্যবস্থা কীভাবে করতে হবে; এ জেলায় যাকে বলে 'মাছ-লুঠ', তাকে কী চোখে দেখতে হবে; বরিন্দে পানীয় জল ও শিক্ষার ব্যবস্থা কীভাবে চলা উচিত; সাঁওতাল ও উপজাতিদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের রীতি কী হওয়া উচিত; আদিমজাতি প্রজাদের সম্বন্ধে জমিদারদের আইনত কী কী দায়িত্ব আছে, ইত্যাদি। এসব বিষয়েই অবশ্য এক-এক বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। আপনি হয়তো সবকিছুতে একমত হবেন না, তবুও সেগুলি দেখতে পারেন। একটি ব্যাপারে প্রতিবছর খুব হৈ চৈ ওঠে: সেটি 'মাছ-লুঠ'। ব্যাপারটি আসলে যেমন দুঃখের তেমন তুচ্ছ। যে-সব পুকুর থেকে মালিক ইতিমধ্যেই মাছ ছেঁকে তুলে নিয়েছে, প্রতিবছর বসন্তকালের শেষে সাঁওতালরা সেইসব পুকুর থেকে উৎসব হিসাবে একদিন জাল দিয়ে মাছ ধরে; ঘরপিছু বড়জোর দু'এক ছটাক মাছ ভাগে পড়ে। এটি আনুষ্ঠানিক উৎসবমাত্র, সম্পত্তি লুঠের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু, প্রতিবছরই আপনার কাছে ভয়াবহ রিপোর্ট ও নালিশ আসবে, যেন দাঙ্গায় রক্তপাত হয়ে গেছে। রাইফেলধারীদের দিয়ে লুঠ বন্ধ করার জন্য ঘন ঘন আবেদন আসবে। মশা মারতে কামান দাগার অবস্থা। পূর্বে অনেক সময়ে গুলিও চলেছে। সার্ক্‌ল্ অফিসার বাঙালী হলে, মাছ-লুঠের গুজবের শুধু অপেক্ষা, রক্ত তাঁর গরম হয়ে যাবে; কী করে বাঙালীবাবুদের ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বার্থ রক্ষা করা যায়, তার চিন্তায় হবেন অধীর। এবিষয়ে এখনকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অভ পুলিশ মাথা ঠাণ্ডা রাখেন, কিন্তু বরিন্দের সার্ক্‌ল্ অফিসার ক্ষেপে যান। অবশ্য তার কারণ আছে। বরিন্দে ট্যুর করা এত কষ্ট-সাধ্য, যে বাঙালী সার্ক্‌ল্ অফিসারকে বাঙালী জমিদার, জোতদারদের

আতিথ্যগ্রহণ না করে উপায় থাকে না। সুতরাং তাদের পক্ষ নেয়া ছাড়া তাঁর উপায় থাকে না। তবে এখন যিনি আছেন, লেফটেনেণ্ট এন-সি মুর্মু, তিনি একেবারে সাচ্চা লোক, কখনও আপনার কথা বিকৃত করে সাঁওতালদের উত্তেজিত করবেন না, আসল ঘটনা যথাসম্ভব ঠিকভাবে রিপোর্ট করবেন। লেফটেনেণ্ট হাঁসদা বরং একটু ভীতু, দোনামোনা প্রকৃতির; তা সত্ত্বেও বাঙালী সার্ক্‌ল্‌ অফিসারের থেকে ভাল। এ দুজনকে ঐ অঞ্চলের যে-কোন কঠিন কাজে দ্বিধা না করে লাগাতে পারেন।

বরিন্দে কাজ করার জন্য শীঘ্রই অনেক কর্মঠ ও উপযুক্ত কর্মী পাবেন। কাঁচড়াপাড়ায় বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীদলের (বি-জে-আর-ডি) শিক্ষাকেন্দ্র থেকে তারা দীক্ষিত হয়ে আসছে, সংখ্যায় দু'শ'র বেশী হবে। সবশুদ্ধ প্রায় চারশ' সাঁওতাল যুবক পাবেন, যাদের সাহায্যে অসাধ্যসাধন সম্ভব হবে। স্থির করেছিলুম, এই শীতে বরিন্দের চারটি থানায় আদিমজাতি শিশুদের জন্য অন্তত দু'শ'টি দুধ-বিতরণ কেন্দ্র খোলা হবে। প্রতি ক্যান্টিনে দু'টি করে বি-জে-আর-ডি সাঁওতাল যুবক মোতায়েন হবে। প্রয়োজনীয় গুঁড়ো দুধ সবই (৯০০০ পাউণ্ড) সিভিল সার্জনের সংরক্ষিত ভাণ্ডার থেকে পাওয়া যাবে। দুধের এই ভাণ্ডারের উপর আপনার পূর্ণ অধিকার থাকবে, কারণ সমস্ত দুধই এসেছিল সেপ্টেম্বর মাসের প্লাবনের ত্রাণকল্পে। দুগ্ধকেন্দ্র খুলতে মুর্মু, হাঁসদা ও সরকার (সার্ক্‌ল্‌ অফিসার) আপনাকে সাহায্য করবেন। এখন থেকেই যদি ব্যবস্থা শুরু করে দেন, তাহলে শীঘ্রই বরিন্দের উপর আপনার প্রতিপত্তি অটুট হবে, ভবিষ্যতে আপনার অভীপ্সায় কেউ বাধা দিতে পারবে না। আদিমজাতিদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী, ক্যান্টিনগুলি খুললে কমে যাবে।

যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে বলব শীতকালে যদি বার তিনেক তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করেন, ভাল হবে। প্রতিবারই সপ্তাহখানেক করে থাকতে পারেন। সঙ্গে একটি করে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র নিয়ে ঘুরতে পারেন, তার দৌলতে সে-অঞ্চলে চিকিৎসার প্রসার হবে। এই কাজটি আমি নিজে করতে পারিনি বলে আমার খেদ রয়ে গেল।

এস-ডি-ও এবং বিচাররত হাকিমদের প্রতি এই মর্মে একটি সার্কুলার দিয়েছি যে যেখানেই কোন আদিমবাসী আসামী বা অভিযোগকারী হবে তাদের প্রতিটি কেসই সর্বাগ্রে বরিন্দের স্পেশাল অফিসারদের কাছে

পাঠানো বাঞ্ছনীয় হবে, মোকদ্দমা এড়িয়ে যদি তাঁরা সেগুলি দুইদলের মধ্যে আপসে মীমাংসা করে দিতে পারেন।

বঙ্গীয় ভূমিস্বত্ব আইনের সপ্তম অধ্যায়ের আওতায় আদিমজাতিদের জমি তাদের ফিরিয়ে দেয়া হোক এই আর্জি করে অনেকগুলি দরখাস্ত পড়েছে। এ বিষয়ে একটি সাধারণ নির্দেশ দিয়েছি, প্রতিটি ক্ষেত্রে যতদুর সম্ভব জমিগুলি আদিমজাতীয় মালিককে ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। উপরন্তু, যদি কোন দরখাস্ত পড়ে এই প্রার্থনা করে, যে কোন আদিমবাসীর জমির মালিকানা স্বত্ব, অন্য কোন অনাদিম জাতির লোকের হাতে তুলে দিতে হবে, তখনই কালেক্টর সে আবেদন বা প্রার্থনা অগ্রাহ্য করবেন।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিরাকরণ বিষয়ে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। পটভূমি হিসাবে কথাটি মনে রাখলে কাজ দেবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ জেলায় এ-সমস্যা আদৌ ছিল না বললে হয়। তার প্রমাণ, এম-ও কার্টার তাঁর সেট্‌ল্‌মেণ্ট রিপোর্টে প্রায় খেদের সুরেই বলেছেন—এ জেলায় হিন্দু-মুসলমান গণ্ডগোল নেই। তাঁর পরে যে-সব বৃটিশ অফিসার আসেন, তাঁদের এদিকে একটু প্রবণতা ছিল মনে হয়। অবশ্য, এ বিষয়ে লীগ-সরকারের উস্কানিই সমধিক দায়ী। নিজে বেশ ভদ্রসভ্য হলেও জহুর আহমদ এককালে সারা জেলায় বেশ চেলাচামুণ্ডা তৈরি করেছিলেন। তাদের যে যেখানে আছে, গোপনে তারা বদমায়েসিতে হাত পাকাচ্ছে।

জানুয়ারি মাসে যখন প্রথম এলুম তখন হিন্দু-মুসলিম সমস্যার ভারে জেলার অবস্থা খারাপই ছিল বলা যায়। ঐ সমস্যাই ছিল প্রধান। জেলা-ত্যাগের সময়ে, আমার বিশ্বাস সে সমস্যার আশঙ্কা প্রায় নেই। মুসলমানদের পিছনে লাগার ইচ্ছা হিন্দুদের মাঝে মাঝে প্রবল হয়। এই ইচ্ছা একদিকে যেমন কঠোর হাতে দমন করা প্রয়োজন, তেমনি অন্যপক্ষে এটাও মনে রাখতে হবে যে মুসলমানরা এখন পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে না তা নয়; এবং তলে তলে তারা বেশ নষ্টামিপ্রবণ। সৌভাগ্যক্রমে পুলিশের যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব গোড়াতে ছিল তা এখন প্রায় চলে গেছে, অন্তত আগেকার মত কথায় কথায় তারা এই গেল, এই গেল রব তোলে না।

প্রথম কিছুদিন বা কয়েক সপ্তাহ হয়তো আপনার মনে হবে—এই হতভাগা হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটি কোথায়? আমি তো কোথাও তার চিহ্নমাত্র দেখছি না। অথচ যখন তখন হি'রা বা মু'রা এই ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে

ছুটে আসে কেন ? মনে রাখবেন, প্রশ্নটি একবছরে মিটবে না, এখনও ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে আছে, যদিও বিশেষ আশঙ্কার কিছু নেই। কালিয়াচক্র আপনাকে বিশেষ ভাবাবে না, কিন্তু টাল শেরশাবাদিয়ারা (তাদের আপনি কিছুদিনের মধ্যে আরো ভাল করে বুঝতে পারবেন) তারা এখনও স্বপ্ন দেখে, আর ওপার থেকে লোক আনাগোণার ফলে গোলমাল সৃষ্টি করার কথা কিছু কিছু ভাবে।

শেরশাবাদিয়াদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল বলে আমার বিশ্বাস। আমি নিজে তাদের একরকম ভক্তই বলা যায়, তার দরুণ তাদের অনেক দোষত্রুটি উপেক্ষা করতে আমি প্রস্তুত। সরীসৃপরূপী হিন্দুদের থেকে তারা বহু হিসাবে অনেক ভাল ; তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে সুফল ফলে। কীভাবে চলতে হবে তার আইনকানুন তারা জানে ও মানে। যে লোক ছোট ভুল দরাজ মনে ক্ষমা করে, অথচ বড় ভুলে শক্ত হাতে শাস্তি দেয় তাদের তারিফ করতে জানে। অর্থ উপার্জনে তারা ওস্তাদ, এমন-কি চোরাই চালানেও বেশ আসক্তি আছে। চোরাই চালানের পক্ষে তাদের দুটি ভাল যুক্তি বা সাফাই আছে : প্রথমত, তাতে তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, তারা ভাবে সে-ব্যবসায়ে ভারতের ক্ষতি করে পাকিস্তানের উপকার করা হচ্ছে।

এ জেলায় প্রতিটি ক্ষেত্রই আপনার উদ্যমের পক্ষে প্রশস্ত ; আপনি যে-কোন ক্ষেত্রেই সুনাম কিনতে পারেন : শিক্ষা অথবা রেশম শিল্প, আম-রপ্তানি অথবা কৃষি, সেচ অথবা রাস্তা তৈরি, কিংবা হি-মু-দের মধ্যে সমতা রক্ষা করা : যার কথাই ভাবুন। আপনি যদি ভাল শিকারী হন, তাহলে দেশের লোক খুব খুশী হবে, নিজেরা তারা খুব ভাল শিকারী। উপরন্তু খোদ জে-এন তালুকদারের মুখে শুনেছি এ জেলার লোকে খুব অতিথিবৎসল। আমার নিজের যদিও প্রত্যক্ষজ্ঞান বিশেষ নেই, তবুও পরোক্ষে জানি, বছর পনেরো-কুড়ি আগেও যারা এখানে কাজ করেছেন তাঁদের কাছে প্রতিবছর আমের ঝুড়ি উপহার যায়। আমি নিজে একবার সপরিবারে হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদার রামকিঙ্কর রায়, এবং দুবার ভালুকার জমিদার জ্যোতির্মোহন মিশ্রের অতিথি হয়েছিলুম, এবং সে আতিথেয়তার প্রতিদানে তাঁরা আমার কাছে কিছু সুযোগ সুবিধা চাননি বা প্রত্যাশা করেননি।

বাড়ির হাতার বৃন্দাবনী গাছটি একটি মস্ত সম্পদ। এ বছর গাছটিতে

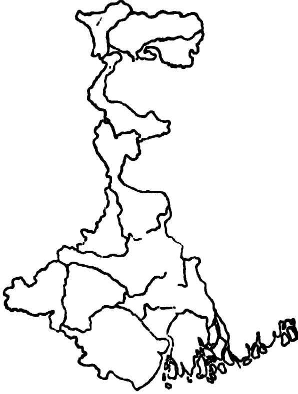
প্রায় দু'হাজার আম হয়। তার প্রায় সবগুলিই আমি শুধু ইংরেজবাজার নয়, সারা জেলার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ডালি হিসাবে পাঠিয়েছি। সকলেই এই সামান্য ভদ্রতার খুব তারিফ করেন। অন্যপক্ষে তাঁরা যখন তাঁদের আমের ডালি পাঠাতেন, তখন আমার নিতে সঙ্কোচ হয়নি, খুশী ও দরাজমনে নিতুম। তবে মনে রাখবেন, আপনার ডালিই প্রথম যাওয়া দরকার।

'এ সবে ক্লান্ত হয়ে আমি শান্তিময় মৃত্যুর কামনা করি।' ইংরেজবাজার মিউনিসিপালিটির জন্য বহুমাস পরিশ্রম করে কোন ফল হল না। সভাপতিটি একটি একনম্বরের অকর্মা। জিয়াউদ্দিন তাঁর উপদেষ্টা, ভীষণ ধাপ্পাবাজ লোক, তাঁকে ছাড়া সভাপতি এক পাও নড়েন না। কালেক্টরের নিজস্ব গোপনীয় দপ্তরে মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে আমি সরকারকে যে রিপোর্ট দিয়েছি তার নকল আছে।

সাধারণ পাঠাগারটি উৎকৃষ্ট। মিউজিয়ামটি শ্রীপঞ্চানন মিশ্রের প্রাণস্বরূপ, তিনি একাধারে বইয়ের পোকা, এবং বকবক করায় ওস্তাদ। তাঁর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। টাউন হল আর ক্লাবটি টিমটিম করে চলছে। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পরশিবানন্দ সত্যকারের মহৎ ব্যক্তি, সবকিছুতে সাহায্য করতে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসেন।

ক্রান্তির বছর : মুর্শিদাবাদ ১৯৪৯

প্রথম পরিচয়



১৯৪৮-এর ৮ ডিসেম্বর বহুরূপী পেশায় আমি পাকা হলুম। ১৯৪৪ মার্চ থেকে ১৯৪৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আমি যথানু-ক্রমে এস-ডি-ও, এ-ডি-এম, স্পেশাল অফিসার, ডেপুটি ও জয়েন্ট কণ্ট্রোলার, শেষে ডি-এম পদে কাজ করেছি। অবিভক্ত বাংলার একপ্রান্ত থেকে অন্য-প্রান্ত পর্যন্ত ছ'টি বিভিন্ন জেলায় বাস করেছি। সরকারি আইনানুসারে প্রতি বদলিতে সংসারের জিনিসপত্র স্থানান্তরের খরচ বাবদ আমার যা প্রাপ্য হত, অন্য-দিকে প্রতি বদলিতে আসলে যা খরচ হত, সেই ঘাটতি পূরণ করতে ইতিমধ্যে আমি যা সঞ্চয় করতুম তার সবটাই চলে যেত। এইসব বদলিতে, হাতে তৈরি বিরাট চোঙাওলা ই-এম-জি গ্রামোফোনটি স্থানান্তরিত করতে এত হাঙ্গামা ও খরচ হত, প্রথমদিন বাজনাটি দেখে বাবা যা মন্তব্য করেছিলেন, যে আমার কোন সাংসারিক বুদ্ধি নেই, তার যথার্থতা হাড়ে হাড়ে হৃদয়ঙ্গম হত। ১৯৪৬ সালের গোড়ায় মৈমনসিংহ থেকে কলকাতায় গিয়ে আমার দ্বিতীয়বার যে হৃদ্‌রোগ হয় তার থেকে সেরে উঠে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আকস্মিক প্রয়োজন বা দুর্ঘটনা কিছু ঘটলে হাতে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা সঞ্চয় যেন সব সময়ে থাকে। যে পাঁচ হাজার টাকা ১৯৪৬-৪৭ সাল ধরে জমালুম, তার অনেকাংশ গেল চুঁচুড়ায় আমার তৃতীয়বার হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায়, তারপরে কলকাতায় টনসিল অস্ত্রোপচারে, এবং তার থেকে আরোগ্যলাভ করে দিল্লীতে ছুটি কাটাতে। বাকি যা ছিল, মালদায় কলকাতা কমার্শিয়াল ব্যাংক ফেল পড়ায় বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। টাকা জমানো ব্যাপারে আমার কুসংস্কারমূলক ভীতি জন্মাল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে মুর্শিদাবাদ হল আমার দ্বিতীয় জেলা। মালদা

থেকে মনে বেশ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এলুম। মনে পড়ে গেল আগের বছর মালদা থেকে জীপে করে কলকাতা যাবার সময়ে মুর্শিদাবাদে যখন একরাত্রি ছিলুম, তখন মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মালদা সম্বন্ধে একটু তাচ্ছিল্যস্বরে বলেছিলেন ওটি তো একটি পকেট জেলা মাত্র। এক হিসাবে বলা যায় মালদায় আমার সাবালকত্ব এল। আমাদের কালে, কতগুলি অফিসারকে কাজে দীক্ষিত করে শিক্ষা দিয়েছি তারই উপর হত আত্মতৃপ্তি ও সার্থকতার বিচার। মালদা থাকতে অন্তত একটি অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে মানুষ করে যশস্বী করেছি, সেই ছিল আমার গর্ব। মুর্শিদাবাদে এসে আমি পেলুম একাধারে আটটি অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁদের সঙ্গে যোগ হল প্রথম এ-ডি-এম পদে আরেকজন আই-এ-এস অফিসার। তাঁদের মধ্যে অন্তত সাতজন ছিল প্রায় আমার বয়সী, এক-আধজন ছিল একটু বড় বই ছোট নয়। বাকি দু'জন ছিল আনকোরা পাসকরা আই-এ-এস: একজন সুনীলকুমার মুখার্জি, অন্যজন যতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত। বত্রিশ বছর পূর্ণ হবার আগে যখন মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করি তখন মনে এইটুকু গর্ব হয়, এঁদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে যাঁরা প্রশাসনে সুনাম অর্জন করবেন, তাঁদের সুনামে আমার শিক্ষার ভাগ থাকবে।

মালদা থেকে বারহারওয়া লাইনের ট্রেনে চড়ে বহরমপুর রোড স্টেশনে নেমে, ভাগীরথী পার হয়ে বহরমপুর সার্কিট হাউসে যখন পৌঁছলুম তখন শীতকালের ভোর প্রায় ছটা। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, আলো ফোটার আগে একটু ঘুমিয়ে নেবার সময় আছে। ঘুম ভেঙে গেল দরজার বাইরে ভারি জুতোপরা চলাফেরার আওয়াজে। সকল ন'টায় তিনজনে সার বেঁধে বড় খাবার ঘরে গেলুম। দেখি পাঁচজন অফিসার খাবার টেবিলে বসে। মনে হল সকলেই ত্রিশের কোঠায়। বসে বসে সকলে ফুর্তিতে কথা বলছে আর প্রাণভরে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। নিজেদের পরিচয় দিলুম। পাঁচজনের মধ্যে প্রথমজনের নাম হল মেজর সুনীলকুমার ব্যানার্জি। বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোঁট্টা, শক্ত চেহারা, অল্প বয়স। ছিলেন ভারতের প্রাচীনতম রেজিমেণ্টের একটিতে, নাম বম্বে গ্রেনেডিয়ার্স। আরাকান রণক্ষেত্রে শৌর্যের জন্য মিলিটারি ক্রসে ভূষিত হন। দ্বিতীয়জন ছিলেন, মোটাসোটা, মাঝারি উচ্চতার থেকে লম্বা, নাম ভূপেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী। ছিলেন ইণ্ডিয়ান আর্মি সার্ভিস কোরে। তাঁর ছিল একটি আনকোরা নতুন অস্টিন ১৬ সিডান গাড়ি, এবং চব্বিশটি (অথবা ছত্রিশটি ঠিক মনে নেই) লোমভর্তি শেয়ালের আস্ত চামড়া জুড়ে জুড়ে তৈরি করা একটি কম্বল। তৃতীয়জন ছিলেন

খুব ফর্সা অফিসার, মুখটি ডিম্পল্ স্কচ্ হুইস্কি বোতলের আকারের, কলকাতার আদি আর্মেনিয়ান বংশসম্ভূত, নাম লেফটেনাণ্ট কর্নেল আইভান স্থরিটা। অষ্টম আর্মিতে থেকে উত্তর আফ্রিকা-ইটালির যুদ্ধে উপর্যুপরি দু'বার মিলিটারি ক্রস ভূষিত হ'ন (একই সময়ে খবর পাই, আমার অক্সফোর্ডের মার্টন কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্যাট্রিক ও'রিগানও দু'দুবার মিলিটারি ক্রসে ভূষিত হন)। তাঁর রেজিমেণ্ট ছিল রাজপুতানা রাইফ্‌ল্‌স্। চতুর্থজন ছিলেন গোলগাল হাসিখুশি, বাংলায় যাকে বলে মাইডিয়ার চেহারার ভদ্রলোক, নাম উইং-কমাণ্ডার ভার্নন শিবচন্দ্র বোনার্জি। কলকাতার সুবিখ্যাত বোনার্জি পরিবারের এক অঙ্গসম্ভূত। ছিলেন এয়ারফোর্সে, যুদ্ধে একটি ওক-পাতা পুরস্কার পান। ওক-পাতা পুরস্কারের মানে 'মেন্‌শন্‌ড্ ইন দি ডেস্প্যাচেস্', অর্থাৎ বীরত্বব্যঞ্জক কাজের জন্য তাঁকে প্রশস্তি জানানো হয়। ভার্নন চড়াগলায় জাপানী বান-জাই গাইতে ভালবাসতেন, গলা ছিল হাই টেনর। যুদ্ধে এঁদের শৌর্য ও বীরত্বের কাহিনী তাঁরা নিজের থেকে কেউ অবশ্য আমাদের বলেননি। প্রশ্ন করে করে তাঁদের কাছ থেকে টেনে বার করতে হয়েছিল। 'নিজেরি তুলনা আমি এ মহীমণ্ডলে'-মার্কা বঙ্গসন্তান ঠিক নয়, তাই ভাল লাগল। জীতেশ তালুকদার আমার আগেই মালদা থেকে বদলি হয়ে এসেছিলেন।

ব্রেকফাস্টের পর খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের খাসকামরায় গেলুম। তিনি কখন চার্জ দেবেন আলোচনা করে দিনক্ষণ স্থির করতে ঘর থেকে বেরিয়েছি এমন সময়ে শুনলুম আড়ে ফুঁ-দেয়া বাঁশিতে তদানীন্তন একটি জনপ্রিয় সুরে বাজছে : 'রঙ্গীলা, রঙ্গীলা, রঙ্গীলা রে, আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কোথা যাওরে!' দেখি, সার্কিট হাউসের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আইভান মনপ্রাণ ঢেলে বাঁশিতে এই সুর বাজাচ্ছে, আর তাঁর ঠিক সমুখে তাঁর সাদাকালো ফক্স-টেরিয়ার কুকুর, স্যালি, সুরের তালে তালে লাফাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে বিলম্বিত তালের সময়ে শূন্যে ডিগবাজী খাচ্ছে। জয়ন্তী বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে আছে। আইভানের সঙ্গে তার তৎক্ষণাৎ হরিহরাত্মা হয়ে গেল—সূত্র হল ঐ ফক্স-টেরিয়ার। বছর দুয়েক পরে স্যালির বাচ্চা মেয়ে জিলি-কে জয়ন্তী পালন করার জন্য নিয়ে আসে।

জেলা প্রশাসনের কাজ শেখানোর জন্য যত নয় তার থেকে মুর্শিদাবাদে তাদের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্যই ফৌজি অফিসারদের মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়েছিল। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উত্তরে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজশাহী জেলা আর দক্ষিণে ভারতের মুর্শিদাবাদের মাঝে, পদ্মানদীর মাঝবরাবর কল্পিত রেখা ধরে দেশের দখল ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। এইভাবে দেশের সীমারেখা রক্ষার উপরেই বাগে-বাটোয়ারা রায়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করত। দখলই স্বত্বের মুখ্য প্রমাণ এই ছিল পূর্ব-পাকিস্থানের সরল মন্ত্র। এই মন্ত্রের উপর নির্ভর করে পূর্ব-পাকিস্তান পদ্মার বুকে বিস্তীর্ণ চরগুলি তার আধা-সামরিক ফৌজের সাহায্যে দখল করে। এই দখল করতে গিয়ে পদ্মার বুকের মাঝবরাবর লাইন উল্লঙ্ঘন করে মুর্শিদাবাদের কূলের অনেক কাছে পর্যন্ত দখল করে। পণ্ডিত নেহরুকে বুঝিয়ে ডাঃ বি-সি রায় মুর্শিদাবাদের সীমান্তে ই-ইফ-আর (ঈস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফ্‌ল্‌স্) ও আসাম রাইফ্‌ল্‌স (এ-আর) সীমান্তে মোতায়েন করে সীমান্ত-রক্ষার সুব্যবস্থা করেন। এই ধরনের সীমান্ত কলহে দেশের প্রতিরক্ষা ফৌজকে নামানো দুইরাজ্যের চুক্তিবিরুদ্ধ হত। অথচ আধা-সামরিক ই-এফ-আর এবং এ-আর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এমন অফিসারদের প্রয়োজন যাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। পূর্ব-পাকিস্থানে এবিষয়ে পরিচালনার ভার ছিল প্রসিদ্ধ বালুচ রেজিমেণ্টের উপর। সামরিক পোশাক ও পদ ইত্যাদির নিশানা ত্যাগ করে তাঁরা বেসামরিক বেশে এই কাজে নামেন। আমাদের তরফে বেসামরিক অফিসারদের মধ্যে এই পাঁচজনেরই যুদ্ধ ও সমর-কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল।

বর্ষা শেষে আমাদের চারজন আই-এ-এস অফিসারের নেতৃত্বে ই-এফ-আর এবং এ-আর,—পরিকল্পিত বাগে রেখা অনেকখানি পিছনে রেখে ঐ লাইন বরাবর পূর্ব-পাকিস্তান মুর্শিদাবাদের উপর অগ্রসর হবার আগেই—আগের বছরের পাকিস্তান-অধিকৃত অনেকখানি চর ও জমি দখল করে। দখল করার পর সারা সীমান্তরেখা ধরে তারা কিছুদূর অন্তর অন্তর অনেকগুলি রক্ষাকেন্দ্র সযত্নে স্থাপনা করে, বাঁশের উঁচু মিনারের মত মাচা করে পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি প্রস্তুত করে, প্রত্যেকটি ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে অনায়াসে যাবার জন্য মাটির তলায় সুড়ঙ্গপথ করে, মাটি খুঁড়ে মাটির নিচে থাকার ও অস্ত্রশস্ত্র রাখার ঘর তৈরি করে।

সীমারেখা অঞ্চলগুলি যত ঘনঘন পরিদর্শন করা যায় ততই রক্ষীদের মানসিক বল বাড়ে। সেই উদ্দেশে চারজন—জীতেশ আসার পর পাঁচজন—অফিসার সপ্তাহে অন্তত একবার এলাকা ভাগ ভাগ করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করতে, সময়ে সময়ে দু-তিন রাত্রি একনাগাড়ে জোয়ানদের সঙ্গে তাদের মাটির তলার ঘাঁটিতে রাত কাটাতেন। শুনলুম আমার পূর্বগামী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সারা সীমান্ত ঘুরে দেখতে পারেননি—তাঁর খাসকামরায় কিরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল আগে লিখেছি। তাছাড়া, চার্জ নেবার সময়ে যে-সব কথা তিনি আমাকে বলেন তাতে মনে হল তিনি মনের দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট ছিলেন। অবশ্য এটাও সম্ভব, যাতে কাজ না করতে বা সিদ্ধান্ত না নিতে হয়, তার জন্যেও অনেক রকম অজুহাত দ্বন্দ্ব হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়। অযথা কথা না বাড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, চিরাচরিত প্রথামত পরবর্তীদের ব্যবহারের জন্য তিনি জেলার সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বিশদভাবে তাঁর মন্তব্য লিখে যাচ্ছেন কিনা। তিনি বললেন, না। চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম এই প্রথম দেখলুম, এবং সেটি স্বাধীনতা আসার দেড় বছরের মধ্যে। তার আগে পর্যন্ত এস-ডি-ও, এমন-কি সার্ক্‌ল্ অফিসাররাও, এই ধরনের বিশদ মন্তব্য লিখে রেখে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য হিসাবে নিতেন, না করলে সরকারে জবাবদিহি করতে হত। মনের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে তিনি যা বললেন, তা এই। পদ্মার দক্ষিণ তীর বরাবর মুর্শিদাবাদ জেলার থানাগুলিতে যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সে বিষয়ে কী করা যায়। উত্তর-পশ্চিম থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত পরপর যে থানাগুলি ছিল, তাদের নাম ঔরঙ্গাবাদ, সুতী, জঙ্গীপুর, লালগোলা, ভগবানগোলা, জলঙ্গী এবং একেবারে দক্ষিণ-পূর্বে ডোমকল। এদের মধ্যে সবথেকে গুরুত্ব ছিল লালগোলা ও ভগবানগোলার—সেগুলিতে সবথেকে বেশী চর ছিল। আমার পূর্বসূরী অস্পষ্ট ইঙ্গিত করে এমনভাবে এমন কথা ব্যবহার করলেন, তাতে মনে হল মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি-সি রায়ের নিজস্ব মত ছিল এই সম্পূর্ণ অঞ্চল থেকে মুসলমান বাসিন্দাদের দেশের বাইরে সমূলে বহিষ্কার করা। তাঁর কথায় মনে হল তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ এই যে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব অভীপ্সা এই হলেও সরকার এই মর্মে কখনও কোন লিখিত বা মৌখিক 'আদেশ' জারি করেননি। তিনি আরো বললেন, জেলার মুসলমান অধিবাসীদের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে কোনদিন আলোচনা করেননি, এমন-কি পারতপক্ষে তাদের সঙ্গে দেখা করা বা আলাপ করা সমীচীন বোধ করেননি, পাছে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অপবাদ

বটে। তিনি বললেন, সে যাই হোক, মুসলমানদের উপর কড়া নজর রেখে তাদের নিরস্ত রাখা প্রয়োজন। বললেন, উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি এই সমস্যাটি আমাকে 'উপহার' দিয়ে যাচ্ছেন, আশা করি আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে।

বিদায়ের আগে আমার পূর্বসূরী বললেন, ভার্নন এস-সি বোনার্জি প্রায় ত্রিশ হাজার অবাঞ্ছিত মুসলমান পরিবারের নাম, ঠিকানা, বসবাস, জমিজমার একটি তালিকা করেছেন, এই সমস্যা নিরাকরণে এই তালিকাটি সম্ভবত আমার কাজে লাগবে। আমার পূর্বসূরী জেলাত্যাগ করার পর ভার্ননের সঙ্গে বিশদ আলোচনার শুরুতে তার কথায় ধারণা হল, এই তালিকা প্রস্তুতির ব্যাপারে জেলার কংগ্রেস সভাপতির বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। ভার্ননের ঘরে সারি সারি শেল্ফে থাক-থাক করে অঞ্চল ধরে ধরে তালিকা: ক্রীশ্চানরা যাকে বলেন ডুম্স্ ডে তালিকা—অর্থাৎ সৃষ্টির শেষদিনের মৃতদের তালিকা—প্রায় তারই সমান বড়। ভার্নন তালিকাগুলির কয়েকটি নমুনা দেখিয়ে বললেন, ভারতের মাটিতে দেশবিদ্বেষীদের থাকা অনুচিত। দেশবিদ্বেষের প্রমাণ হিসাবে কী আছে জানতে চাইলে বললেন, কোন স্পষ্ট প্রমাণ যদিও নেই, তবে দেশবিদ্বেষীর হৃদয় বলে তো বস্তু থাকতে পারে! এ যুক্তি অবশ্য অকাট্য।

কাজে যোগ দেবার কয়েকদিন পর কলকাতায় গিয়ে আমি হোম সেক্রেটারি রণু গুপ্ত, কমিশনার জে-এন তালুকদার ও চীফ সেক্রেটারি সুকুমার সেনের কাছে এই প্রশ্নটি তুলি। প্রত্যেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার কেউই এই মর্মে লিখিত বা মৌখিক কোন নির্দেশ বা আদেশ কখনও ব্যক্ত বা জারি করেননি। নজীর হিসাবে বললেন দেশভাগের পর মালদার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কালিয়াচক থানায় সব থেকে হাঙ্গামা হয়। হাঙ্গামাকারীদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল সে-জেলার কিছু অংশ যাতে পুনরায় পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকার যদি মালদাতেই সে সময়ে সে-থানার কিছু মুসলমানদের উৎখাত করে বিতাড়িত করার আদেশ না দিয়ে থাকেন অথবা ব্যবস্থা না করে থাকেন, তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় সে ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন কারণ বা প্রশ্নই ওঠে না।

তা সত্ত্বেও খোদ কর্তার মুখে আসল কথাটি—ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্ট্রেট ফ্রম দি হর্সেজ মাউথ'—শোনার কৌতূহল আমার গেল না। পরেরবার যখন কলকাতায় গেলুম তখন ডাঃ বি-সি রায়ের কাছে আমি কথাটি তুলি। তিনি এক-কথায় বললেন, 'রাবিশ। ব্যাপারটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি, শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের মাথায় ভনভন করছে জানি। আমার স্পষ্ট নির্দেশ ও ভর্ৎসনা সত্ত্বেও তিনি এই

নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে ভুলভাবে ওসকাচ্ছেন কেন বলতে পারি না। আমি যেমন বিস্মিত তেমনি বিরক্ত। এ ব্যাপারে এই ধরনের কানাকানি একেবারে বন্ধ কর।'

আমার মন কী খাতে বইছিল পাঠক আগেকার অধ্যায়ে হয়তো কিছুটা বুঝেছেন। সে পড়ে আশা করি তাঁর মনে কোন সংশয় বা দ্বন্দ্ব থাকবে না। আমি মুর্শিদাবাদ যাবার আগে সে জেলার কংগ্রেস কমিটি আমার বিষয়ে খোঁজ-খবর নিশ্চয় নিয়েছিলেন, ফলে সভাপতি শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্থির করে নিয়েছিলেন আমি মারাত্মক 'লাল'। আমার 'লাল' বদনাম হয়তো কিছু অগ্রজদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু 'লাল'ই হোক আর যাই হোক, মুর্শিদাবাদকে তো ভারত ইউনিয়নের মধ্যে রাখতে হবে, সুতরাং ডাঃ বি-সি রায় ও চীফ সেক্রেটারি সেন হয়তো ভেবেছিলেন বেহাত থেকে লোহিত ভাল। সেই বিচারে অগত্যা আমাকে মুর্শিদাবাদে স্থলাভিষিক্ত করেন।

যেদিন চার্জ নিলুম, সেদিন ৮ ডিসেম্বর ১৯৪৮। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি পাঁচজন সহকর্মীর সঙ্গে—তাদের পঞ্চপাণ্ডব বলে ডাকতে শুরু করলুম—বিশদভাবে আলোচনার জন্য একটা লম্বা বৈঠক হল। নিজেকে চতুর কৃষ্ণ বলে দাবি করতে পারি না, ততখানি বুদ্ধি আমার নেই। তবে যতই হোক, মিত্রবংশীয় তো, এবং, হাজার হোক, আট বছর তো হাকিমী করেছি, টেনিসনের ইউলিসিসের মত অসমান আইন পরিবেশন করে তো হাত পাকিয়েছি! বুদ্ধির ধার কি কিছুই বাড়েনি? তবে একথাও ভাবতে ভাল লাগে চরিত্রে দেশজ ধূর্ততা ও শঠতার আধিক্য কোনকালে হয়নি, যার প্রমাণ আশেপাশের ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত হরদম পাই। ইংরেজি সমাজে ভদ্রলোকের পরিচয় হচ্ছে, কোন লোকের নাভির নিচে আঘাত করবেন না, ('নাভি' কথাটি শারীরিক ও প্রতীক দুই হিসাবেই প্রযোগ্য,) ভূলুণ্ঠিত মানুষকে মারবেন না বা তাকে ঠকাবেন না। শৈশব থেকেই দেখেছি বাবা-মা কথার হেরফের বা ধূর্ততার গন্ধ পেলে রেগে যেতেন।

প্রথম সিদ্ধান্ত হল, যতশীঘ্র সম্ভব সকলে মিলে অন্তত তিনদিন ক্রমান্বয়ে জেলার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে সীমান্তের প্রতি সুরক্ষা ঘাঁটি একে একে পরিদর্শন করব, এবং প্রতি ঘাঁটিতে রক্ষীবাহিনীর দলপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় করব, সেই সঙ্গে আমার 'কালো' বইতে তাঁদের ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি লিখে রাখব। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল, বহরমপুর ক্লাবে মদ্যপানের 'বার'টি পুনরায় চালু

করতে হবে, সেটি আমার পূর্বসূরীর সময়ে বন্ধ করা হয়। অফিসাররা সারাদিন রোদে মাঠ ভেঙে ঘোরাফেরা করে এসে শুষ্ককণ্ঠে তো রাত কাটাতে পারে না। তৃতীয় সিদ্ধান্ত হল, মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে সবকটি ঘাঁটি ঘুরে স্থানীয় অধিবাসী ও রক্ষীদের সঙ্গে আলাপ করার পর শহরে ফিরে এসে আমরা ভার্নন বোনার্জির বিশাল তালিকাগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক বিচার-আলোচনা করব।

তিনদিনের সফরে যাবার আগে আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে অনুরোধ করলুম, আমি যে-সব স্থানে যাব, অবিলম্বে আমি যাবার আগে সে-সব থানায় রেডিওগ্রাম পাঠিয়ে নির্দেশ দিতে প্রতিদিন ঐ অঞ্চলের থানা অফিসার কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন একটি স্থানে এই অঞ্চলের সব ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্ট ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যেন হাজির থাকেন। কারণ তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি পরিচিত হতে চাই। ধরেই নিয়েছিলুম তাঁদের অধিকাংশই মুসলমান হবেন, এবং তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। প্রতি মিটিং-এ আমার মুখ ফুটে পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন, দেশের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের সহযোগিতার উপর আমি একান্তভাবে নির্ভর করি। কারণ, একথা তো জলের মত পরিষ্কার যে স্থানীয় কোনও সংবাদই তাঁদের অবিদিত নয়, মায় প্রতিটি ঘাঁটিতে কী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, রক্ষী আছে তাও মোটামুটি তাঁদের জানা আছে। প্রতিটি মিটিং-এ আমি সমবেত জনতার সঙ্গে সাড়ম্বরে আমার পঞ্চপাণ্ডবের পরিচয় করিয়ে দিলুম। প্রতি মিটিং-এ আবেদন করলুম তাঁরা যেন তাঁদের স্থানীয় রক্ষীঘাঁটিগুলির সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেন, তাঁদের প্রতি বন্ধুভাব রাখেন, কারণ তাঁদের সাহায্য ও বন্ধুত্ব পেলেই তবে রক্ষীরা রাজশাহীর হামলাকারীরা আমাদের অঞ্চল থেকে যে-সব গরুবাছুর বলপ্রয়োগ করে অথবা ছলেবলে নিয়ে গেছে সেগুলি উদ্ধার করে আনার জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা পাবেন। গরুবাছুর উদ্ধার সম্ভাবনার যুক্তিটি ছিল মোক্ষম, কারণ সেগুলি ফিরে পাবার সম্ভাবনার তুলনায় অন্য কোন মনোভাবই ততখানি বলবৎ থাকবে না, এমন-কি সম্ভাব্য পাকিস্তানপ্রীতিও নয়। তদুপরি, যেখানেই পুলিশের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি ও মিনার ছিল সেখানকার রক্ষীদের সঙ্গে স্থানীয় মুখপাত্রদের আলাপ করিয়ে দিলুম। অবশ্য কোন অধিবাসীকে কোন ঘাঁটির এমন কাছে নিয়ে যাইনি, যার সুযোগ নিয়ে তারা নিজের চোখে দেখতে পায় কোথায় কত রক্ষী, কী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ আছে। যে-সব তথ্য স্থানীয় অধিবাসীরা অল্লায়াসে জানতে পারে, সে-সব তথ্য লুকিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা, তাতে উভয়ের

অবিশ্বাসই বাড়ে। এই প্রথা অবলম্বনের ফলে মাস তিনেকের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের মার্চের দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের রক্ষীরা ও জেলাবাসী পাকিস্তানীদের অধিকৃত এলাকা থেকে ৩২০টি গরুবাছুর-মোষ উদ্ধার করে। তার আগে পর্যন্ত পাকিস্তানীরা আমাদের জেলার ৩৩২টি গরুবাছুর-মোষ লুঠ করে। ১৯৪৯-এর ৯ এপ্রিল কলকাতায় যখন দুই বঙ্গের চীফ সেক্রেটারিদের মিটিং হল, তার আগে দু'পক্ষেরই গরুমোষ লুঠের সংখ্যা প্রায় সমান সমান হয়ে গেল, ডিসেম্বরের আগে পাকিস্তানের ভাগে যা নাকি অনেক বেশী ছিল। এই কনফারেন্সেই প্রথমবার সন্তোষ প্রকাশ করা হয় যে গত তিনমাসে মুর্শিদাবাদ-রাজশাহী সীমান্তে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটেনি। এর পরে ভার্ননের করা 'মনে কর শেষের সেদিন কী ভয়ঙ্কর' তালিকাটিকে নিঃশব্দে কবর দেয়া হল।

পঞ্চপাণ্ডব

কালেক্টরেট অফিসে ভার্ননের নিজস্ব একটি ঘর ছিল, যেখানে সে তার এম-আই (ইংরেজদের বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার নাম দিয়ে অন্য পাণ্ডবরা নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করত) কাজ করত। সঙ্গে খাটত একটি বড় গোছের দপ্তর, তাদের কাজ ছিল ভার্ননের বিরাট যমরাজ তালিকা তৈরি করা, তার খুঁটিনাটি সংশোধন করা। সমুখের দরজা সর্বদা ভিতর থেকে তালা দেয়া থাকত। দরজার বাইরে ছিল একটা বড় নোটিস : 'প্রবেশ নিষেধ'। ভার্ননের একজন একান্ত সচিবও ছিল, ভার্ননের অনুমতি বিনা তার কামরায় প্রবেশ রোধ করত। অতিথিদের অপেক্ষা করতে হত সেই সচিবের ঘরে।

আইভানের কথায় বলি। হাঁটাচলার ধরনে মনে হয় বছর ত্রিশ বয়সের এক মহিলা, মুখের উপর ঘোমটা টেনে একদিন এসে ভার্ননের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে; ভার্ননের নিজস্ব সচিবকে একটি কার্ড দিলেন : তাতে নাম লেখা 'কানন দেবী'। সচিব শশব্যস্তে কার্ডটি নিয়ে ভার্ননকে দিল। ভার্নন চেয়ার থেকে উঠে দ্রুতপদে অতিথিকক্ষে গিয়ে মহিলাদের প্রতি স্বাভাবিক নম্রতা ভব্যতা ও ঔৎসুক্যপূর্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে সসম্ভ্রমে ঘরে এনে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে বিনীতকণ্ঠে হুজুরে-হাজির ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাঁর জন্য কী করতে পারে। ভদ্রমহিলা খানিকক্ষণ চুপচাপ, যেন অচেনা পুরুষের সঙ্গে কিভাবে কথা বলবেন ভাবছেন। তারপর হঠাৎ মুখের উপর থেকে ঘোমটা পিছনে টেনে সরিয়ে, গলা উঠিয়ে

বললেন, 'শালা! এই তোমার দেশহিতার্থে গোপন কাজ!' ভদ্রমহিলা, আর কেউ নয়, আইভান!

যিনিই বহরমপুরে গেছেন তাঁরই, যাকে বলত ব্যারাক স্কোয়ার, বহুদিন মনে থাকবে। এটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড মাঠ, চৌকোণা, এক-একটি দিক প্রায় ৪৪০ গজ। পশ্চিম, অর্থাৎ ভাগীরথীর দিকে ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এ-ডি-এম, জজ-সাহেবের বাড়ি, তারপর তখনকার দিনে বহরমপুর গার্লস্ কলেজ। উল্টোদিকে, অর্থাৎ পুবে, বড় রাস্তার ওপারে ছিল কালেক্টরেট, জজদের বিচারালয় এবং অন্যান্য দপ্তর। উত্তরে ও দক্ষিণে দুপাশে ক্লাইভের আমলে ছিল ফৌজি অফিসারদের বাড়ি, পরে হয় উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারদের কোয়ার্টার্স। সারা ব্যারাক স্কোয়ার ঘিরে সার দিয়ে ছিল অতি প্রাচীন বিশাল মেহগনি, শিশু, শিরিষ গাছ। কোনটিরই বয়স দেড়শ'র কম নয়, প্রত্যেকটির গুঁড়ির ঘের পনেরো থেকে বিশ ফুট। পূর্বকালে স্কোয়ারের মাঠে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হত, নতুন পতাকাদানের উৎসব হত। আমার সময়ে অনেকগুলি ছোট বড় খেলার মাঠে ভাগ করা ছিল। মাঠের সবদিক ঘিরে ছিল চওড়া লাল কাঁকর ও পাথরকুচির রাস্তা। যানবাহন হিসাবে মুখ্যত ছিল সাইকেল রিকৃশা।

প্রত্যহ সকালে আইভানের কাজ ছিল ছোট ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলা, যতক্ষণ না সাইকেল রিকৃশা চলতে শুরু করে। যেই সোয়ারির আশায় প্রথম খালি রিকৃশাটি দেখা যেত আইভান তৎক্ষণাৎ তার উপর চড়াও হত। রিকৃশা থামিয়ে আইভান রিকৃশা চালককে সোয়ারি সীটে বসিয়ে নিজে রিকৃশা চালক হয়ে স্কোয়ারের দু'দিকে চালাত। তারপর রিকৃশা ফেরৎ দিত। আইভান রিকৃশা চালানোর সময়ে তার সাদা-কালো ফক্স-টেরিয়ার রিকৃশার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ত। শহরের রিকৃশাওলাদের আইভান হল দেবতা।

ক্লাবের মদের 'বার' পুনরায় শুরু করায় স্থানীয় ভদ্রলোকরা, বিশেষত কংগ্রেস কর্তারা বড় বিরূপ হলেন। আমরা কেউ যে বেশী পান করতুম তা নয়। তখনও বিয়ার বিদেশ থেকে আসত, বেশ সস্তা ছিল, দেশী বিয়ারও ক্রমশ ভাল হচ্ছে। কড়া মদ, যেমন হুইস্কি, এখনকার মত যখন তখন খাবার রেওয়াজ ছিল না। সন্ধ্যায় সচরাচর আমরা হয়তো খেতুম এক গ্লাস বিয়ার, তারপর ছোট একটি, বড়জোর দুটি হুইস্কি বা রাম, অথবা ছোট জিন আর লেবুর রস, যাকে বলত গিমলেট। তবে মদ নামটাই লোকের কানে বেয়াড়া শোনাত। যদিও বহরমপুর শহর, বিশেষত খাগড়া রোডের, মাতালদের মাতলামির জন্যে বেশ সুনাম ছিল।

রাত দশটার পর হাঁটার অসুবিধা হত।

বড়দিনের আগের সন্ধ্যাবেলা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবে বার খুললুম। 'ক্রসিং দি বার' ব্রত যাপন করে সার্কিট হাউসের বাবুর্চি যে ডিনার রেঁধেছিল তাই সাতজনে খেলুম। দেখলুম ক্লাবের আবদার অনভ্যাস সত্বেও তার কাজ একেবারে ভোলেনি। আমরা সাতজনে রাত্রি প্রায় একটার সময়ে সার্কিট হাউসে ফিরে পরস্পরকে শেষবারের মত 'মেরি ক্রিস্‌মাস্‌' বলে যে যার ঘরে শুতে গেলুম। জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় ঢুকব এমন সময়ে ভূপেনের ঘরের দিক থেকে হঠাৎ উঁচু সরুগলায় 'ওঃ' বলে যেন একটি শব্দ শুনলুম, তারপর মনে হল গুমিয়ে গুমিয়ে কে যেন কাঁদছে। আমরা দৌড়ে তার ঘরে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতে বললুম। অল্প কিছু পরে ভূপেন বেরিয়ে এল। এমনভাবে তাকালো মনে হল জ্যান্ত গিলে খাবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যাবার আগে অন্য চারজনে দুষ্টুমি করে ভূপেনের বিছানার চাদরের উপর, তিন সার করে দাঁতমাজার টিউবগুলির মুখ খুলে সযত্নে খুব পরিপাটি করে সার সার করে সাজিয়ে, তারপর ভূপেনের চব্বিশ না ছত্রিশ শেয়ালের চামড়ার কম্বলটি সযত্নে বিছিয়ে রেখে গেছল, যাতে উপর থেকে কিছু না বোঝা যায়। ভূপেনের সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না। কাপড়জামা ছেড়ে ভূপেন যেই বিছানায় ঢুকে শুয়েছে অমনি তার শরীরের চাপে টিউবগুলি থেকে দাঁতের মাজন পটপট করে বেরিয়ে তার সারা গায়ে লেপটে গেছে। সকলেরই শুধু-গায়ে শোয়া অভ্যাস ছিল, পরনে থাকত খাটো জাঙিয়া। ফলে, সেই শীতের রাতে উনুনে জল চড়িয়ে গরম করে, সেই জলে চান করে আর ভিজে কাপড় দিয়ে শেয়ালের চামড়ার কম্বল থেকে ঘষে ঘষে মাজন তুলতে অনেক রাত্রি হয়ে গেল।

ভূপেনের ছিল ঝকঝকে নতুন অস্টিন-১৬ সিডান গাড়ি। ছ'জন আরাম করে বসা যায়। এটি ছিল আমাদের সকলের যৌথ সম্পত্তি, সকলের গর্বের বস্তু। যৌথস্বত্ব কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য। ভূপেন চাকরিতে ঢুকে প্রথম বর্ধমানে যায়, সেখানেই গাড়িটি কেনে। বর্ধমানে থাকতেই গাড়ির গায়ে নানা জায়গায় ধাক্কার দাগ পড়ে। মুর্শিদাবাদে যখন গাড়ি নিয়ে এল তখন বাকি চারজন ঠিক করল, ভূপেন গাড়ি চালাতে জানে না; কথাটাও অবশ্য সত্যি। সুতরাং বাকি চারজনে গাড়ির ভার নিল। আইভান স্টিয়ারিং ধরত। বাকি চারজন সমুখের সীটে ঠেসাঠেসি করে বসত। সুনীল আইভানের ডানদিকে বসে এক্সিলেটরে

পা দিয়ে থাকত, আইভানের বাঁদিকে বসে জীতেশ ব্রেকের উপর পা দিত। ভার্ননের পা থাকত ক্লাচে। মাঝে মাঝে গিয়ার বদলানোর সময়ে ভার্ননের পা ঠিকমত থাকত না বলে বিকট আওয়াজ হত। আভা আর আমি বসতুম পিছনে। সঙ্গে ভূপেন। সাতজনে মিলে এইভাবে তৈরি হত একটি গাড়িচালনা অর্কেস্ট্রা। তার মধ্যে আভা হত স্যাক্সোফোন। তার গলায় মাঝে মাঝে উচ্চগ্রামে ফেটে পড়ত সাতটি সুরের ফুলঝুরি। কিন্তু স্বরের আরোহণ-অবরোহণ ঠিক শাস্ত্রীয় মতে হত না, হাসি এতই চড়া ও লাগামছেঁড়া হত। চুয়াত্তর বছর বয়সে এখনও একই রকম হাসি আছে। একান্ন বছর ধরে একই বিজ্ঞ পেঁচার অহরহ সান্নিধ্যের ফলে হয়তো সামান্য একটু মন্দা পড়েছে, তবে জাত খোয়ায়নি।

গিয়ার চেঞ্জের কথা বলতে গিয়ে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। পাছে ভুলে যাই এখনই বলি। ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভায় যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মন্ত্রী হন। গান্ধীবাদী ছিলেন, সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। কাজকর্মের জন্য তাঁকে একটি হিন্দুস্থান গাড়ি দেয়া হল। তিনি নিতে আপত্তি করলেন। ডাঃ রায় বললেন নিতেই হবে। অগত্যা। 'কেবল', ডাঃ রায় শ্রীপাঁজাকে বললেন, 'ড্রাইভারের উপর একটু নজর রাখবেন, ওরা বড় গাড়ির যন্ত্রপাতি চুরি করে, নতুনের বদলে পুরনো পার্ট দিয়ে দেয়।' এরপর থেকে শ্রীপাঁজা যখনই গাড়ি চড়তেন তখনই সীটের সমুখে এগিয়ে উদগ্রদৃষ্টিতে আলগোছে বসতেন, ড্রাইভারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে, চোখ-কান খুলে। একদিন এক চৌমাথায় গাড়ির জট ছাড়িয়ে পুলিশ যখন তাঁর গাড়ি ছেড়ে দিল তখন হঠাৎ চলবার মুখে গাড়িতে বিকট ক্যাঁচ করে শব্দ। শ্রীপাঁজা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী হল ? শব্দ কেন ?' ড্রাইভার বলল, 'ও কিছু নয়, গিয়ার চেঞ্জ করছিলুম।' 'গিয়ার চেঞ্জ ? আমার নাকের ডগায় ? কী সাহস তোমার ? চল ফিরে চল এক্ষুনি রাইটার্স বিল্ডিং-এ। আমাকে রিপোর্ট করতে হবে !' স্বাধীনতার প্রথম যুগে রাইটার্স বিল্ডিংসে এই ধরনের অনেক গল্প চালু ছিল।

ক্রিস্‌মাসের পর এল বছরের শেষ দিন। বড়দিনের পরদিন থেকে সারা সপ্তাহটি চারজন অফিসার ঊর্ধ্বশ্বাসে সীমান্তের প্রতিটি ঘাঁটি আর পর্যবেক্ষণ মঞ্চগুলি খুঁটিয়ে ঘুরে দেখল। সকলেই দেখলুম সমান কর্তব্যপরায়ণ, অন্য কিছুতে হুঁস নেই। হৈ-হল্লা করে হয়তো সকলে মিলে দারুণ খানাপিনা চলছে, এমন সময়ে গোলমালের খবর আসামাত্র এক ঘণ্টার নোটিসে সবকিছু ফেলে তৈরি হয়ে, নিজের নিজের মেটে আমার যদি কিছু বিশেষ বক্তব্য থাকে লিখে নিয়ে,

সকলে ছুটল, পরের আড়াই-তিনদিন স্নানখাওয়া-ঘুমের কোন বালাই নেই। ৩০ ডিসেম্বর সকলে ক্লান্ত, নিস্তেজ হয়ে ফিরে এল। একরাত্রি ভাল করে ঘুমিয়ে তাজা হল। যাবার আগে তারা বছরের শেষ রাত্রে সার্কিট হাউসে কী ধরনের খানাপিনা হবে আভা আর বাবুর্চির সঙ্গে কথা বলে পুরো ব্যবস্থা করে গেছল। এস-পিকে নিমন্ত্রণ করা হলেও, পাছে কংগ্রেস চটে যায় সম্ভবত সেই কারণে, আসতে রাজি হলেন না। আইভান যাবতীয় কড়া পানীয় আর নানাবিধ কাটা-ফল দিয়ে এক অপূর্ব 'ফ্রুটকাপ' তৈরি করল। বেশ কড়া ধাত ছাড়া এ পানীয় 'নামানো' সোজা কাজ ছিল না। মিনমিনে, যাকে শেক্স্পীয়র বলেছিলেন লিলি-লিভার্ড্, ধাত হলে এক গেলাসেই শুয়ে পড়তে হত। মাঝরাতে যখন ডিনার শেষ হল, স্থির হল, শহর ঘুরে, যাদের সঙ্গে আলাপ আছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের জাগিয়ে শুভ নববর্ষ করতে হবে। প্রথমে এস-পির বাড়ি গেলুম। সকলেই মনে হল ঘুমিয়ে কাদা। বেশ শীত, সারা বাড়ি নিশ্ছিদ্র করে দরজা জানলা বন্ধ। বাড়িতে যে রক্ষী ছিল ঘুমে চোখ পিটপিট করে দেখে গাড়িতে সমুখে তিন আর পিছনে চার, মোট সাতজন লোক, তার মধ্যে আবার একজন স্ত্রীলোক, সকলেই গলা ছেড়ে চীৎকার করে গাইছে : 'ফর হি ইজ এ জলি গুড ফেলো'। তার চক্ষু চড়কগাছ। 'জলি গুড ফেলো' অবশ্য ভিতর থেকে টুঁ শব্দটি করলেন না। নিরাশ হয়ে সেখান থেকে আমরা ডাঃ রোহিণী বড়ুয়ার বাড়ি যাওয়া স্থির করলুম। উনি ছিলেন সহকারী সিভিল সার্জন। অতি চমৎকার লোক, পরে বহু বছর জামসেদপুর শহরের ব্লাড ব্যাংকের অধিকারী ছিলেন। এক মেয়ে ছিল, নাম মিনু। মিনুর ভ্রাতৃবধূ শকুন্তলা বড়ুয়া এখন প্রখ্যাত চিত্রতারকা। বড়ুয়ারা খাগড়া রোডের মুখে বড় কিন্তু জনবহুল রাস্তার উপর একটি বাড়িতে থাকতেন।

ডাঃ বড়ুয়ার বাড়ি পৌঁছবার অল্প কিছু আগে গাড়ি আর চলে না। সামনের তিনজন গাড়ি থেকে নেমে জোর ঠেলাঠেলি আর ততোধিক সজোরে চেঁচামেচি ও হাসি শুরু করে দিল। তাদের সকলের গলা ছাপিয়ে শোনা যায় আভার হাসি। রাস্তার দুধারে, বিশেষত দোতলায়, সন্তর্পণে একটি-দুটি জানলা খোলে, আর রাস্তায় ফৌজি অফিসারদের যেই দেখা, অমনি খটাস করে বন্ধ হয়ে যায়। বুঝলুম চারদিকে তাঁদের সুনাম ছড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত গাড়ি দুরস্ত হল, ডাঃ বড়ুয়ার বাড়ির সমুখে পৌঁছল, আমরা নামলুম। মিসেস বড়ুয়া তৎক্ষণাৎ স্টোভ জ্বালিয়ে টুকিটাকি খাবার গরম করে ধরে দিলেন। সেখানে মিনিট কুড়ি থেকে 'টিপারারি' গাইতে গাইতে আর চেঁচিয়ে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' বলতে বলতে আমরা

গাড়িতে উঠলুম। এরপর আমরা জজসাহেব মণীন্দ্রনাথ গণের বাড়ি 'হানা', দিলুম। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভদ্র ব্যবহার করলেন, তবে চুপচাপ। সম্ভবত হৈ চৈ পছন্দ করতেন না। তাঁদের শুভ নববর্ষ জানিয়ে আমরা রাত দু'টোর সময়ে শুতে ঢুকলাম।

তখনকার দিনে পয়লা জানুয়ারি ছুটি হত। ৩ জানুয়ারি কাশিমবাজারের মহারাজা তাঁর কাশিমবাজারের কারখানায় একটি নতুন অংশের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। উৎসবের শেষে কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামাপদ ভট্টাচার্য আমাকে একধারে ডেকে নিয়ে বললেন, বছরের শেষ রাত্রে আমার অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা এক সম্ভ্রান্ত পাড়ায় যাচ্ছেতাই চেঁচামেচি, হৈ-হল্লা করে। কোথা থেকে তাঁরা এক বাজারের-স্ত্রীলোক জোগাড় করে সঙ্গে এনেছিল। স্ত্রীলোকটিরও বোধহয় বেশ 'নেশা' হয়েছিল, বিশেষ করে তার হাসির চোটে সারা পাড়ার ঘুম নষ্ট হয়। এসব কথা তিনি উত্তেজিত ঘৃণার কণ্ঠে বলে মন্তব্য করলেন, 'ছি, ছি, বড়ই আপত্তিকর ব্যবহার। আপনি ওদের একটু শাসন করুন।'

আমি তাঁকে বললুম আমার অফিসাররা অল্পবয়স থেকে এতকাল ফৌজে ছিল। আমিও সিভিল সার্ভিসের লোক। সকলেই বছরের শেষ রাত্রে হৈ-হল্লা করা স্বাভাবিক বলে ভাবতে অভ্যস্ত। আমিও সে দলে ছিলুম। যে স্ত্রীলোকটির কথা তিনি বললেন, তিনি আমার স্ত্রী। উনি স্ত্রীলোকটিকে যে-চরিত্রের নারী বলে সন্দেহ করছেন, তিনি আদৌ সে-প্রকৃতির নন, সে-রকম একটু হলে মাত্র একজনের প্রতি অত কঠোর নিষ্ঠা হয়তো একটু কমত, তাতে পুরুষটির হয়তো একটু স্বস্তি হত, বিবেকদংশনও কম হত : এ সত্যটি অন্তত আমি নিজে হাড়ে হাড়ে জানি। এই স্বীকারোক্তি শুনে শ্যামাপদবাবু হতবাক হয়ে, কয়েক মুহূর্ত পরে, নমস্কার করতে ভুলে গিয়ে, একটি কথাও না বলে, চলে গেলেন।

ডাঃ বি-সি রায় ও তদন্ত

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমেই কলকাতায় চীফ সেক্রেটারি ও হোম সেক্রেটারির সঙ্গে একটি মিটিং-এ আমার ডাক পড়ল। চীফ সেক্রেটারি ঢাকার চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনায় যাবেন, তার আগে মুর্শিদাবাদ-রাজশাহী সীমান্তের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার মুখে শুনতে চান। মিটিং-এর শেষে হোম

সেক্রেটারি বললেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি যেন একবার দেখা করে যাই, তিনি কথা বলতে চান। ডাঃ রায়ের ঘরে যখন ঢুকলুম, দেখি তিনি দরজার উল্টোদিকে এক দেরাজ খুলে ফাইল বার করছেন। আমাকে দেখে তিনি জানলার দিকে তাকিয়ে—কোন অপ্রিয় কথা বলার সময়ে তিনি কুণ্ঠিত হয়ে এই ভঙ্গীতেই কথা বলতেন—যথাসম্ভব অন্যমনস্ক গলায় বললেন: 'দেখ, অশোক, তোমার এই গুণ্ডা অফিসাররা, মানে তোমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা, ক্রমে ক্রমে বড় হুল্লোড়ে হয়ে উঠছে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তোমার জেলার কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, আমাকে লিখেছেন, রাত্তিরে তারা বাজারের স্ত্রীলোক জোগাড় করে ভদ্রপাড়ার রাস্তায় যা নয় তাই হৈ-হল্লা করে।' তারপর, হয়তো বেশী বলে ফেলেছেন মনে করে নিজেকে সামলে নেবার সুরে বললেন, 'অবশ্য আমি তাঁকে বলব যে যদি তাঁরা চান মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবঙ্গে থাকুক, তাহলে এসব একটু-আধটু সহ্য করতে হবে। যে গরু দুধ দেয় সে পা ছুঁড়ে লাথিও মারে। ভাবলুম, তোমাকে বলে রাখি ওদের একটু দুরস্ত কোরো।'

মনে যে আশা নিয়ে তিনি দ্বিতীয় অংশটি বললেন, তাতে আমার মনে ঠিক উল্টো ফল হল। দপ করে উঠলুম। মনে হল অপর পক্ষের কিছু না শুনেই তাঁর এরকম বলার কোন এক্তিয়ার নেই। তাছাড়া, যা আদৌ সত্যি নয়, তা নিয়ে তিনি ক্ষমা চাইতে যাবেন কেন। শ্যামাপদবাবুর সঙ্গে ৩ জানুয়ারি যেসব কথা হয়েছে বলতে যাচ্ছি, তিনি বিব্রত হয়ে আমাকে থামাতে যাবেন, তার মুখে বললুম, তিনি যেন দয়া করে এক মিনিট আমার কথা শোনেন। শ্যামাপদবাবুকে যা বলেছিলুম তাই বললুম, আমরা ৩১ ডিসেম্বর রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গাড়ি করে গেছলুম। আমিও দলে ছিলুম। আমাদের সঙ্গে একটিই স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁকে বাজার থেকে জোগাড় করা হয়নি, তিনি আমার স্ত্রী। যদি সরকারের মুখে কেউ চুনকালি দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন, সে হচ্ছি আমি, কারণ আমিই ছিলুম সে দলে সব থেকে উঁচু পদের; আমাকেই সব শাস্তি মাথা পেতে নিতে হবে। যদি আমার কনিষ্ঠদের শাস্তি দিতে হয় তবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে দিতে হবে। অতএব আমি এইটুকু ভিক্ষা করব, প্রধানমন্ত্রী ব্যাপারটিতে ভাল করে তদন্তের ব্যবস্থা করুন, তার কমে আমি তৃপ্ত হব না।

হতভম্ব ভঙ্গীতে আমার দিকে দু'মুহূর্ত তাকিয়ে, এক পা এগিয়ে, ডাঃ রায় বললেন, 'তোমার স্ত্রী?' বললুম, 'হাঁ, আমিও সঙ্গে ছিলুম।' 'কিছু মনে কোরো

না, অশোক, কিছুই তাহলে হয়নি। তোমাকে জানিয়ে রাখলুম, এইটুকু, ব্যস।'

'কিন্তু, স্যার, আমি সত্যিই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হব আপনি যদি তদন্তের হুকুম না দেন। আমার প্রতি আপনার আস্থা আছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনারও নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন সে আস্থা অমূলক নয়।'

বেরিয়ে এসে আমি সুকুমার সেন ও রণু গুপ্তকে বললুম, আমি তদন্ত চেয়েছি।

কমিশনার যতীন্দ্রনাথ তালুকদার তদন্ত করলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে এসে এক সপ্তাহের একটু কম থাকলেন। সঙ্গে নিজস্ব লোকজন নিয়ে এলেন। আমাদের কাছে এককাপ চা খেতে বলেও তাঁকে বিব্রত করিনি। সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে কথা বললেন, জেরা করলেন, ডাঃ বড়ুয়ার প্রতিবেশীদের ডেকে পাঠালেন। স্থানীয় অফিসার, স্থানীয় কংগ্রেসী সংবাদপত্রের সম্পাদক রেজাউল করিম, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য সকলের সঙ্গে কথা বললেন।

১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারির শেষে শ্যামাপদবাবুকে লেখা ডাঃ রায়ের ব্যক্তিগত চিঠির একটি কপি পেলুম। আমার কপিতেও ডাঃ রায় সই করেছেন। একটি পুরো ফুলস্ক্যাপ কাগজের সবটুকু ভর্তি চিঠি। প্রথমে অভিযোগগুলির উল্লেখ করেন, তারপর কে তদন্ত করেছেন, তদন্তে কী প্রকাশ পেয়েছে সবিশদ বর্ণনা। চিঠি শেষ করেন এই মন্তব্য দিয়ে, যে তিনি এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তাঁর অফিসাররা কোন অশোভন কার্যকলাপ বা কথাবার্তা করেনি, কোন কুৎসিত বা দুর্নীতিপূর্ণ কাজ বা অবস্থার সৃষ্টি করেনি। তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তারা বাজারের স্ত্রীলোক নিয়ে ঘোরাফেরা করেছে তা সর্বৈব মিথ্যা। চিঠি শেষ করেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে ভর্ৎসনার সুরে। আদেশ করেন সরকারের অফিসারদের বিরুদ্ধে যেন তিনি ভিত্তিহীন অভিযোগ আর কখনও না করেন। ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রশ্রয় দিলে, অফিসারদের প্রতি মিথ্যা নিগ্রহ ছাড়া সরকারেরও অপমান করা হয়। মনে রাখা উচিত, যে-সব অফিসার দেশসেবায় যথাসাধ্য চেষ্টিত ও নিবেদিত তাঁদের সম্মানরক্ষা সরকার ও সরকারপক্ষের অবশ্য কর্তব্য।

আভার হাসির তোড় অব্যাহতই রইল। হাসির বহরের পরিচয় ডাঃ রায় নিজেই পরে পেলেন। ১৯৫৬ সালে দার্জিলিঙে ম্যাকেঞ্জি রোড ধরে সকালে একদিন মলের দিকে যাচ্ছেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর আত্মীয়পত্নী মিসেস জে-এল সেন। জেলা এঞ্জিনিয়ার এস-কে নাগের বাড়িতে দেখা করে মলের দিকে যাচ্ছি, দেখি আমাদের বেশ কিছুটা আগে ওঁরা দুজনে হাঁটছেন। তখনকার দিনে রক্ষী-

সান্ত্রীর বালাই ছিল না। দেশনেতারা সাধারণ নাগরিকের বেনামিত্বভাব পছন্দ করতেন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দিল্লীতে নেহরু থেকে শুরু করে সব বড় মন্ত্রীর এই মনোভাব ও আচরণ আমি দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অজিতারঞ্জন মুখার্জিকে দেখলুম সস্ত্রীক উল্টোদিক থেকে আমাদের দিকে আসছেন। ডাঃ রায়কে দু'জনে নমস্কার জানিয়ে, এক মিনিট কথা বলে আবার আমাদের দিকে এগোলেন। যখন মুখোমুখি হলুম, অজিতা বললেন, ডাঃ রায়ের কাছে নিজের স্ত্রীর পরিচয় দেওয়ায়, ডাঃ রায় বললেন, 'তা তো বুঝতেই পারছি, পরের স্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্যে মলে ঘোরাফেরা করতে কি তোমার সাহস হবে!' শুনে আভা অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল। দূরে বিধানবাবু ও তাঁর সঙ্গিনী চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলেন, কোথা থেকে হাসি আসছে।

রাজশাহী

১৯৪৯ সালের ৯ এপ্রিল কলকাতায় আমি দুই বাংলার চীফ সেক্রেটারির কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলুম। জানুয়ারি মাসের মিটিং ঢাকায় হয়। ত্রৈমাসিক আলোচনায় এই প্রথম উভয় পক্ষ মুর্শিদাবাদ-রাজশাহী পরিস্থিতি সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। দুই পক্ষের যুগ্ম বিবৃতিতে বলা হল অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে: জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য হাঙ্গামা হয়নি।

কনফারেন্সে একটি মজার ঘটনা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ জেদ ধরলেন, যে পক্ষ যতগুলি গরুমোষ চুরি করেছে, অন্যপক্ষ সেই সংখ্যার বদলে ততগুলি তাদের ধরা গরুমোষ ফেরত দেবে। আমি বললুম, তাতে তো সদ্ভাব ফিরে আসবে না। আমাদের পক্ষের নাগরিক ৩২০টি প্রাণী, রাজশাহীর লোকে ৩৩২টি ধরেছে। ধরাধরি বন্ধ করে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনতে হলে ৩২০টির সঙ্গে ৩৩২টি গরুমোষ বদলাবদলি করতে হবে, সংখ্যা গুণে গুণে অদলবদল করলে সমস্যা থেকেই যাবে। আজিজ আহমদ রাজি হলেন না। আমি তখন সুকুমার সেনের দিকে তাকিয়ে নিচুগলায়, অথচ আজিজ আহমদের কানে যায়, এমন স্বরে বললুম, 'ব্যাপারটি পরের মিটিং-এর জন্য মুলতুবী রাখুন, ইতিমধ্যে আমাদের লোকেরা বাকি বারোটি গরুমোষ ধরে নেবে। আমাদের দিকের ঘাস খুব ভাল।' আজিজ আমার দিকে কটমট করে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে যেন বদান্যতা দেখাচ্ছেন, এই ধরনের গলায় বললেন, 'সেঁন, আচ্ছা তাই হোক,

সংখ্যা নির্বিশেষে দুদিকের ধরা গরুমোষ বদলাবদলি করা যাক।' আনন্দের কথা। মনে মনে বললুম, 'মুখের মত জবাব না দিলে চিঁড়ে ভেজে না।'

এই মিটিং-এ রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপ হল। তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হলুম। সুপুরুষ, সুসভ্য, নরম গলা, নরম ভদ্র ব্যবহার, দেখেই মনে হল নিশ্চয় খানদানি বংশের ছেলে। ঢুকেছিলেন মাদ্রাজ ক্যাডারের আই-সি-এসে। সেনের অনুমতি নিয়ে আমি প্রস্তাব করলুম রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস-পি যদি আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে একবার বহরমপুর আসেন, তবে আমরাও রাজশাহী যেতে পারি। উভয়পক্ষের মধ্যে ব্যক্তিগত সদ্ভাবে বাকি সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে, দুষ্টু লোকে কান ভাঙাবার চেষ্টা করবে না। রাজশাহীর এস-পি ছিলেন মুসা আহমদ, যিনি মুন্সীগঞ্জে আমার সঙ্গে এস-ডি-পি-ও ছিলেন এবং আগের বছর আমি মালদায় থাকতে অল্প সময়ের জন্য মালদায় এসেছিলেন। আজিজ আহমদ রাজি হয়ে গেলেন।

এপ্রিলের শেষে মজিদ আর মুসা সস্ত্রীক তাঁদের জেলার অফিসারদের নিয়ে এলেন। বহরমপুরে যেন উৎসবের হাওয়া বয়ে গেল। বহরমপুরে দু'দিন ছিলেন। মজিদ ও তাঁর সুশ্রী, প্রশান্তমূর্তি স্ত্রীকে আমরা সার্কিট হাউসে অতিথি করলুম। মুসা ও তাঁর স্ত্রী বিলকিস্ থাকলেন আমাদের সংসারে। কিছুদিন অন্তর অন্তর আমরা দুপক্ষ কোথায়, কেমনভাবে, কী আলোচনা করতে সমবেত হব, ইতিমধ্যে দুপক্ষের অধস্তন অফিসারদের মধ্যে কী ধরনের সরাসরি যোগাযোগ ও মিটমাট হওয়া উচিত সে বিষয়ে মিলিত সিদ্ধান্ত নিলুম। প্রথম সিদ্ধান্ত হল, কোনমতেই কোন পক্ষে গুলিগোলা ছোঁড়া চলবে না। দুটি পুরো দিন আমোদ-আহ্লাদে ও সখ্যতায় কোথা দিয়ে কেটে গেল, বোঝা গেল না। আমার ফৌজি অফিসাররা তাঁদের আদবকায়দা দিয়ে অতিথিদের মুগ্ধ করলেন। প্রথম দিন রাত্রে ঝলমলে বুফে ডিনার হল। আইভান ও জীতেশ তখন বদলি হয়ে গেছে। বাকি ছিল সুনীল ব্যানার্জি (তখন জঙ্গীপুরের এস-ডি-ও) আর ভূপেন গাঙ্গুলী, লালবাগের এস-ডি-ও। আইভান আসানসোল থেকে দুদিনের জন্য আসে। তারা এল. তাদের আগেকার জঙ্গী রেজিমেণ্টাল পোশাক পরে, সারা বুকে মেডাল ও শৌর্যের ফিতে সাঁটা। আভা আর আমার পক্ষে এটি ছিল একটি গর্বের ক্ষণ।

মে মাসে এস-পি গোপাল চক্রবর্তী (ইনি মালদা থেকে এলেন ; আগেকার এস-পি, যিনি পুরনো বছরের শেষ রাত্রে লুকিয়ে ছিলেন, তিনি তখন বদলি হয়ে গেছেন), আমি আর আভা রাজশাহীতে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে গেলুম। পূর্ব-

পাকিস্তানে মদ খাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু হৃদ্যতা ও অন্য আতিথেয়তার কোন অভাব ছিল না। আভা আর আমি বিলকিস ও মুসার অতিথি হলুম। ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাস থেকে, মাত্র বাইশ মাসে মুসা আর বিলকিস কত বেশী ধর্মকর্মে অনুরক্ত ও উর্দুভাষী হয়েছে দেখে আমরা একটু বিস্মিত হলুম। বিলকিস ঢাকার নবাববাড়ির উর্দু বলত। কিন্তু মুসার উর্দুজগতে উড্ডয়ন কানের পক্ষে পীড়াদায়ক হত। দুজনেই পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়তেন।

মে মাস থেকে সীমান্ত সমস্যা মিলিয়ে যেতে শুরু করল। আগেই বলেছি সুনীল হল জঙ্গীপুরের এস-ডি-ও, সেটি ফেব্রুয়ারিতে। তারও আগে ভূপেন জানুয়ারিতে হল লালবাগের এস-ডি-ও। ফেব্রুয়ারি মাসে আইভান আসানসোলে এস-ডি-ও পদে চলে যায়। জীতেশ তার আগে জানুয়ারিতে যায় জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ারে। ভার্নন ফেব্রুয়ারিতে বারাসতে। শীঘ্র দ্বিতীয় অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট দল এল। প্রথমে এল রঘু ব্যানার্জির ভাই দেবেন ব্যানার্জি, রয়াল এয়ার ফোর্সে ছিল। তারপর এল সুনীল মুখার্জি আর যতীন সেনগুপ্ত, দুজনেই পরীক্ষা দিয়ে আই-এ-এস পাস করে। ফৌজ থেকে ছাড়া পেয়ে অমিতাভ নিয়োগী, এ-ডি-এম হয়ে আসে অনেক পরে। সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর ভাই, নিরঞ্জন নিয়োগীর ছেলে। ভাল রাঁধতে পারতেন, রান্নায় উৎসাহ ছিল প্রচুর, এখনও নিশ্চয় আছে। আমরা ঠাট্টা করে বলতুম, অমিতাভ (ডাক নাম থেরো) এজলাসে বসে কেস করতে করতে হঠাৎ উকিলদের বললেন, এক মিনিট সবুর করুন, বাড়িতে ডাল চড়িয়ে এসেছি, ফোড়ন দিয়ে নামিয়ে আসি। এপ্রিল মাসের প্রথমে সুনীলের বিয়ে হয়। কলকাতায় বিয়ে করে এসে জঙ্গীপুরে রাজশাহীর পার্টি এলে দুজনে বহরমপুরে আসে। তার স্ত্রী সুস্মিতা এখন আমাদের অতি আদরের বৌমা। আভা তাকে বিয়ের উপহারস্বরূপ, মুর্শিদাবাদের শিল্পীর কাজকরা একটি হাতির দাঁতের পাউডার কেস দেয়। মুর্শিদাবাদে থাকার সময়ে ভূপেন অকৃতদার ছিল। পরে কলকাতায় বিবাহ হয়, মুর্শিদাবাদের চিহ্নস্বরূপ তার কনেকেও আভা হাতির দাঁতের পাউডার কেস দেয়। ১৯৪৬-৪৭-এ চন্দননগরে থাকতে যিনি শ্রীরামপুরের এস-ডি-পি-ও ছিলেন, রণজিৎ গুপ্ত, তিনি মজিদ ও মুসা যখন আসেন, তখন অকৃতদার হিসাবে একা এসেছিলেন। দ্বিতীয়বার আসেন বিয়ের পর বৌভাতের পরদিন সস্ত্রীক, বহরমপুরে কয়েকদিন মধুচন্দ্রিকা যাপনের উদ্দেশে। নতুন বৌ প্রতিদিন খুব দেরি করে উঠতেন, ফলে মধুচন্দ্রিকার বাস সার্থক হচ্ছে বলে সুনীল ও ভূপেন রণজিৎকে ঠাট্টা করত।

একদিকে এইসব চলছে, অন্যদিকে আমি জেলার আনাচে-কানাচে ঘুরে সব-কিছু স্বচক্ষে দেখার চেষ্টা করছি। মার্চ মাসের প্রথমেই জয়তীকে আমরা দার্জিলিং-লোরেটো কনভেণ্টে ভর্তি করিয়ে কলকাতায় গিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে দার্জিলিং মেলে তুলে দিয়ে আসি। আভা আর আমি একা হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে থাকার তাগিদ কমে গেল। সারা মুর্শিদাবাদময় অনেক স্বনামধন্য দেশহিতৈষী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়। বহরমপুরের বাইরে রাত কাটানোর সময়ে দীনজনদের সঙ্গে পরিচয় হত, বগড়ী ও রাঢ় অঞ্চলের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ করতুম। বগড়ী ছিল ভাগীরথীর পূর্বের, বিশেষ করে জলঙ্গী অঞ্চলের, এঁটেল মাটির নিচু দেশ। রাঢ় ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমে লাল কাঁকরমাটির ও পাথরের মালভূমি দেশ। বহরমপুর শহর ছিল কিছুটা কৃষ্ণনগর ও শ্রীরামপুরের মত প্রক্ষিপ্ত বরেন্দ্রভূম। মালদার মত অত জাতিবৈচিত্র্য ছিল না। জঙ্গীপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানায়, লালবাগের নবগ্রাম থানায় ছিল সাঁওতাল ও ধাঙড়দের দেশ। সমশেরগঞ্জ ও স্থতী থানা ছিল শেরশাবাদিয়াদের দেশ। তাদের কথায় এত ছন্দোময় টান থাকত, মনে হত যেন গান শুনছি। জঙ্গীপুরে ছেলেবেলা কাটান'র দরুণ আমার বাবা শেরশাবাদিয়াদের টান খুব ভাল নকল করতে পারতেন। ওড়িয়া, নেপালী, সাঁওতালি ভাষাও খুব ভাল বলতেন।

বহরমপুরের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ

আমার সময়ে মুর্শিদাবাদে তিনজন কিংবদন্তী পুরুষ জীবিত ছিলেন। প্রথম শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত। তিনি 'জঙ্গীপুর সংবাদ' নামে একটি উৎকৃষ্ট ছোট সাপ্তাহিকী প্রতিষ্ঠা করে আজীবন সম্পাদনা করেন। জীবনযাপনে ও চিন্তায় তিনি সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আদর্শ বলে মানতেন, যেমন বিনয়ী, তেমনি শিক্ষিত, সজ্জন, নির্ভীক। কথার টানে ইচ্ছা করে জঙ্গিপুরী শেরশাবাদিয়া-ঘেঁষা টান রাখতেন, যদিও তিনি যে-কোন বিদ্বৎসমাজে সাদরে গৃহীত হতেন। তাঁর সাহিত্যিক আদর্শ ছিল ভারতচন্দ্র রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। রচনায় দুটি ক্ষুরধার তরোয়াল ছিল: অনুপ্রাস আর একই কথার একাধিক মানে নিয়ে চাতুরি করা। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন শেখ গোমানী কবিয়াল। ১৯৪৫ সালে মহম্মদ আলি পার্কের সাংস্কৃতিক উৎসবের কথা লিখতে গিয়ে আগের খণ্ডে তাঁর উল্লেখ করেছি। তাঁর ব্যক্তিগত উপহার হিসাবে আমি এখনও তাঁর একটি গানের খাতা সগর্বে আমার সংগ্রহে

রেখেছি। তৃতীয় জীবিত প্রতিষ্ঠান ছিলেন, এবং আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এখনও জীবিত এবং আমাকে প্রতি ঈদে ও বিজয়ায় নিজের হাতে শুভকামনা জানিয়ে চিঠি লেখেন—প্রজ্ঞা, সততা, চরিত্রবত্তা ও মানবধর্মের প্রতীক—তিনি ডাঃ রেজাউল করিম। আমার সময়ে দুই সমান প্রতিভাবান ভাই বহরমপুরে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত বিরাজ করতেন। তার মধ্যে একজনের সঙ্গে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাসগৃহে ১৯৮৯ সালে দেখা করে হাসি-গল্প করে আসি, তখন তাঁর বয়স সাতাশি। নাম শশাঙ্কশেখর সান্যাল। ভাইয়ের নাম নলিনাক্ষ সান্যাল। দুজনেই ছিলেন যেমন মজলিশি, তেমনি খাদ্যরসিক, তেমনি ঘুঁষোঘুঁষি অর্থাৎ বক্সিং-এ অদ্বিতীয়। নলিনাক্ষ সান্যাল ছিলেন আইন ও বিধানসভাগুলির উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর সম্বন্ধে আমার আত্মজীবনীর এই খণ্ডের প্রথম পর্বে একটি গল্প লিখেছি, এখানে উল্লেখ আশাকরি পাঠক মাপ করবেন। আমার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট সুশীল দের একটি সুন্দর ও মজার গল্প আছে। দুজনেই ১৯৩০ সালে একত্রে একবাড়িতে লণ্ডনে থাকতেন। একদিন বিখ্যাত দার্শনিক সরোজকুমার দাশ ও তাঁর পত্নী বিখ্যাত শিক্ষয়িত্রী—পরে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল—তটিনী দাশের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। চারজন বসার ঘরে গল্প করছেন আর থেকে থেকে তাঁদের ছয় বছরের ছেলে বোঁ-করে ঘরে ঢুকে একবার দে, আবার সান্যালের পশ্চাদ্দেশে একটি করে রামচিমটি কেটে পালায়। যখন ছেলেটি ছ'বারের বার এইরকম করতে এসেছে, এবং স্বামী-স্ত্রী দুজনে এত দার্শনিক আলোচনায় মগ্ন যে একবারও এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন না, তখন সান্যাল ঠিক করলেন আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। ছেলেটি সান্যালের পাছায় আবার চিমটি কাটতে যাবে, তার আগেই তিনি 'উঃ' করে চেঁচিয়ে উঠলেন। তখনকার শিক্ষানীতি অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা দেয়াই ছিল নিয়ম। বাবা-মা জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? সান্যাল করুণ স্বরে বললেন, রামচিমটি কাটছে। বাবা-মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন সত্যি কিনা। ছেলে বলল, হাঁ। বাবা-মা বললেন, এবার থামলে হয় না? ছেলে বলল, না। 'কবার কাটবে?' 'একবার কাটব।' মা বললেন, ঠিক আছে, কিন্তু মাত্র একবার। দে ও সান্যালকে আরেকবার বলির পশুর মত কোপ সহ্য করতে হল। ছেলেটি আর এল না। চল্লিশের দশকে ছেলেটিকে মেডিকাল কলেজ থেকে দুষ্কৃতির দায়ে বার করে দেয়া হয়।

এ পর্যন্ত যা লিখেছি, বলা বাহুল্য, কংগ্রেস একটু দূরত্ব রাখতেন। কম্যুনিস্ট পার্টি তখনও নিষিদ্ধ। বহরমপুর জেলে অনেক সি-পি-আই রাজনৈতিক বন্দী হয়ে

আছেন। তাঁদের কয়েকজন ছিলেন আমার পরিচিত। একজন বিশেষ বন্ধু, কৃষ্ণনগরের দেবীভূষণ ভট্টাচার্য। অন্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে উদীয়মান নেতা ছিলেন ত্রিদিবকুমার চৌধুরী, পরে গোয়া উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন, এবং কেন্দ্রীয় সংসদে এখনও বিশেষ সম্মানের ব্যক্তি। অন্য রাজনৈতিক দলের সভ্যদের তেমন জানতুম না। সাক্ষাৎপ্রার্থীর অভাব ছিল না। মুসলমান সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল, কিন্তু মালদায় যত মুসলমান দেখা করতে আসতেন তার অর্ধেকও আসতেন না। উপরন্তু, মালদার বাসিন্দাদের মত তাঁরা সোজাসুজি কথা বলতেন না। বরং একটু প্যাঁচালো ছিলেন। তবে কালিয়াচকের রেশম চাষী ও শিল্পীদের থেকে মুর্শিদাবাদের রানীনগর, চক ইসলামপুর, ডাঙ্গাপাড়া, গণকর, মির্জাপুরের চাষী ও রেশম শিল্পীরা অনেক বেশী উদ্যোগী ছিলেন। কালিয়াচকে রেশম তাঁতীর থেকে রেশম চাষীই বেশী ছিলেন। মুর্শিদাবাদে ছিলেন ঠিক উল্টো। মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ীরা সারাভারতের বাজার সম্বন্ধে খবর রাখতেন, পৃথিবীর অন্যত্র, রেশমের চাহিদা ও বাজার দর ইত্যাদি বিষয়েও খবর রাখতেন।

১৯৪৮ সালের নতুন শিল্পনীতি প্রস্তাবের সুযোগ নিয়ে কাশিমবাজারের মহারাজা তাঁর কারখানাটি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টায় বিশেষ সফল হননি। বেলডাঙ্গায় অনেক বছর আগে চমৎকার বড় একটি চিনির কল তৈরি হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে সেটি বন্ধ হয়। অনেক চেষ্টা করে ১৯৪৯-এর অক্টোবরে আবার খোলার সম্ভাবনা হয় কিন্তু পুনরুত্থানের আগেই সেটি আবার নিদ্রামগ্ন হয়। একমাত্র রেশম শিল্প, খাগড়াই কাঁসা, হাতির দাঁতের ও সোনারুপোর কাজেই মুর্শিদাবাদের খ্যাতি তখন বজায় ছিল। তার মধ্যে নবাবদের আমলের সোনাপট্টি ও সৈদাবাদের বিখ্যাত সোনারুপো-কারিগর-বংশের অনেকে ইতিমধ্যেই বাস ও পেশা উঠিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছেন। ১৯৬২ সালে নতুন দিল্লীর পৃথ্বীরাজ রোডস্থিত কাশ্মীর সরকারের এম্পোরিয়ামে একজন দক্ষ স্যাকরার সঙ্গে দেখা হয়, তাঁর দেশ ছিল সৈদাবাদে। তিনি বলেন তাঁর অনেক পরিচিত স্যাকরা তখন বম্বেতে পাট উঠিয়ে নিয়ে গেছেন।

মুর্শিদাবাদের গর্ব ছিল তার পাণ্ডিত্যের ঐতিহ্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। মুর্শিদাবাদ রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমের মিলনস্থল, অতএব এই দুই ভূমির সংযোগের বিকাশ ক্ষেত্র। উপরন্তু উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের হিন্দু ও মুসলমান ধনী ও কৃতী পরিবারদের ঐতিহাসিক বাসভূমি। উনিশ থেকে বিশশতকের মাঝামাঝি

পর্যন্ত বাংলার চিন্তাক্ষেত্রে যত কিছু স্ফুরণ ও আন্দোলন হয়েছে তার প্রশস্ত লীলাক্ষেত্র। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ কলেজের ইতিহাস প্রাচীনত্বে ও উৎকর্ষে কলকাতার হিন্দু কলেজের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে। প্রতি মহকুমা শহরে, অন্যান্য শহরে ও গণ্ডগ্রামেও গর্ব করার মত ভাল ভাল স্কুল ছিল। প্রায় সবগুলিই স্থানীয় স্বনামধন্য জমিদারদের দান, শিক্ষা, নানাবিধ চারুকলা ও শিল্পে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস গর্ব করার মত। ১৯৪৯ সালেও আমি অন্তত দুই ডজন গর্ব করার মত উৎকৃষ্ট পারিবারিক লাইব্রেরির নাম করতে পারি যার সঙ্গে ঐ গোত্রের যে-কোন দেশী বিলাতি লাইব্রেরির তুলনা চলে। সামান্য কয়েকটি নাম বলি : নবাববাড়ির হাজারদুয়ারি লাইব্রেরি, লালগোলা, কাশিমবাজার, জেমো, কাঁদি, পাঁচথুপি, নিমতিতা ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদের সরকারি কালেক্টরেট লাইব্রেরিটি গোপন ও সংরক্ষিত বই, নথিপত্র ও চিঠিপত্রের জন্য এখনও বিখ্যাত। সুপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত রামদাস সেন, যিনি নিতান্ত অল্পবয়সে মারা যান, এবং যাঁর খ্যাতি ইওরোপেও ব্যাপ্ত হয়, তাঁর সংগ্রহ ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি সমৃদ্ধ। তাঁর সংগ্রহের অধিকাংশই জাতীয় পাঠাগারে দান করা হয়। অনুরূপ লাইব্রেরি ছিল জিয়াগঞ্জের নেহালিয়া পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ সিংহের; তিনি অনেক লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর বাড়িতে চৈতন্যদেবের একটি পট ছিল, সমসাময়িক আঁকা বলে তার খ্যাতি আছে। কৃষ্ণনাথ কলেজের লাইব্রেরিও বিশেষ সমৃদ্ধ ও প্রাচীন ছিল। জেমোর আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির যে অবশিষ্ট আমি দেখি তাও অতুলনীয়। নিমতিতার জমিদার চৌধুরী বংশের নানা-বিষয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরিও উল্লেখযোগ্য। নিমতিতার বাড়িটি ছিল প্রাসাদোপম। দোতলার যে-কোন বিন্দু থেকে পদ্মার দিগন্তে বিলীয়মান বাঁক দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। সেই বাড়িটির এবং পদ্মার বালি ও নদীর শ্বাসরোধকারী সৌন্দর্য পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' ছবিতে।

আরো সব সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ছিল, যেমন নবাববাহাদুরের ইন্স্টিটিউশনে ও নশীপুর রাজবাড়িতে। ১৯৪৯ সালেও হাজারদুয়ারি প্রাসাদে চিত্রাদি ও অন্যান্য বহুমূল্য সামগ্রী ও গৃহালঙ্কারাদির যে সংগ্রহ ছিল তা প্রায় হায়দ্রাবাদের সালারজঙ সংগ্রহের সঙ্গে তুলনা করা যেত। ১৯৮৫ সালেও তার কিছু অবশিষ্ট দেখেছি।

মহার্ঘ্য সামগ্রী, গহনা, হীরে-জহরত, ভাল পুরনো আসবাব, গৃহসজ্জা ও অলঙ্কার, বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখার তোরঙ্গ ও আলমারি; বিশেষ করে জড়োয়া

গহনা, আমি মুর্শিদাবাদে এত ভাল দেখেছি, অন্যত্র তত দেখিনি। এখানে মাত্র কয়েকটি পারিবারিক সংগ্রহের উল্লেখ করব : আজিমগঞ্জ রাজ, নওলাখা ; দুগার, নাহার, সিংহী, নেহালিয়া। সকলেরই নিবাস ছিল আজিমগঞ্জে ও জিয়াগঞ্জে। নওলাখা পরিবারে আমি যে নির্মল, টলটলে সমুদ্রের মত সবুজ, সুবৃহৎ পান্না দেখেছি এবং অনুরূপ পায়রার রক্তের মত ঘোর লাল অথচ টলটলে স্বচ্ছ নিখুঁত প্রকাণ্ড চুনী দেখেছি তার তুলনা হয় না, চোখ ফেরানো যায় না। জহরতগুলির গভীরত্ব, বর্ণের শুদ্ধতা, অপূর্ব নয়নাভিরাম টলটলে স্নিগ্ধ দ্যুতি দেখে পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম তৈলচিত্রের পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। এইসব জহরত দেখে অমর শিল্পী রেমব্রাণ্ট নিশ্চয় উৎফুল্ল হতেন।

১৯৪৯ সালেও মুর্শিদাবাদ নবাবদের ধনদৌলত ও অনবদ্য রুচির সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হল। বহুদিন ধরে বংশপরম্পরায় তাঁরা রুচির সাধনা করেন, এই সাধনায় ফাঁকি ছিল না। আমার সময়ে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা নিশ্চয় সমুদ্রে গোষ্পদ মাত্রের মত শোভা পাচ্ছিল। মুর্শিদাবাদে থাকার কল্যাণে ক্লাইভের উক্তির যথার্থতার তারিফ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। ১৭৭৩ সালে পার্লামেণ্টে হাউস অভ লর্ডসে জেরার সময়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় তিনি নবাবের তোষাখানা থেকে কতখানি আত্মসাৎ করেছেন। উত্তরে ক্লাইভ বললেন, 'সভাপতি মহাশয়, ঈশ্বরের নামে এই মুহূর্তে এই শুধু বলতে পারি, আমার আত্মসংযমের কথা যখন ভাবি তখন আমি নিজেই স্তম্ভিত হয়ে যাই।'

মুন্সিগঞ্জ, কার্সিয়ঙ বা মালদায় দীনদরিদ্রতমদের মনে ও জীবনে যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছি, তার তুল্যমূল্য জাগতিক ও মানসিক ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছি মুর্শিদাবাদে। কলকাতা থেকে বহরমপুরের আয়তন ও জনসংখ্যা অনেক কম, অথচ বেশী সংহত হওয়ায়, আমার মনে হত অল্প পরিসরে, কলকাতা থেকে বহরমপুরের ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য, ঋদ্ধি ও সংস্কৃতিমণ্ডিত মনীষীদের সংখ্যা হাজার পিছু জনসংখ্যা হারে অনেক বেশী ছিল। এখনও তার প্রমাণ পাই, মুর্শিদাবাদ তথা বহরমপুরের সন্তান বা সে শহরে লালিত লেখক লেখিকার রচনায়। মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা মহানগরী বহরমপুর থেকে অনেক সুসভ্য, শিক্ষিত, মেধাবী লোক নিত্য আমদানি করে নিজেকে সমৃদ্ধ করত।

মার্জিত রুচি ও সভ্যব্যবহারের দু'একটি উদাহরণ দিই। আমার সময়ে, সরকারি উকিল শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়ের বয়স ছিল অনুমান সত্তর। অত্যন্ত

সুপুরুষ ছিলেন, বাংলায় যাকে বলে পাকা আমটি। বহরমপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সভাপতি ছিলেন, এবং অন্যান্য অনেক জনহিতকর সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বহরমপুর গার্ল্‌স্‌ কলেজের সেক্রেটারিও ছিলেন। যে-কোন সভায় ঘরে তাঁর পদার্পণ মুহূর্ত দেখে ঘড়ি মেলানো যেত। একদিন গার্ল্‌স্‌ কলেজের মিটিং হবে, এগারোটায় শুরু হবার কথা, এগারোটা পাঁচ হয়ে, দশ হতে চলল, এমন সময়ে নীরবে সলজ্জমুখে অম্বিকাবাবু ঘরে ঢুকে বিলম্বের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করে, অথচ কারণ না দেখিয়ে, যথারীতি মিটিং-এর কাজে ডুবে গেলেন। তাঁর মুখে ও ব্যবহার দেখে, এমন-কি কথা বলার স্বাভাবিকতা দেখে, কেউ বুঝতেও পারল না, বিলম্বের কারণ কী হতে পারে। সভাশেষে একজন ভদ্রলোক এসে আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, সেদিন ভোররাত্রে অম্বিকা-বাবুর আজীবনসঙ্গিনী দেহত্যাগ করেছেন। তাঁকে দাহের জন্য সাজিয়ে শ্মশানে রওনা করে দিতে যা একটু দেরি হয়েছে।

আরেকটি ঘটনা বলি। ডাঃ বামনদাস মুখার্জি ছিলেন সালার থানা নিবাসী। ১৯৪৬ সালের ভীষণ দাঙ্গায় এক মুসলমান বালকের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে তাঁর জামাই, যিনি জজিয়তি করতেন, প্রাণ হারান। বামনদাসবাবুর স্ত্রী ও তাঁর বিধবা কন্যা বামনদাসবাবুর গ্রামে জামাইয়ের স্মৃতিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনা করবেন। উদ্বোধনের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। আভাকে আমি বিনা নিমন্ত্রণে নিয়ে যাই। গ্রামের যে-প্রান্তে আমি প্রবেশ করব সেই প্রান্তে অর্থাৎ বাড়ি বা নতুন স্কুলঘর থেকে অনেক দূরে বৃদ্ধ বামনদাসবাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে অভ্যর্থনা করবেন। অনাহূত আভাকে দেখে স্বামী-স্ত্রী দুজনে বেজায় খুশি। প্রথমে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বসালেন। উৎসবশেষে বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের ডাক পড়ল। তার আগে উৎসবশেষে জলখাবার। আগে থেকে আমার চাপরাসি মৌলাবক্সের কাছে বামনদাসবাবু জেনেছেন আমি ভাজামাছের ভীষণ ভক্ত। চায়ের সঙ্গে এল নানারকমের মাছভাজা, বামনদাসবাবুর স্ত্রী স্বহস্তে ভেজেছেন। দ্বিপ্রহরের খাওয়া যেমন সাদাসিধে, ঘরোয়া, তেমনি ভাল করে রাঁধা। বিদায়কালে বামনদাসবাবুর স্ত্রী আভাকে তাঁর ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে হাতে একটি তাঁতের শাড়ি দিলেন। আমার বাবার আদেশানুসারে, আভা উপহারের শাড়ি নিতে কোনমতে রাজি নয়। বামনদাস-বাবুর স্ত্রী কাতর কণ্ঠে বললেন, শাড়িটির দাম তিনটাকা ছ'আনা। বামনদাসবাবু শেষে বললেন, সরকার যদি আপত্তি করে তাহলে ফেরৎ দেবেন। কমিশনার জে-

এন তালুকদারকে উপহারের কথা জানালে তিনি অনুমতি দিলেন। বামনদাস-বাবু তখনকার দিনে তাঁর পেশার কল্যাণে লক্ষপতি। অনায়াসেই তাঁর স্ত্রী আভাকে একটি দামি উপহার দিয়ে বিব্রত করতে পারতেন। কিন্তু তা নয়, সামাজিক আচারটুকু বজায় থাকে অথচ লোকে অনর্থক বিব্রত না হয়, এই হল সভ্যতা।

এই ধরনের সৌজন্য ও ভদ্রতা আমি জেমোর ত্রিবেদীবাটিতে পেয়েছি। সমাজের সবথেকে নিম্নস্তরে সমান আতিথেয়তার একটি গল্পও এখানে না বললে হয় না।

অভ্যাসমত ডোমকল থানায় তাঁবু ফেলে চারিদিকের গ্রাম ঘুরছি। ভোরবেলা জীপে রওনা হতুম, সঙ্গে থাকত জীপ চালক, চাপরাশি ওলাম, আভা। জয়ন্তী তখন দার্জিলিং-এ স্কুলে। দুপুরে কোন গাছতলায় গাড়ি থামিয়ে পাঁচজনে সঙ্গের খাবার খেয়ে আবার দু-তিন ঘণ্টা ঘুরে বিকালে তাঁবুতে ফিরতুম। একদিন সকালে এক গ্রামের রাস্তা দিয়ে জীপ চালিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ এক বাড়ির কলাগাছের ঝাড়ের মোড়ে খুব ভাল গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ পেলুম। গাড়ি থামিয়ে ভিটার ঢিবিটা চড়ে বাড়ির উঠোনে ঢোকার জন্য জীপ থেকে নামলুম। আমার পরণে আমেরিকান আর্মির ডিসপোজালের খাকি জার্কিন, মাথায় কালো বেরে টুপি। দেখেই পুলিশ ভেবে দুপদাপ শব্দে বাড়ির মেয়েরা ভিতর দিকে দৌড়। এক প্রৌঢ়া মহিলা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলেন। এ অবস্থায় আমার অব্যর্থ ওষুধের আশ্রয় নিলুম, বললুম বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দেবেন? যেই-না বলা মহিলা হাঁকডাক করে বাড়ির বৌদের ডেকে পাঁচটি কাঁসার বাটিভর্তি মুড়ি, গাওয়া ঘি দিয়ে মেখে, পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ধরে দিলেন। ধানি লঙ্কা এত ঝাল, খেয়ে আমি অস্থির। মহিলা আবার ভিতরে ছুটে মাটির সরায় পাতা একবাটি টক দৈ এনে পুকুরের ঝিনুক দিয়ে দৈ তুলে আমাকে বললেন, জিভের উপরে রেখে দিন। আমার দেখাদেখি সকলেই এক ঝিনুক করে দৈ মুখে পুরল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জিভের জ্বালা চলে গেল। মহিলা বললেন, কাঁচা লঙ্কার ঝাল মেটাতে টক দৈ-এর মত কিছু নেই। এরপর সুখদুঃখের অনেক গল্প হল। এই হল মুর্শিদাবাদের নিচের তলার মানুষের ভব্যতা-সভ্যতা।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ রান্নার উৎকর্ষ ও সুরুচির কথাও একটু বলি। একদিকে ছিল প্রসিদ্ধ রাঢ়ের রান্না, তার একদিকে সাধারণ ঘরের অমৃত-সমান ঢেঁকিছাটা চাল, কলাইয়ের ডাল, আলুপোস্তর চচ্চড়ি আর কাঁচা

তেঁতুলের পাৎলা তিরতিরে অম্বল, অন্যদিকে নানারকম নিরামিষ তরকারি। প্রতিটি তরকারির সব্জি ভিন্নভাবে কাটা। তারই বা কী বাহার! বড় ঘরের বাড়িতে, যেমন ডাঃ বামনদাস মুখার্জির বাড়িতে, নারকোলকোরা দিয়ে মুগের ডাল, দু'তিন রকমের মাছের ঝাল ও ঝোল, অম্বল, চাটনি, দৈ, সন্দেশ। অন্যদিকে রানীনগরের বর্ধিষ্ণু-মুসলমান পরিবারে খেয়েছি বিরিয়ানি, রায়তা, কয়েক রকমের কাবাব, দু'তিন ধরনের মাংস, শেষ পাতে ফিরনি। অপূর্ব রান্না, গৃহকর্তা হাজারদুয়ারি থেকে নবাবজাদার বাবুর্চিকে ধরে এনে রাঁধিয়েছিলেন। সবথেকে বাহার ছিল আমের সময়ে আমের। যেমন স্বাদ, তেমনি বৈচিত্র্য। বছরে একবার সন্ধ্যায় শ্রীপৎসিং দুগার তাঁর বাড়িতে পরিচিত বন্ধুদের আম খেতে নিমন্ত্রণ করতেন। একের পর এক পঞ্চাশ-ষাট রকমের সেরা আম পরিবেশন করতেন, যা নাকি পাটনা, দীঘা, এলাহাবাদ, বেনারস, বা লক্ষ্ণৌকেও হার মানাত। ১৯৮৮ সালে নবাবজাদা কাজেম আলি মির্জা মারা যান। কৃষ্ণনগরে ১৯৪১ সালে এস-কে দের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। তাঁর নিজস্ব আমের বাগান ছিল। লালবাগে থাকতেন কম, কিন্তু বছরে অন্তত একবার আমের মরশুমে আসতেন। তাঁর বাগানের বিশেষত্ব ছিল একজাতের আম— নাম মোলাম জাম। যা আর কারোর বাগানে ছিল না। সুবিখ্যাত কোহিতুর আমও একাধিক বাগানে হত। ১৯৪৯-এর একদিন তিনি আমাকে বললেন আমি যদি অমুকদিন সন্ধ্যায় হাজারদুয়ারিতে গিয়ে তাঁর কাছে অন্তত ছত্রিশ ঘণ্টা থাকি। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে কি যাদু আছে?' বললেন, 'আমার বাগানের মোলাম জাম যে মুহূর্তে পাকবে সেই মুহূর্তে খেতে হবে। পাকবার দু'তিন দিন আগে থেকে বাগানের মালি গাছের তলায় পাহারা শুরু করে, কিন্তু ঠিক কোন্ মুহূর্তে পাকবে আগে থেকে বলতে পারে না। হয়তো রাত দুটোর সময়ে পাকবে, তখন মালি ছুটে এসে খবর দেবে, উঠে খেতে হবে। ঠিক তখন না গেলে আমের মজাই নষ্ট হবে।' শুনে আমি তো হেসে ফেটে পড়লুম, এইভাবে আম খেতে হবে নাকি, নবাবীর শেষ নেই!

মুর্শিদাবাদেরই একান্ত বিশেষত্ব এমন অনেক মিষ্টি ছিল। সবথেকে প্রসিদ্ধ ছিল অতিকায় সাইজের ছানাবড়া। লাটসাহেব কে-এন কাটজু আমার সময়ে, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে, যখন বহরমপুর আসেন তখন স্থানীয় নাগরিক সমিতি তাঁর সম্মানে ত্রিশ সের ওজনের একটি ছানাবড়া করিয়ে তাঁকে আপ্যায়িত করেন। এই ধরনের ছানাবড়া তৈরির জন্য বিশেষ আকারের কড়াই হত। ছানাবড়ায়

ছালটি শক্ত ও লালরঙ করার জন্য হাতা খুন্তি দিয়ে খুব সাবধানে চারদিকে বারবার কড়াই থেকে ফুটন্ত রস তুলে লাগাতে হত। সংবর্ধনার প্রতিদানে ডাঃ কাটজু খুব ভাল চায়ের ব্যবস্থা করেন। শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় ও শ্রীঅনুত্তম সেন ব্যবস্থা করতে আমাকে সাহায্য করেন। স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গভর্নর চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বহরমপুরে যে-পার্টি দেন তাতে কাছারির চায়ের দোকান থেকে অ্যালুমিনিয়ম কেটলিতে দুধচিনি মিশিয়ে চা তৈরি করে, কেটলির মুখে কাগজের ছিপি সেঁটে নিয়ে এসে কাপে কাপে ঢেলে দিয়েছিল। তাজোর মিরাশদারের সুবিখ্যাত কৃচ্ছ্রসাধনের প্রমাণ তিনি এইভাবে দেন। অনেক বছর পরে, ষাটের দশকে নিউ ইয়র্কে গিয়ে ওঁর সম্পর্কে একটি মজার গল্প শুনি। নিউ ইয়র্কে ভারতীয় বিদ্যাভবনের শাখা উদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে রাজা-গোপালাচারী উপস্থিত হন। উদ্বোধনের পর প্রেস কনফারেন্সে জনৈক আমেরিকান সাংবাদিক রাজাজীকে প্রশ্ন করেন, হলিউডে তাঁর সম্মানে একটি স্টুডিও খোলা হয়েছে, এই সংবাদটি কি সত্যি? রাজাজী বিস্মিত হয়ে বলেন, 'আমি তো কিছুই জানি না।' সাংবাদিকটি মুখে কোন বিকার না দেখিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি আপনার স্মরণে স্টুডিওটির নামকরণ হয়েছে "টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স"!' রাজাজী সুদ্ধ সারা সভা হাসিতে ফেটে পড়ল।

মুর্শিদাবাদের পর আমি যে জেলাতে শেষবারের মত ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হই, সেটি বর্ধমান, ১৯৫৫ সালে। ১৯৪৯ সালে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কলকাতায় চাকরি করতে যাই। ১৯৫৪-এর ডিসেম্বরে যখন বর্ধমান যাই, তার মধ্যে ডাঃ বি-সি রায় সারা রাজ্যে ডাক্তারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করেন। সেই পাঁচ বছরে আগেকার কালের এল-এম-এফ, এল-এম-এস চিকিৎসকরা প্রায় বিলুপ্তির পথে। তাঁদের স্থানে এল, সালফা ও পেনিসিলিন, পরে অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্য স্বত্বাধিকার ওষুধ। জনস্বাস্থ্যের জন্য মুখ্যত থাকত জেলা বোর্ডের অধীনে স্যানিটারি ইন্‌স্পেকটর; তাদের থাকত মধ্যমানের জনস্বাস্থ্য ডিপ্লোমা, তাদের দিনও হল প্রায় গত। হাতের কাছে পরিসংখ্যানগুলি নেই। কিন্তু আমার মনে আছে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আমি যখন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রোটিন অ্যাডভাইজরি গ্রুপের সদস্য ছিলুম, এবং ভারতের নিউট্রিশন সোসাইটির সভাপতি ছিলুম তখন আমি ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৭৬-৭৭ সালের একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক তুলনামূলক সমালোচনা লিখি। বিষয় ছিল এই দুই তারিখে

প্রতি হাজার নাগরিক পিছু কত ডাক্তার ও জনস্বাস্থ্য কর্মী ছিল, এবং হাসপাতালের সুখ-সুবিধা ছিল। হিসাবে দেখা গেল হাজার করা গ্রাম্য নাগরিক পিছু ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী ১৯৪৮-৪৯ সালে বেশী ছিল। তার কারণ ১৯৪৮-৪৯ সালে এল-এম-এফ, এল-এম-এস ডাক্তার, পাস করা ওষুধ তৈরির কম্পাউণ্ডার (যাঁরা নিজেরাও ঔষধপত্রের বিধিব্যবস্থা করতেন), অভিজ্ঞ জনস্বাস্থ্য কর্মী, প্রতি স্তরে স্তরে পরিদর্শন ও তদারকের ব্যবস্থা ছিল। প্রায় সকলেই স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন, সুতরাং তাঁদের কাজের জবাবদিহি করতে হত। তাঁদের যজমানরাও তাঁদের দেখাশোনা করতেন, ফলে কর্তব্যে অবহেলা সম্ভব হত না। ১৯৭৬ সালে আমি যখন প্রতিবেদন লিখি তখন অধিকাংশ স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসক স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন না, সরকারি কাজে দূর দেশ থেকে আগত; স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে অপরিচিত, পরদেশী; নাড়ির যোগসূত্রহীন, স্বভাবতই যজমানি-বাধ্যবাধকতা প্রায় শূন্য। বিবেক ও কর্তব্যবোধের স্থলে এসেছে অনীহা, অবহেলা, কর্তব্যচ্যুতি। অথচ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার উদ্দেশে করদাতার কর দিতে হত প্রাণান্ত।

অন্যান্য ঘটনা

১৯৪৯ সালে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ডাঃ রায় আমাকে আমার 'গুণ্ডা অফিসার'দের উদ্দেশে যে সময়ে ভর্ৎসনা করেন প্রায় সে সময়ে অর্থাৎ ১৮ জানুয়ারি শিয়ালদায় বাস্তুহারাদের ধ্বংসাত্মক কাজের ছুতোয় পুলিশ গুলি চালায়। পরের দিন কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী রাইটার্স বিল্ডিংসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। পুলিশ তাদের উপরও গুলি চালায়, চারজনের মৃত্যু হয়, পনেরো জন আহত হয়। কলকাতাময় রাস্তায় রাস্তায় ধ্বংসাত্মক বিক্ষোভ হয়; ট্রাম-বাস পোড়ে। বারোদিন পরে কলকাতায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। ডাকবিভাগের অল ইণ্ডিয়া ডাকপিওন ও নিম্নতর শ্রমিকদের কাউন্সিল, তাদের ২০ জানুয়ারির বৈঠকে ৯ মার্চ ভারতময় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। রেলওয়ে ইউনিয়নও এই দিনেই ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৪৯-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি একটি ঘটনায় সারা বাংলা ভীষণভাবে চমকে ওঠে। বদ্ধপরিকর একটি দল কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে দমদম বিমানঘাঁটি, জেসপ কারখানা, যশোহর রোডের অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা একসঙ্গে আক্রমণ

করে। জেসপ ফ্যাক্টরির দাউ দাউ করে জলন্ত বিরাট চুল্লিতে তিনজন বিদেশীকে ধরে আস্ত ছুঁড়ে ফেলে চুল্লির দরজা বন্ধ করে দেয়। বিমানবন্দরে তিনজন লোক খুন হয়। রিভলভার ডাকাতি হয়, একটি বিমানে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ৪ মার্চ বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেন আর-সি-পি-আই দলই এই ধ্বংসাত্মক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সি-পি-আইও সহসা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালায়।

বহরমপুর সেণ্ট্রাল জেল

১৯৪৮ সালের মার্চে সি-পি-আই নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর, সি-পি-আইয়ের বহু সভ্যকে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলে রাজবন্দী হিসাবে রাখা হয়। ১৯৪৯-এর এপ্রিল মাসে কয়েকজন রাজবন্দীকে বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়। বহরমপুর জেলের ভিতরে যে-সব ঘটনা হয়, আমার কৃষ্ণনগরের বন্ধু দেবীভূষণ ভট্টাচার্যের কাছে পরে শুনি। তিনি তখন বহরমপুর জেলে রাজবন্দী ছিলেন। বিনা বিচারে আর-সি-পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সাতজন, এবং তাঁদের সঙ্গে আর-আই-এন বিদ্রোহে শাস্তিপ্রাপ্ত একজন, তাদের সঙ্গে সতেরো জন সি-পি-আই সভ্যকে এপ্রিল মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁরা মাস ছয়েক আটক ছিলেন। সি-পি-আই সভ্যরা অধিকাংশই ছাত্র আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়, তার মধ্যে দেবী ছিল। দেবী এপ্রিল মাসে বহরমপুর জেলে আসে এবং অগাস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকে। বহরমপুরের রাজবন্দীরা যখন অনশন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেয় সে-সময়ে দেবীর মা বহরমপুরে দু'বার এসে আমার বাড়িতে উঠে দেবীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। জেলে অনশন ধর্মঘটের নবম দিনে দেবী ছাড়া পেয়ে কৃষ্ণনগরে অগাস্টের শেষে ফিরে যায়।

রাজনৈতিক বন্দী আর সরকারের মধ্যে দুটি বিষয়ে বিরোধ বাধে। প্রথম, রাজবন্দীরা নিজেদের জন্যে আরো সুব্যবস্থা ও সুবিধা চেয়ে দাবি করেন তাঁদের বন্দীশ্রেণী উঁচু করা হোক। দ্বিতীয়, তাঁরা বক্সাদুয়ার বন্দীশিবিরে স্থানান্তরকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। বক্সাদুয়ার বন্দীশিবিরে ইতিমধ্যে আমার পরিচিত চিন্মোহন সেহানবিশ ও আরো কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছিল। প্রথম দাবিগুলির মধ্যে ছিল (১) তাঁরা নিজেদের আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেরাই করবেন, সে-বিষয়ে তাঁরা তাঁদের মনোমত চাল, ডাল, তৈজসপত্র, মশলাপাতি

কেনার স্বাধীনতা থাকবে; (২) পরনের জামাকাপড় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রীর জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতা বরাদ্দ করতে হবে; (৩) জেলের ঘরের তালাচাবি সন্ধ্যা ৬টার বদলে রাত্রি ৮টায় দেবার ব্যবস্থা করতে হবে; (৪) স্নান-পায়খানা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে; (৫) মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট সাহিত্য কেনার স্বাধীনতা দিতে হবে; (৬) জেলের এক-একটি কুঠুরিতে চারজনের বেশী বন্দী রাখা চলবে না; (৭) পরিবার পোষণের ভাতা দিতে হবে।

পর পর দুবার অনশন ধর্মঘট হয়। প্রথমবার এপ্রিলে, দ্বিতীয়বার অগাস্টে। প্রথমবারের তেরো দিন ব্যাপী অনশন ধর্মঘট বহরমপুর বাদে অন্যান্য জেলে হয়। প্রথমবারের অনশনে আলিপুর জেলে দুজন রাজবন্দী প্রাণ হারানোর পর সরকার রাজবন্দীদের অধিকাংশ দাবি-দাওয়া মেনে নেয়। বহরমপুরে অগাস্ট মাসে যে অনশন ধর্মঘট শুরু হয়, তার কথা সংক্ষেপে বলি। এই অনশন ধর্মঘট, আগেই বলেছি, শুরু হয় সেখানকার রাজবন্দীদের বক্সায় বদলি করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর এই সংকল্পের বিরুদ্ধে।

অনশন ধর্মঘটের নবম দিনে, জেল কর্তৃপক্ষের জরুরী অনুরোধে আমি জেলে যাই। গিয়ে দেখি 'আর-আই-এন' বিদ্রোহে শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দী, ভোম্বল দত্ত'র অবস্থা বেশ গুরুতর। কিন্তু তাঁর অবস্থা আমাকে যত না ব্যস্ত করে তার থেকে অনেক বেশী ব্যস্ত করে আমার বন্ধু দেবীর অনশনহেতু বিপজ্জনক অবস্থা। ইতিমধ্যে সরকার কড়া আদেশ জারি করেছেন, কোনমতেই রাজবন্দীদের আর আস্কারা দেয়া চলবে না, প্রয়োজন হলে জেলের ভিতরেও গুলি চালাতে হবে, তার ফলাফল বা হতাহতের সংখ্যা যাই হোক। এই অবস্থায় সরকারের প্রতি আনুগত্য ও বন্ধুর প্রতি আনুগত্যের দ্বন্দ্বে আমার মনে বন্ধুর প্রতি আনুগত্যই প্রাধান্য পায়।

অতি গোপন, সাংকেতিক ভাষায় রেডিওগ্রামে যে-সব নির্দেশ আসত বা আমি পাঠাতুম, সে-সবের নকল রাখা নিষিদ্ধ ছিল, সেজন্য আমার কাছে সে-সব নির্দেশ রক্ষিত নেই। সৌভাগ্যক্রমে তখন গোপন ফোনের ব্যবস্থা ছিল না, ফোন ভাল চলতও না। যদি ফোন চলত, তা হলে আমার প্রস্তাব নিশ্চয় নাকচ হত, উপরন্তু আমি ফোনের নির্দেশ অমান্য করতে পারতুম না। আমার এইটুকু স্মরণ আছে আমি সরকারকে লিখি, সরেজমিনের লোক হিসাবে এইটুকু বলতে পারি, একটি বদ্ধ ঘরে বন্দীদের মুখোমুখি গুলি ছুঁড়লে যত প্রাণহত্যা হবে, তার ফলে যে প্রবল রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা ও সরকারের প্রতি বিরূপতার সৃষ্টি হবে, তাই

আশঙ্কা করে আমি সরকারের অনুমতি থাকবে ধরে নিয়ে তাদের মুখ্য দাবিগুলি মেনে নিয়েছি, এবং এই আশ্বাস দিয়েছি যে তাদের কারোকেই বক্সায় স্থানান্তরিত করা হবে না। পরের দিন ভোরে গোপন কোডে সরকারের সম্মতি-সূচক রেডিওগ্রাম এল। তার কিছু পরে, অগাস্টের শেষে সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে সব রাজবন্দীই মুক্তি পায়।

সঙ্গে সঙ্গে এল গৃহসচিব রণু গুপ্তর স্বাক্ষরে ব্যক্তিগত চিঠিরূপী একটি মোক্ষম পয়জার। রণু গুপ্ত লিখলেন সরকারের স্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে আমি যে অবাধ্যতা ও নিয়ম লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি তাতে সরকার বিশেষ রুষ্ট হয়েছেন, উপরন্তু সরকারকে আমি রীতিমত বিব্রত করেছি। সরকার আমার একতরফা সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন শুধুমাত্র আমার মুখরক্ষার্থে এবং সর্বসমক্ষে আমার প্রতি তাঁদের বিশ্বাস জাহির করতে। অতঃপর আমি যেন সর্বদা মনে রাখি আমি বিশেষ গর্হিত কাজ করেছি। আমি তৎক্ষণাৎ ক্ষমাপ্রার্থনা করে চিঠি লিখি এবং স্বীকার করি আমার প্রতি সরকার কত দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন। মনে পড়ল গত শতাব্দীতে যখন লর্ড নেপিয়ার সিন্ধুদেশ জবরদখল করে ভারতসাম্রাজ্যভুক্ত করেন তখন গর্হিত কাজ করার জন্য পার্লামেণ্ট লর্ড নেপিয়ারকে প্রকাশ্যে ও সাড়ম্বরে ভর্ৎসনা করেন, কিন্তু সিন্ধুপ্রদেশকে সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্তিদানের কথা কখনও তোলেন না। ভর্ৎসনা হজম করে নেপিয়ার ঠাট্টা করে বলে বেড়াতেন 'পেক্কাভি, আই হ্যাভ সিনৃড'। (লাটিন 'পেক্কাভি'র ইংরেজি মানে হল, 'পাপ করেছি', অর্থাৎ ইংরেজিতে, আই হ্যাভ সিনৃড্)। সিনৃড্ আর সিন্ধু সমধ্বনি নিয়ে কৌতুক করতেন।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম যখন জানলুম ক্ষমতার বহির্ভূত গর্হিত কাজ করা ও অবাধ্যতার জন্য আমার ব্যক্তিগত চিত্রগুপ্তের অর্থাৎ সার্ভিস বুকের খাতায় কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য লেখা হয়নি, যা নাকি আমার ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হতে পারত। অন্তত আমার তাই অনুমান, কারণ, যদি খাতায় মন্তব্য উঠত তাহলে তার নকল দিয়ে আমাকে নিশ্চয় জানানো হত। ইংরেজ আমল হলে আমি নিশ্চয় পার পেতুম না, যেমন পাইনি ১৯৪২ সালে গৌরনদীর ডাকবাংলার ঘটনার ব্যাপারে। ইংরেজিতে বলে বেড়াল তার জীবনে ন'বার মারাত্মক ফাঁড়া কাটিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এই নিয়ে নয় বছরে আমার গেল তিনটি ফাঁড়া: একটি গৌরনদী, দুটি সুরাবর্দীর সঙ্গে হাতাহাতি, তিনটি বহরমপুর জেল।

সে যাই হোক, অল্পদিন পরে আমাকে জানানো হল আমি ফের বদলি হচ্ছে

পারি। বদলি অবশ্য ঝুলে রইল, তখনই হল না, তার কারণ অগাস্টের শেষে আমাকে বলা হল আমি হয়তো পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাসের কাজে যাব। এতগুলি কথা বলার মুখ্য উদ্দেশ্যই হল স্বাধীনতার প্রথম যুগে অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে যাঁরা শীর্ষে ছিলেন তাঁরা কত উদারচিত্ত ও ক্ষমাশীল ছিলেন। অন্যপক্ষে, আমার আই-সি-এস গুরুভাইদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল আমি ঘোর 'লাল'। ইংরেজ আমলে হলে, ইংরেজ আই-সি-এসরা বড়-জোর আমাকে 'ক্র্যাংক' বলে উল্লেখ করতেন, কারণ তাঁদের মূল্যমানে আই-সি-এস 'লাল' হতে পারে স্বীকার করা মানেই হচ্ছে ইস্পাতের ফ্রেমের তরফে হার স্বীকার করা। স্টিলফ্রেম স্টিলফ্রেমই, ইস্পাত ছাড়া তার অন্য কোন রং থাকতে পারে না, তবে ধাতুতে নরম-শক্তের তারতম্য থাকতে পারে। মনে হল রাজনৈতিক নেতাদের তুলনায় প্রশাসনিক অফিসাররা আরো দ্রুত রাজনীতি-ভাবাপন্ন হচ্ছেন।

রাজনীতিতে মূল্যমান

১৯৪৩-এ মুন্সীগঞ্জে এইচ-এস্ সুরাবর্দীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ আলাপ হওয়া ছাড়া, দেশভাগের আগে কখনও কোন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বা আলাপ করি-নি। শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে আগে থেকে একটু চিনতেন এই যা। কৈশোরে ১৯৩১ সালে সিমলায় কেন্দ্রীয় বিধানসভায় পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, অখিলচন্দ্র দত্ত, আবদুল হালিম গজনভী, শেঠ গোবিন্দদাস ; কাউন্সিল অভ স্টেটের পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ্রুর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়। তাঁরা যে মাপের ব্যক্তিত্ব ও বক্তা ছিলেন তাতে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় তাঁরা যে-কোন দেশের বিধানসভার শোভাবর্ধন করতে পারতেন। আমার চাকরির সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ফজলুল হক ও অন্যান্য সভ্যের যে-সব উক্তির উদ্ধৃতি করেছি, তাতেই প্রমাণ হবে তাঁদের হাতে ভারতের স্বার্থ নিরাপদ ছিল। এর অনেক পরে পঞ্চাশের দশকে পার্লামেন্টে বল্লভভাই প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, জওহরলাল নেহরু এবং গোবিন্দবল্লভ পন্থের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়। তাঁদের গাম্ভীর্য, বাক্‌সংযম, সত্যনিষ্ঠা, বিষয়ের উপর দখল, সহজ ভঙ্গী, যুক্তিপ্রয়োগ, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, কৌতুক, প্রয়োজনে কামারের এক ঘায়ের মত একটি মোক্ষম কথায় প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করার মধ্যে, তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও মননশক্তির মান স্পষ্ট বোঝা

যেত। ওঁদের মধ্যে আবার বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে আমি শ্যামাপ্রসাদকে সর্বোচ্চ স্থান দেব, এমন-কি সময়ে সময়ে তিনি জওহরলালকেও অতিক্রম করতেন। শারীরিক দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, সুগম্ভীর সুরেলা গলা, গম্বুজের মত উঁচু কপাল, দুটি চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সব মিলিয়ে দর্শকের সমীহ অর্জন করত। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, দাঁড়ানোর দৃপ্তভঙ্গীতে তিনি যেন ডাঃ বি-সি রায়কেও হারিয়ে দিতেন। নেহরু একবার ডাঃ রায়কে বলেন, 'বিধান, তোমাকে যার জন্য সবথেকে বেশী ঈর্ষা করি সে তোমার উচ্চতা।' উচ্চতা কথাটি কি তিনি শারীরিক অর্থেই শুধু ব্যবহার করেছিলেন? প্রায়ই ভেবেছি। পরের যুগের পার্লামেন্টে, অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে আমি যখন কাজ করতে যাই তখন উল্লেখযোগ্য হন ফিরোজ গান্ধী, ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতির্ময় বসু, হীরেন মুখার্জি। এঁদের মধ্যে বিরোধী বক্তা হিসাবে জ্যোতির্ময় বসুর কথার ভার ও ভঙ্গীর ভাব ছিল মারাত্মক; তথ্যের উপর দখল, নিহিতার্থ উদ্‌ঘাটন করে প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করায় তিনি এত দক্ষ ছিলেন, ফিরোজ গান্ধীও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। কিছু বলার আগে যথেষ্ট পড়াশোনা, গবেষণা ও চিন্তা করে আসতেন। এঁদের তুলনায় আজকালকার সংসদ সদস্যের বিরোধী পক্ষের মহারথীদের কাগুজে বাঘের বেশী বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডাঃ বি-সি-রায় সেদিনের কার্যাবলী বিষয়ে সবিশেষ প্রস্তুত হয়ে আসতেন। তথ্য বিষয়ে তাঁকে হারানো সম্ভব হত না। যতদূর সম্ভব সবিস্তারে সব তথ্য দিতেন, কোন অসত্য না থাকে সে-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকতেন, হাস্যকৌতুকও ভালবাসতেন। উত্তরে বা ব্যবহারে কখনও বিনয়, ভব্যতার অভাব থাকত না। বক্তব্য সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার হত, কিন্তু বাগ্মিতা বা বাঁধুনি তেমন থাকত না। অপরপক্ষে কিরণশঙ্কর রায়ের বক্তব্যে সংহতি বেশী থাকত। নলিনীরঞ্জন সরকার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। তিনি তখন গভর্নর জেনরলের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। সিংহলের সার অলিভার গুণটিলকে এসেছেন, ভারতের কাছে চাল কিনতে। নলিনী সরকার তাঁকে বললেন, চাল নেই। সার অলিভার একঘণ্টা ধরে তাঁকে নানাভাবে অনুরোধ উপরোধ করে চললেন, এন-আর সরকার চুপ করে শুনে গেলেন। নিস্তব্ধতায় বিমূঢ় হয়ে গুণটিলকে বললেন, 'আচ্ছা, এখন চাল না হয় নাই হল, একটা আশ্বাস তো দিন।' এন-আর সরকার এক-আধ কথার মানুষ, পুরো একটি বাক্যও অনেক সময়ে উচ্চারণ করতেন না। বললেন, 'আশ্বাস সহজ, চাল শক্ত।'

ডাঃ রায়ের প্রথম মন্ত্রিসভায় কিরণশঙ্কর রায় ছিলেন অবিসম্বাদিতভাবে সব-

থেকে ভাল ও নিপুণ বিধায়ক। সেই অনুপাতে বিরোধীপক্ষের জ্যোতি বসু ছিলেন প্রশ্নে ও বিতর্কে অনাবশ্যকভাবে রূঢ় ও আক্রমণাত্মক। প্রশ্ন বা বাক্য শুনে মনে হত উনি আগে থেকে যুক্তি ইত্যাদি ভাল করে গুছিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসেন-নি, অথবা তথ্যের উপর সম্ভবত পুরো দখল নেই। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন অজস্র পরিসংখ্যান উপহারে পটু ছিলেন, মাঝে মাঝে সে উপহারে তাঁর সদিচ্ছাই বেশী প্রকাশ পেত, আসল উত্তর তত আশাপ্রদ হত না। বিধায়করা পরিসংখ্যানে তত অভ্যস্ত ছিলেন না।

মালদা থাকার সময়ে একমাত্র কিরণশঙ্কর রায়কেই মন্ত্রী হিসাবে দেখেছি। মুর্শিদাবাদে আমি থাকাকালে এসেছিলেন মন্ত্রী নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, ভূপতি-কুমার মজুমদার, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র নস্কর। ভূপতিবাবু বেশ আমুদে লোক ছিলেন, সুন্দর করে গুছিয়ে গল্প বলতে পারতেন। জেলের বছরগুলি কাজে লাগিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিল আদ্যোপান্ত পড়া, স্মৃতি থেকে গড়গড় করে কবিতার পর কবিতা আউড়ে যেতেন। কমবয়সে বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ফলে, মন্ত্রী হয়ে তিনি বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীদল বাহিনী গঠনে মন দিলেন। মেজর সুনীল ব্যানার্জি ছিলেন তাঁর মুখ্য সংগঠন অফিসার, সরকার তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে মুর্শিদাবাদে পাঠানোয় তিনি ক্ষুণ্ণ হন। ১৯৫৬ সালে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারে যখন সেক্রেটারি নিযুক্ত হই তখন ভূপতিবাবু ছিলেন আমার মাথার উপরে ছয়জন মন্ত্রীর একজন। চীফ সেক্রেটারী সত্যেন রায় আর ভূপতিবাবু পরস্পরের সান্নিধ্যে বিশেষ স্বচ্ছন্দবোধ করতেন না। ভূপতিবাবু একদিন নিজের ঘরে বসে আছেন, এমন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর এক অনুরোধ নিয়ে সত্যেন রায় তাঁর ঘরে ঢুকলেন। ভূপতিবাবু তাঁর চাকালাগানো চেয়ারটি সামান্য একটু টেরচা করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কোলের উপর একটি মোটা বই মাঝখানে খুলে, পড়ায় মগ্নভাব দেখিয়ে দৃঢ় গলায় রায়কে জিজ্ঞেস করলেন, "জরুরি কিছু ব্যাপার কি? তা না হলে আমি এখন হাইড্রোডায়নামিক্সের একটি জটিল সমস্যায় ডুবে আছি।' ভাবটা, এখন বিরক্ত করা চাই না। তিনি সেচ-বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন, আমি ছিলুম তাঁর বিদ্যুৎশিল্পের সচিব। কিন্তু তিনি কি সত্যেন রায়ের সঙ্গে কথার মুন্সিয়ানায় পারেন! রায় বললেন, 'স্যার, এ সমস্যাটা এয়রোডায়নামিক্সের, তাই ডাঃ রায় বললেন, আপনি যদি সরকারের প্লেন নিয়ে বন্যাক্লিষ্ট জেলাগুলি একবার ঘুরে আসেন!'

তবে সব থেকে মজার, যাকে বলে 'মাই ডিয়ার' মন্ত্রী ছিলেন, হেমচন্দ্র নস্কর।

তিনি একমাত্র মন্ত্রী যাঁকে আমি বহরমপুর স্টেশন থেকে সার্কিট হাউসে নিজে গিয়ে নিয়ে আসি, ফিরতিপথে নিজে ট্রেনে উঠিয়ে দিই। যেদিন এলেন সেদিন বিকালে সার্কিট হাউসে চা খেতে বসে গল্পচ্ছলে কলকাতার হালচাল বললেন। ডাক্তার রায়ের মন্ত্রিসভার কথা প্রথমে তুলে বললেন, 'আমরা তো জানেন সব কচ্ছপ মন্ত্রী!' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালুম। বললেন, 'মানে আমরা যে যার সকাল দশটায় গুট গুট করে রাইটার্স বিল্ডিংসের বারান্দায় উঠে কচ্ছপের মত কুপ কুপ করে হাঁপাই। ডাঃ রায় একটি কাঠি নিয়ে এসে আমাদের পেটের তলায় ঢুকিয়ে আমাদের উল্টিয়ে দেন। আমরা সারাদিন উল্টে পড়ে শূন্যে হাত-পা ছুঁড়ি। আবার পাঁচটার সময়ে ডাঃ রায় এসে ডাণ্ডা দিয়ে আমাদের টুক্ করে উল্টে দিলেন, আমরা আবার গুট গুট করে যে যার বাড়ি ফিরে গেলুম।' পাঠকই বলুন, এরকম লোক পাওয়া যায়!

দেশবিভাগের আগেও হেমবাবু বরাবর, অর্থাৎ ১৯৩৭ সাল থেকে প্রতিটি মন্ত্রিসভায় ছিলেন, ফজলুল হক মন্ত্রিসভাই হোক বা নাজিমুদ্দিনই হোক। ফজলুল হক যেবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গড়েন, তখন হক সাহেবের অনুরোধে শ্যামাপ্রসাদবাবু হেম নস্করের বাড়ি যান। গিয়ে বললেন, 'হেমবাবু, আপনাকে হক সাহেব মন্ত্রী করতে চান। লাট হার্বার্টের কাছে আপনার ডাক পড়বে। হার্বার্ট হয়তো আপনার কাছ থেকে কথা বার করার জন্য অনেক রকম প্রশ্ন করবে, আপনি ওসবে কান দেবেন না। শুধু বলবেন, "আমি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা সাপোর্ট করি"।' নির্দিষ্ট দিন এল। ১৯৩২ সালের বিশাল পুরনো সিডান অস্টিন গাড়ি পালিশ করে ঝকঝকে করা হয়েছে। ড্রাইভার উর্দিপরা। সঙ্গের পরিচারকও পাট ভাঙা পোশাক পরা। হেমবাবুর পরনে চুনোট করা দেবীপুরের কাঁচি ধুতি, গায়ে গিলে করা ল'ন কাপড়ের পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর। গাড়ি যথাসময়ে লাটপ্রাসাদে গিয়ে দাঁড়াল। চাপরাশি, সার্জেন্ট সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে দিল। হেমবাবু ধীরেসুস্থ, নেমে, দরবার হল পার হয়ে, বিখ্যাত পাখির খাঁচা (বার্ড কেজ) লিফ্‌টে উঠে দোতলায় পৌঁছলেন। লিফ্‌টের দরজায় লাটের সেক্রেটারি কার্টার তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে অপেক্ষা করার ঘরে নিয়ে গেলেন। এসব যাওয়া আসা হেমবাবু গজেন্দ্রগমনে করলেন। ধীরেসুস্থে হাঁটা-চলা দেখে কার্টার চমৎকৃত হলেন। ভাবলেন মন্ত্রী হবার যোগ্য বটে, আমার লালমুখ দেখেও একটুও হৈই হৈই করল না, ধন্যভাব দেখাল না। জানতেন না হেমবাবুর আর্থ্রাইটিস, নড়তে চড়তে সময় লাগত। ঠিক সময়ে লাটের ঘরে ডাক

পড়ল। অন্তঘর থেকে এসে সাদর সম্বোধন করে লাট বসতে বললেন। হেমবাবু হাল্কা ঘাড় নেড়ে নমস্কার জানিয়ে ধীরেসুস্থে বসলেন। লাট হার্বার্টও খুব আকৃষ্ট-বোধ করলেন। এমন রাসভারি, আত্মস্থ, আত্মসম্মানী লোক ভারতীয়দের মধ্যে তো সচরাচর দেখা যায় না, বিশেষত লাটের সমুখে। উনিও আর্থ্রাইটিসের কথা জানতেন না। চা এলে হার্বার্ট নিজে চা ঢেলে দিয়ে হেমবাবুকে তাঁর বংশের নানাবিধ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানে বদান্যতার কথা উল্লেখ করে সাধুবাদ দিলেন। হেমবাবু ঠোঁটে অল্প হাসি নিয়ে শুনে চলেছেন। হার্বার্ট বললেন, 'তা ছাড়া আমি শুনেছি, মিঃ নস্কর, আপনি আপনার বিরাট যৌথ পরিবারে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে সাপোর্ট করেন।' হেমবাবু তখন সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, 'আই সাপোর্ট দি কোয়ালিশন মিনিস্ট্রি, ইয়োর এক্সেলেন্সি।' হার্বার্ট একটু চমকে গিয়ে, কিছু পরে সৌজন্যসহকারে মোলাকাৎ শেষ করলেন। হয়তো ভাবলেন, হেমবাবু গালগল্প পছন্দ করেন না।

যেদিন হেমবাবু বহরমপুর এলেন সেদিন আমার বাড়ির সমুখে কৃষ্ণনাথ কলেজের ছেলেমেয়েদের অবস্থান ধর্মঘট চলছে। মাঝে মাঝেই তারা সকলে চিৎকার করে প্রিন্সিপালের আদেশের প্রত্যাহার চায়। যতক্ষণ না তারা নিজেদের অভদ্র ব্যবহারের জন্য প্রিন্সিপালের কাছে মাপ চায় ততক্ষণ আমি তাদের সঙ্গে দেখা বা কথা বলব না জানিয়েছিলুম। পরের দিন সকালে হেম-বাবুকে নমস্কার করে তাঁর প্রোগ্রাম ঠিক করতে গেছি, দেখি তিনি চকইসলাম-পুরের এক সিল্কের ব্যাপারীকে সমুখে বসিয়ে ডজন দুয়েক সিল্ক শাড়ির বরাত দিচ্ছেন। ঘরে ঢোকাতে তিনি বললেন, 'আমি কাল রাত্রে ছেলেগুলিকে বলে-কয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি, বলেছি আপনি বড় অসুস্থ, তা না হলে নিশ্চয় তাদের সঙ্গে দেখা করতেন।' আমি আপত্তির সুরে বললুম, 'আমি একেবারেই অসুস্থ ছিলুম না। তাদের শুধু জানিয়েছিলুম, যতক্ষণ না তারা প্রিন্সিপালের কাছে ক্ষমা চাইছে…।' তিনি শুনেও শুনলেন না। আবার বলতে যাচ্ছি, তখন বললেন, 'আমি জানি মিঃ মিত্র, কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কী করবেন বলুন। তবে শুনুন, কথা। বিশবছর আগে পাড়ার মেয়েদের জন্য আমি একটা পাঠশাল খুলি। এখন সেটি একটি বেশ নামকরা হাইস্কুল। সেদিন অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি এমন সময়ে বিরাট দলবেঁধে প্রায় দু'শ' মেয়ে আমার ঘরে হাজির। বাছাদের মুখগুলি রোদে আর গরমে লাল। সকলে মিলে তাদের ঠাণ্ডা জল খাওয়াতেই অস্থির। একদিকে জল খাচ্ছে, অন্যদিকে সমানে

চিৎকার করে যাচ্ছে, অবিলম্বে হেডমিস্ট্রেসকে বরখাস্ত করতে হবে। জিজ্ঞেস করলুম, "কী পাপে তাঁর এই শাস্তি!" চিৎকার করে বলে কি জানেন, "তিনি অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী ও ক্ষমতাসক্ত। স্কুলের রক্ষীদের তিনি কড়া আদেশ দিয়েছেন, যদি কোন ছেলে আমাদের কারোর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে স্কুলের হাতায় ঢুকতে চায়, তাকে ঢুকতে দেয়া হবে না। এমন-কি তিনি স্কুলের চারধারে শক্ত গেট লাগিয়ে, স্কুলের সময়ে সেগুলি তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। ছেলেদের সঙ্গে ইচ্ছামত মেশার স্বাধীনতা বন্ধ করেছেন। তাঁকে সরাতেই হবে।" অবস্থা এইরকম দাঁড়িয়েছে। সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে তো চলতে হবে, মিঃ মিত্র!' এই যুক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হলুম, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েরা প্রিন্সিপালের বাড়িতে একটুকরো কাগজে ক্ষমা চেয়ে জানিয়েছে।

যেদিন মালদার পথে রওনা হলেন, সেদিন জিয়াগঞ্জে ভাগীরথী পার হয়ে আজিমগঞ্জে জঙ্গীপুরের ট্রেনে তুলে দিতে গেছি, হঠাৎ কোথা থেকে একজন জেলে খেয়ানৌকায় হুড়মুড় করে উঠে তাঁর হাতে এক দরখাস্ত দিয়ে বলল, তৎক্ষণাৎ সেটি পড়তে হবে। হাত বাড়িয়ে দরখাস্তটি নিয়ে সেটি ফের আমার হাতে অর্পণ করে জেলেদের বললেন, 'কিন্তু আমাকে কেন বাছারা, (আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন) এঁকে তো চেন, ওঁকেই দাও, ওঁরাই আদি থেকে আছেন, চিরকাল থাকবেন। আমরা তো মন্ত্রীমাত্র, যাত্রাদলের ভাড়াটে কেষ্ট, আজ আছি, কাল নেই। আমার পিছনে বৃথাই ছুটছো।' ভদ্রলোককে না ভালবেসে উপায় আছে? বহরমপুরে আর যে-সব মজার গল্প বলছিলেন, আগেই বলেছি।

সব কিছু মিলিয়ে মানতেই হয় ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কলকাতায় যে-সব মন্ত্রীদের সঙ্গে কাজ করেছি তাঁদের বিদ্যা, বিনয়, অভিজ্ঞতা, আচরণ, ব্যক্তিগত ত্যাগের ইতিহাস বিবেচনা করলে শ্রদ্ধা না করে উপায় থাকে না। প্রত্যেকেই ছিলেন দেশব্রতী, নিজের, বা ছেলের, বা ভাইবোনের কোলে ঝোল টানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। স্বদেশবাসীর কাছে, বিধানসভায়, জবাবদিহির আবশ্যকতা বুঝতেন, লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হত না; সাধারণের আহৃত ট্যাক্স 'এলোমেলো করে দে মা, লুটে পুটে খাই' মন্ত্র অবলম্বনে আত্মসাৎ করার কোন অভিপ্রায় ছিল না। হীনম্মন্যতায় ভুগে ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করতেন না, সাধারণ বুদ্ধি ছিল প্রচুর, কোন্ সিদ্ধান্তে সাধারণের উপকার হবে তা জানতেন। আপনার বক্তব্য ধৈর্য ধরে

শোনা বা পড়ায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের অফিসার হিসাবে, এই ধরনের গুণ আমারও তাঁদের সমান ছিল, একথা বুক ঠুকে বলতে পারি না।

জনসাধারণ

বহরমপুরে আমার সহকর্মীদের ও তাঁদের পরিবারদের সঙ্গে আমাদের সময় এত ভাল কাটত, যে অন্যান্য জায়গায় যে ধরনের বন্ধু খুঁজতুম ও পেতুম—যেমন মুন্সীগঞ্জে ডাঃ মন্মথ নন্দী, আর্নল্ড ম্যাকার্টিচ, শৈলেন দাশ, অশ্রু দাশ বা অমিয়া ঘোষ; অথবা কার্সিয়ঙে অমিয়দা বা জুরীমল, বা মালদায় জ্যোতিদাদা—সেরকম ঘনিষ্ঠতা করার তাগিদ আমার বহরমপুরে হয়নি। অন্যদিকে বহরমপুরে বা মুর্শিদাবাদের অন্যত্র যে-সব সুধীজনের কথা লিখেছি, তাঁদের সঙ্গে আলাপ ছিল বলে আমি এখনও বিশেষ কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে এটাও সম্ভবত সত্যি, ১৯৪৯ সালে নিজের উপর আস্থা আমার বাড়ে। মুর্শিদাবাদে গিয়ে দেখি, ১৯৩৮ সাল থেকে যতগুলি কালেক্টর কাজ করেছেন, সকলেই ছিলেন প্রৌঢ়, ফলে তাঁরা তাঁদের ও আগের কালেক্টরদের মত ঘোরাঘুরি করতে পারতেন না। ১৯৪৭-এর আগে জেলায় জীপ যায়নি, ওদিকে ঘোড়া বা সাইকেলের চলন প্রায় লুপ্ত হয়েছে। চাপরাশিদের মধ্যে একমাত্র বুড়ো মৌলাবক্সই ভালভাবে তাঁবু খাটাতে জানত, আর তদারক করতে পারত। আমার নির্দেশে সে এ-বিদ্যা ছোকরা গুলামকে ভাল করে শিখিয়ে দেয়। গুলামের ছিল অল্প বয়স, বুদ্ধিমান, চোখ-কান খোলা। মালদায় মজিদ-তোজামলের বাড়ির মত আমরা মুর্শিদাবাদে মৌলা ও গুলামের বাড়িতে বকর্-ঈদ উপলক্ষে আনন্দ করে খাওয়া-দাওয়া করতুম। ১৯৭৩ সালে বহরমপুর গার্লস্ কলেজের নতুন বাড়ির দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে আমি দিল্লী থেকে বহরমপুরে দু'দিনের জন্য যখন যাই তখন মৌলা অবসর গ্রহণ করেছে। গোরাবাজারে তার বাড়ি গিয়ে দেখি যেন দ্রুত অথর্ব হয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জয়তীর বিবাহোপলক্ষ্যে আমি মৌলা, গুলাম ও শান্তিকে দিল্লী থেকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাই। শান্তি ছিল তৃতীয় পিওন। মৌলা জয়তীর বর গৌতমের জন্য একটি অতি সুন্দর মিহি শার্টের কাপড় পার্সেল করে পাঠিয়ে দেয়। ধন্যবাদস্বরূপ আমি তাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিই। টাকা পেয়ে ভারি সুন্দর একটি চিঠি লিখে জানায় সে সেই টাকা দিয়ে জয়তীর বিবাহোপলক্ষ্যে নিজের বাড়িতে আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে। আমরা তার সভ্য, ভদ্র ব্যবহারে

খুব আনন্দ পেলুম। ১৯৮৪ সালে আবার যখন বহরমপুর যাই, তার আগে মৌলা গত হয়েছে, বাড়িতে তার বিধবা বোনের সঙ্গে কথা হল। মারা যাবার আগে কষ্ট পায়নি।

চতুর্থ পিয়ন শীতল ষাটের দশকে মারা যায়। ১৯৪৯ সালে হাঁপানি রোগে ভুগত। শীতলের স্ত্রী রুগ্নতাহেতু সন্তানধারণে অসমর্থ বলে, জামাইবাবু, ডাঃ আর-এন চৌধুরী, ট্রপিকাল স্কুলে তাকে ভর্তি করে নেন। চিকিৎসার ফলে তার বন্ধ্যাত্ব দূর হয় এবং ১৯৫০ সালে পূজার পর শীতলের একটি পুত্রসন্তান হয়। ১৯৫০-এর ডিসেম্বর মাসে আমি সেন্সাস ট্রেনিং ক্লাস নেবার জন্য যখন বহরমপুর যাই, তখন সভার মাঝে শীতল পিতৃত্বের গর্বে তার শিশুপুত্রকে এনে আমার কোলে দিয়ে সলজ্জভাবে বলে 'আপনার ছেলে নিন।' কথাটির সম্ভাব্য তাৎপর্যে আমার মুখ লাল হয়ে হাসি পাবার আগেই সারা সভা হাসিতে ফেটে পড়ে ব্যাপারটি হাল্‌কা করে দেয়। আমার পালা এল একগাল হেসে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সব কিছু বুঝিয়ে বলার।

পদ্মায় চুবোনি

বহরমপুরে থাকতে সরকার থেকে পেটে রিভলভার সাঁটা দুটি দেহরক্ষী দেয়, প্রত্যেকের দিনে বারো ঘণ্টা করে ডিউটি। দুজনেই ছিল শক্ত, সমর্থ, পালোয়ানের মত, ক্ষিপ্র, সজাগ, চুপচাপ। সাধারণত এই ধরনের রক্ষী দেখলেই ভয় হয় বুঝিবা গোলমালের সময়ে ঘাবড়িয়ে গিয়ে আমাকেই গুলি মেরে দেবে। সে রকম নয়, তাদের আত্মস্থ ব্যবহারে আস্থা হয়। মুর্শিদাবাদের উত্তর-পুব সীমান্তে তাদের উপস্থিতি সাহায্য করত, কখন কার মাথায় কী কুমতলব ঢোকে বলা যায় না। সবথেকে সুবিধা হত কাদায়, বালিতে গাড়ি ঠেলার প্রয়োজন হলে। বর্ষা শেষ হবার আগে পদ্মানদীর তীর ধরে মুর্শিদাবাদের নদীপ্রান্তরক্ষার্থে যে-সব ঘাঁটি ও মাচা আমাদের ছিল সেগুলি প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আমি কলকাতা থেকে একটি মোটরলঞ্চ চেয়ে পাঠালুম। কয়েকদিন ব্যাপী লঞ্চে করে পরিদর্শন শেষ করে, মানিকচক থানার ভালুকায় গিয়ে জ্যোতির্মোহন মিশ্রের কাছে দুদিন আড্ডা আর আমি থাকলুম। পারভালুকায় জ্যোতিদাদার দিদি বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী সুরেন্দ্রবালা দেবী থাকতেন। ফিরে যাবার জন্য ভালুকাঘাটে তৃতীয় দিন সকালে লঞ্চে উঠে দেখি, দুদিন নোঙর ফেলে থাকার দরুণ নোঙরের

চারপাশে বিস্তর বালি জমে লঞ্চ আর নড়ে না। খালাসীরা জলে নেমে জলের তলায় নোঙরের চারদিকের অনেক বালি হাত দিয়ে সরানোয় তার উপর উইঞ্চ চালিয়ে নোঙর তোলার চেষ্টা করল। ঘণ্টাখানেক ধ্বস্তাধ্বস্তিতেও যখন লঞ্চ নড়ে না তখন হঠাৎ আমার মাথায় নেতৃত্ববোধ জেগে উঠল। ঠিক করলুম, উৎসাহ দেবার জন্যও হাত লাগানো দরকার। লঞ্চের ব্রিজের উপর উঠে তার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নোঙরের ভারি চেন ধরে টানতে লাগলুম। বোকা আর কাকে বলে, উইঞ্চের শক্তির তুলনায় আমার হাতের টান পিঁপড়ের শক্তি বললেই হয়। হঠাৎ লঞ্চের নোঙরটি আল্‌গা হয়ে গিয়ে লঞ্চটি বেমালুম খানিকটা বাঁদিকে ঘুরে গেল। যে চেনটি আমি টানছিলুম, সেটি আমার পাঁজরের কাছে এমন ঝাপটা দিল যে আমি তার ধাক্কায় সোজা জলে পড়ে গেলুম। গায়ে আমার পুরোদস্তুর জামা-কাপড় পড়া, ভারি হ্যারিস টুইডের জ্যাকেট, গায়ে ভারি জুতো মোজা। মোটেও সাঁতার জানি না, এক তাল সীসের মত ডুবে গেলুম। আভা নিচের জানলায় দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে আমার পড়া দেখল। সারেং হাঁ হাঁ করে উঠে প্রাণপণে হালের চাকা উল্টোদিকে ঘুরোল। ইতিমধ্যে দুটি দেহরক্ষীর মধ্যে যে বেশী শক্তসমর্থ সে আমার পিছু পিছু মাছরাঙ্গা পাখি যেমন জলে মাছ দেখে ছোঁ মেরে সোজা পড়ে, তেমনি জলের মধ্যে ঝাঁপ দিল। আমার মাথা জলে ডোবার আগেই সে দুহাতে আমাকে পাঁজাকোলা করে আমাকে তার মাথার উপর শূন্যে তুলেছে। ইতিমধ্যে নোঙর উঠে গেছে, লঞ্চটি চলতে শুরু করেছে। সারেং যদি উপস্থিত বুদ্ধির জোরে লঞ্চের মোড় না ঘোরাতো তাহলে দেহরক্ষী আর আমি দু'জনেই লঞ্চের তলায় পিষে মারা যেতুম!

একচুলের জন্য দুজনে বেঁচে যাওয়াতে লঞ্চে উঠে সেদিন খালাসী, সারেং ইত্যাদি মিলে আমরা একসঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়া খেলুম। আমি পৌঁছবার আগেই বহরমপুরে খবর পৌঁছে গেছল। সিভিল সার্জনের দপ্তর থেকে লোক এসে আমাকে অ্যান্টিটিটেনাস ইন্‌জেকশন আর ঘুমের ওষুধ দিল। আমার যে কোন দুষ্কর্মের কথা বাবাকে জানাতে আভার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হত না। এবারেও আমার অযথা গোঁয়ার্তুমির কথা ফলাও করে লিখল। বাবা লিখলেন, পত্রপাঠ আমি যেন কলকাতায় যাই। আমাকে অক্ষত ও সুস্থ দেখে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

তেভাগা আন্দোলন

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৪১-এর জুলাইয়ে বঙ্গের ভূমিরাজস্ব ও সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের উপর ফ্লাড (Floud) কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাকে ভিত্তি করে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের তেভাগা আন্দোলন দ্বিগুণ উদ্যমে চাগিয়ে ওঠে। রিপোর্টের সুপারিশ ছিল কাটা ফসল গোলাজাত করার আগে এতদিন পর্যন্ত ভাগচাষীকে যে হারে তার ভাগ দেয়া হত তা বাড়াতে হবে। ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রকাশিত ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের উপর উডহেড কমিশনের রিপোর্টে ফ্লাড কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশের উপর জোর দেয়া হয়, বলা হয় ভাগচাষী ও বন্ধকী চাষীমজুরদের ফসলের অংশ আগের ধার্য হার থেকে বাড়াতে হবে।

১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে বঙ্গের মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভা ফ্লাড কমিশনের সুপারিশ-গুলি সম্বন্ধে করছি-করব ভাব দেখান, অথচ কিছু করেননি। ওদিকে নিখিলবঙ্গ প্রাদেশিক কিষাণসভা ফ্লাড কমিশনের তেভাগাসংক্রান্ত সুপারিশগুলি প্রকৃতরূপে চালু করার জন্য গণআন্দোলন শুরু হবে ঘোষণা করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে হয়তো তখনকার অবস্থার একটু অযথা সরলীকরণ এবং তার ফলে সূক্ষ্ম তারতম্য-গুলি বিকৃত করা হবে, কিন্তু তেভাগার মূল প্রশ্ন ছিল ভূমিস্বত্বাধিকারী মালিক, যিনি নিজের হাতে চাষ করেন না, বা হাতে-কলমে ফসল ফলাবার কোন দৈনন্দিন দায়িত্ব নেন না, তিনি তাঁর পুঁজি, অর্থাৎ চাষজমি খাটিয়ে তার ফসল থেকে আসল চাষীকে—তাঁর অন্য জমি থাক অথবা তিনি ভূমিহীন মজুর চাষী হোন—ফসলের কত ভাগ দেবেন। প্রচলিত রীতিক্রমে ভূমিহীন মজুর চাষী বছরের পর বছর একই জমিতে চাষ করার অধিকার পেতেন, যতক্ষণ না সেই মজুর চাষী সে অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, অথবা দুই পক্ষের চুক্তিক্রমে জমির মালিক পুরনো বাঁধা চাষীকে খারিজ করে। মালিকানাহীন মজুর চাষী শুধু যে তাঁর দৈহিক মেহনত, জ্ঞান, দক্ষতা ও যত্ন দিতেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দিতেন বীজ, বাড়িতে তৈরি গোবরের ও আবর্জনার কম্পোস্ট সার, হাল আর বলদ। এত সব অনুদান সত্ত্বেও ভাগচাষী এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের বেশী ফসলের ভাগ পেতেন না, এবং ভূমিহীন বন্ধকী মজুর চাষী এক-তৃতীয়াংশের বেশী ভাগ পেতেন না।

তেভাগা আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে ফ্লাড কমিশন সুপারিশ করেন, জমি থেকে ফসল উঠলেই সেই ফসল তিন সমান ভাগে ভাগ করতে হবে।

প্রথম এক-তৃতীয়াংশ যাবে জমির মালিকের ভাগে তার জমির ভাড়া স্বরূপ। দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশ যাবে যে শরীরের মেহনত, দক্ষতা ও জ্ঞান দিয়ে জমি চাষ করেছে, ফসল ফলিয়ে সে ফসল গোলায় তুলবে তার ভাগে। শেষ তৃতীয়াংশ যাবে তার ভাগে যে চাষের বীজ, সার, সেচ, হাল ও বলদ দেবে। ঐতিহ্যক্রমে এইগুলি দিত নিযুক্ত বা বন্ধকী মজুর চাষী। স্বভাবতই তেভাগা আন্দোলনের দাবি হল এই শেষ তৃতীয়াংশ ভাগ বা মজুর চাষীর ন্যায্য প্রাপ্য, তার কৃপায় ফসলে তার ভাগ হবে দুই-তৃতীয়াংশ। কিন্তু যেহেতু মালিক জমিদার নামেমাত্র বীজ, সার, সেচ, বলদ দিতেন বা না দিয়েও দিয়েছেন বলে দাবি করতেন, সেহেতু বাদবিসংবাদ এড়ানোর জন্য চাষকরা চাষী (বর্গাদার, আধিয়ার, বা ভাগচাষী, যেখানে যেমন নামে চলত), রফা হিসাবে, এক-তৃতীয়াংশ ও দুই-তৃতীয়াংশের মাঝামাঝি, অর্থাৎ পঞ্চাশ শতাংশ দাবি করল। এই রফার বদলে ভাগচাষীর দাবি হল, মালিক যাতে তাকে মিথ্যা ওজরে জমি থেকে উৎখাত করতে না পারে সেই স্বত্বরক্ষার জন্য সরকার ভূমিস্বত্বের খতিয়ানে তাকে নথিভুক্ত করে আইনত স্বীকৃতি দেবেন। জমিদার অবশ্য ভাগচাষীকে এ ধরনের সরকারি নথিবদ্ধ স্বীকৃতি দিতে একান্ত নারাজ। তারা জিদ ধরল প্রতিবছর তাদের ইচ্ছামত ভাগচাষী বেছে সেই বছরের মত তাকে জমি পত্তন দেবে। এর ফলে ভাগচাষীর একই জমিতে বছরের পর বছর চাষ করার প্রথাগত অধিকার বা দাবি থাকবে না। এই ব্যবস্থার ফলে চাষের অযত্ন হবে এবং উর্বরতা কমে যাবে, তাও স্বীকার, জমিদারের এই পণ।

ভাগচাষীরা হত অধিকাংশই মুসলমান অথবা অনুন্নত জাতির লোক (তপশীলী কথাটি তখনও আবিষ্কার হয়নি)। এই তথ্যটি আমি স্মৃতিকথার প্রথম খণ্ডে লিখেছি। সুতরাং, প্রথমে ফজলুল হক ও পরে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা এই ধরনের ভূমিসংস্কারে যতটা আগ্রহী ছিলেন, কংগ্রেস ততটা ছিলেন না। তার কারণ খুব সহজ। কংগ্রেসে ছিল ছোট-বড়-মাঝারি জমিদার ও ভূস্বামীদের আধিপত্য। তাঁরা নিজের হাতে জমি চাষ করতেন না, বা চাষের তদারকও রীতিমতভাবে করতেন না। উপরন্তু তাঁরা স্বভাবতই ফজলুল হককৃত বঙ্গীয় কৃষিঋণ আইনের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। মৌল স্বার্থের বিরোধের ফলে ১৯৩৮ সালে গান্ধীজি নিজে কলকাতায় এসে অনেক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসকে ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে সম্মত করায় ব্যর্থ হন। ফজলুল হক নিজে এই প্রস্তাবিত জোটের দিকে যথেষ্ট ঝুঁকেছিলেন, কারণ, তাঁর বিশ্বাস

ছিল এই জোট হলে তাঁর মন্ত্রিসভা অজেয় হবে। স্মৃতিকথার প্রথম খণ্ডে যা বলেছি, এখনও আমার তাই মত; যদি সে সময়ে এই ধরনের সম্মিলিত সরকার হত তাহলে হয়তো ভবিষ্যতের ইতিহাস অন্য রূপ নিত। বঙ্গ বিভক্ত হত না। আমার নিজের ধারণা বঙ্গীয় কৃষিঋণ মকুব আইন কংগ্রেসের চোখে বিষবৃক্ষস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। একই কারণে ১৯৪৫-৪৬ সালে উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন যখন জোরদার হয় তখন মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে এ আন্দোলন যাতে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির অধিকাংশ সভ্যরা এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নীরব ও সার্থকভাবে হাত মেলান। কারণ কম্যুনিস্ট পার্টির অধিকাংশ ক্ষমতাশালী সদস্য ছিলেন ভূমিসত্বভোগী, নিজহাতে চাষ না করা, ভাগচাষীর-মেহনত-জাত উপসত্বভোগকারী সমাজের। কাজে কাজেই বাংলার এইসব ভৌগোলিক ও সামাজিক অংশে বঙ্গীয় কৃষিঋণ আইন চালু করার বিরুদ্ধে তাঁদেরও স্বার্থ জড়িত ছিল। এই সূত্রে এও মনে রাখতে হবে উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুরের পূর্বাঞ্চল, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় পশ্চিম-বঙ্গের মত অল্পবিত্ত চাষ-না-করা ভূস্বামীর সংখ্যা ছিল স্বল্প। অধিকাংশ স্বল্পজমির ভূস্বামী ও ভাগচাষী ছিল তপশীলী জাতি ও উপজাতি, রাজবংশী, বোরো, বাহে সম্প্রদায় এবং মুসলমান।

১৯৪৯ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণসভার ঘোষিত গণআন্দোলন ডাকে সি-পি-আইয়ের সব স্তর একজোটে সাড়া দেয়নি। তদানীন্তন সংবাদপত্রগুলি চোখ বুলিয়ে দেখলেই এই উক্তির সমর্থন মিলবে। উল্টে, সি-পি-আইয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টি ছিল তেভাগা বিষয়ে উদাসীন। এর প্রধান কারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় ১৯৫৫ সালে যখন আমি বর্ধমান জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যাই। সে জেলার বেশীর ভাগ সি-পি-আই ক্যাডারই ছিল নিজের-হাতে-চাষ-না-করা ভূমিস্বামী 'ভদ্রলোক' শ্রেণী। সামাজিক নির্দেশে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিজ-হাতে হাল ধরা ছিল বারণ, সুতরাং স্বহস্তে চাষ করতেন না। বর্গাদারের শ্রমজাত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ অম্লানমুখে বছরের পর বছর ভোগ করতেন, সরকারি খতিয়ানে অধীনস্থ ভাগচাষীর স্বত্ব স্বীকারে ছিলেন নারাজ।

ওদিকে আমার মনে আছে ১৯৪১ সালে ফ্লাড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হবার পর ১৯৪২-৪৩ সালে আমি যখন মুন্সীগঞ্জে সেখানকার সি-পি-আই সভ্যদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা ক'রে—তার মধ্যে ছিলেন অনিল মুখার্জি ও সত্যেন সেন—তাঁদের ফ্লাড কমিশন রিপোর্টের প্রতি ঔদাসীন্য নিয়ে বিলেতের

ওয়েল্‌সের কয়লাখনি অঞ্চলের একটি গল্প বলি, তখন তাঁরা সে গল্প শুনে মোটেই কৌতুক প্রকাশ করেননি। গল্পটি ছিল সত্য এবং এইরূপ। সি-পি-জি-বি নতুন ক্যাডারদের শিক্ষা দেবার জন্য ওয়েল্‌সের কয়লাখনি শ্রমিকদের সাম্যবাদ বোঝাতে পাঠাতেন এই সরলীকৃত সূত্রে: 'আপনার যদি দুটি মোটরকার থাকে, তাহলে সাধারণের হিতার্থে একটি দিয়ে দিতে হবে।' 'হাঁ'। 'যদি আপনার দুটি শার্ট থাকে, আরেকজন কমরেডকে, যার শার্ট নেই, একটি দিয়ে দিতে হবে।' 'না, না, তা সম্ভব নয়, কারণ আমার মাত্র দুটি আছে, দুটিই আমার দরকার।'

স্বার্থজড়িত বোধ তেভাগা আন্দোলনে ভিন্নভিন্ন ভৌগোলিক চিত্র তৈরি করে। চল্লিশের দশকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের মত শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোক ভূস্বামী সংখ্যায় ও ব্যাপ্তিতে বেশী ছিল না। জোতদারদের অধিকাংশই সংস্কৃতি ও রক্তের দিক থেকে মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গের জোতদার থেকে ছিলেন পৃথক।

মুসলীম লীগ যুগের বর্গাদার বিল ১৯৪৯ সালে পুনরুজ্জীবিত করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি অর্ডিনান্স জারি করেন, সেটি পরে আইনে পরিণত হয়। মুর্শিদাবাদে থাকতে দুটি বিষয়ে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই, এই দুই বিষয়ের পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ ছিলুম। প্রথম, মুর্শিদাবাদে তেভাগা আন্দোলন ১৯৪৫-৪৬ সালে নামমাত্রভাবে হয়েছিল ভাগীরথীর পশ্চিমে সাগরদীঘি ও নবগ্রাম থানায়। এ দুটি থানার সবটাই ছিল ডাঙ্গা অর্থাৎ মালভূমি, ফসল ভাল হত না। হিন্দু ও নবাবী আমলে সেচের জন্য এখানে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিম বরাবর দীঘি খনন হত। এই দুই থানায় অধিকাংশ চাষীই ছিল হিন্দু সমাজের ধাঙড় ও অন্যান্য অনুন্নত জাতি, উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতাল ও কিছু ওরাঁও। দ্বিতীয় যে আবিষ্কার আমাকে স্তম্ভিত করে, তা ছিল ফজলুল হক আমলের বঙ্গীয় কৃষিঋণ মকুব আইন, যা নাকি ১৯৪২ সালের প্রথমে মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় আমি প্রায় সম্পূর্ণভাবে চালু হয়েছে দেখি, সে আইন ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তৃত অঞ্চলে প্রায় অশ্রুতই ছিল বলা যায়, কার্যকারিতার বিশেষ প্রশ্নই ছিল না। পাঠকের মনে থাকতে পারে এই আইনের বলে প্রজাদের জমি ঋণের পরিবর্তে জমিদার বন্ধকী তমসুক হিসাবে কুক্ষিগত করে বছরের পর বছর উপস্বত্ব ভোগ করতেন, সেই সঙ্গে চাষীর ঋণের বোঝা শোধ না হয়ে উল্টে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যেত। ঋণশোধের বদলে জমি ফেরত দেয়া দূরে থাকুক বাজেয়াপ্ত করেছিলেন বলা যায়, সেগুলি ঋণ-সালিশী বোর্ডের কল্যাণে এতদিনে সব ফেরত দেবার কথা।

বিহ্বলকর অভিজ্ঞতা

মালদা জেলায় এগারো মাস থাকতে না থাকতে বদলি হলুম। ইতিমধ্যে জয়তীর ছয় বছর পূর্ণ হয়েছে। তার শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন হলুম। ভেবে-চিন্তে স্থির করলুম দার্জিলিং-এর লোরেটো কনভেণ্টে ছাত্রী হিসাবে ভর্তি করিয়ে ছাত্রী আবাসে রেখে দেব। দরখাস্ত করে ভর্তির অনুমতি পাওয়া গেল। মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে এসে দার্জিলিঙের জামাকাপড় তৈরি করার জন্য আমরা তখনকার দিনের হোয়াইটএওয়ে লেডল' (এখনকার মেট্রোপলিটান বিল্ডিং) বাড়িতে, লোরেটোর নির্দেশ মত গেলুম। এই দোকান লোরেটো সংস্থার ছাত্রীদের জামাকাপড় তৈরি করত। মালদায় আম খেয়ে জয়তীর খুব গাবদা গোবদা ডল পুতুলের মত চেহারা হয়েছিল। হোয়াইটএওয়ে-র যে মহিলা পোশাক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি জয়তীকে দেখে মহাখুশী। দুহাতে তুলে তাকে আদর করে, দর্জিকে ডেকে বললেন, 'দার্জিলিঙ থেকে বছরের শেষে আরো বড় ও মোটাসোটা হয়ে আসবে, সুতরাং জামা তৈরির সময়ে ভিতরে যেন বাড়তি কাপড় যথেষ্ট থাকে, কারণ সেগুলি খুলে পরে বাড়াতে হবে।' বছরের শেষে কত মোটাসোটা হয়ে ফিরল পরে বলছি, তবে দর্জি এত কাপড় রেখেছিল যে বারে বারে বাড়িয়ে সে-সব জামা প্রায় তার সিনিয়র কেম্ব্রিজ পড়া পর্যন্ত যায়।

১৯৪৯ সালের প্রথমে আমরা জয়তীকে তার স্কুল পার্টির সঙ্গে শিয়ালদায় দার্জিলিং মেলে তুলে দিই। তখনও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে শিয়ালদা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত দার্জিলিং মেল চলত। তার একটি কারণ, পূর্ব-পাকিস্তানের বহু ছেলেমেয়ে পরেও বেশ কয়েকবছর পর্যন্ত দার্জিলিং ও কার্শিয়ঙের স্কুলগুলিতে পড়ার জন্য হয় শেয়ালদায়, না হয় পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যান্য স্টেশন থেকে উঠত। অবস্থা এত শান্ত ও প্রীতিময় ছিল যে উদ্বেগের কোন কারণ থাকত না, জয়তী প্রথমে কিণ্ডারগার্টেন ক্লাসে ভর্তি হয়, তবে সেই বছরের মাঝামাঝি প্রথম স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রোমশন পায়। মে মাসে মাদার সুপিরিয়রের কাছ থেকে চিঠি পাই জয়তীর জলবসন্ত হয়েছে। আমি উতলা হয়ে দার্জিলিং যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আভা নিরস্ত করে, বলে ভবিষ্যতে জয়তীকে ছেড়ে প্রায়ই থাকতে হবে, এখন আমি গেলে ওর মন উতলা হবে, স্কুলে ওর মন টিকবে না, আমরাও যখন তখন ব্যাকুল হব। তখন রাগ হয়েছিল, পরে আভার কতখানি আত্মসংযম ও ধৈর্য ভেবে মেনে নিই।

মাইনে করা অধস্তন ভূমিহীন মজুর চাষী, ভাগচাষী আর বন্ধকী চাষীমজুরদের অবস্থা বিষয়ে এতদিন পর্যন্ত আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবার তেমন সুযোগ হয়নি, এমন-কি মালদাতেও নয়। এ বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল মুখ্যত সেট্‌লমেণ্ট রিপোর্ট ও দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টে আবদ্ধ। যে ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মানুষের মনে কেটে কেটে দাগ রেখে যায়, যার কথা এখনই বলব, সে ধরনের অভিজ্ঞতা তখনও হয়নি। ১৯৪৯-এর নভেম্বরে যখন সরকার তেভাগা জারি করলেন, তখনও মুর্শিদাবাদের অবস্থা মোটামুটি শান্ত ছিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই একদিন সকালে সাঁওতাল, ওরাঁও ও ধাঙড়দের একটি বড় মিছিল নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানা থেকে আমার বাড়ি এসে হাজির। কয়েকজন মুখপাত্র তাঁদের দুঃখের কাহিনী বললেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সেই হল সুযোগ।

ভাগীরথী পেরিয়ে নবগ্রাম-সাগরদীঘির মধ্যে দিয়ে যে রাজপথ জঙ্গীপুর চলে গেছে তার মধ্যবিন্দুটি ছিল ক্লিষ্ট এলাকার কেন্দ্র। আগেই বলেছি এই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান আমলের বড় বড় সেচের দীঘি ছিল। তার মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ-বরাবর সাগরদীঘিটি খোঁড়া হয় বারো শতকে হিন্দু রাজার আমলে। প্রস্থে প্রায় সিকি মাইল, দৈর্ঘ্যে তার দেড় গুণ। পনেরো শতকে মুসলমান আমলে খোঁড়া হয় পুব-পশ্চিমবরাবর রায়খাঁ দীঘি। প্রস্থে প্রায় দেড়শ মিটার, দৈর্ঘ্যে প্রায় চারশ'। থানা দুটিতে প্রায় কয়েক বছর অন্তর প্রচণ্ড খরায় ফসল নষ্ট হত। জমি ছিল এঁটেল বা লাল কাঁকর মাটিতে ভর্তি, খুব উঁচু মালভূমির মত। সেজন্যই ছোটবড় বহু জলাশয়ের উপরে ছিল এই দুটি বড় জলাশয়। সেকালের রাজা-বাদশারা আর কিছুর দায়িত্ব নিন বা না নিন সেচের ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে বাধ্য হতেন, তা না হলে নিজেদের রাজকোষ শূন্য ও প্রজাবিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী।

এই রাস্তার উপর বারো মাইল তফাতে পর পর দশদিন অন্তর দুজায়গায় রাস্তার ধারে গাছের তলায় তাঁবু ফেলে আমরা একুশ দিন থাকি। দশ মাইলের দূরত্ব না হলে, আর দশদিনের বেশী একস্থানে থাকলে দৈনন্দিন ভাতা ছ'টাকা পাওয়া যেত না। সে ভাতা না পেলে তাঁবুর সংসারও চলত না। আভাকে আমাদের নিজেদের লোক রাখালকে শুধু খাওয়াতে হত তা নয়, আমার পিয়ন, ড্রাইভার ও দুই রক্ষীকেও খাওয়াতে হত। উপরন্তু স্থানীয় যে সাঁওতাল ও ধাঙড় যুবকদুটি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যেত তাদেরও দুপুরে খাওয়াতে হত। এই দুটি যুবক আমার কাজে অপরিহার্য নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

সাঁওতাল ছেলেটি ছিল ফর্সা, চোখদুটি কটা কিন্তু গড়নপেটনে একেবারে

সাঁওতাল। সেইজন্য সে অঞ্চলে তার নাম ছিল সাহেব মাঝি। সে তার মার সঙ্গে একা থাকত। রাস্তার উপরে সরু একচিল্‌তে জমির উপর ভাঙা কুঁড়ে, খড়ের চালাটিতে বড় বড় ফুটো। তা হলে কি হবে! বুক এত দরাজ ছিল যে চলে আসার আগে যেদিন আভা আর আমি তার বাড়িতে বিদায় নিতে গিয়ে তার মায়ের কাছে মুড়ি খেলুম, সেদিন মায়ের কথা শুনে ছেলে তড়াক করে নিচু চাল থেকে একটিমাত্র বড় চালকুমড়ো পেড়ে এনে মায়ের হাতে দিল, মা সেটি আভাকে দিলেন। সাহেব মাঝির গায়ের রঙ ও কটা চোখের জন্য তার মাকে কোনদিন কেউ কুৎসিত ইঙ্গিত করেনি বা কথা শোনায়নি, যা আমাদের সমাজে হতে পারত। সাহেব মাঝি আমাদের এত ভক্ত হয়ে গেল, মনে হত বিনা ওজরে সে আমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে। ধাঙড় ছেলেটির নাম ছিল বিজয় সরকার। লেখাপড়া শিখে ষাটের দশকের প্রথম দিকে সে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সে আমাকে আমার দিল্লীর ঠিকানায় বিজয়া ও ইংরেজি নতুন বছরে নিয়মিত চিঠি লিখত। তারও সংসারে তার মা ছাড়া কেউ ছিল না। বাড়ির ভিটা ছাড়া তাদের এক একরের মত ধানজমি ছিল।

নবগ্রাম-সাগরদীঘি থানায় আমি গেলুম মুখ্যত তেভাগা আইন চালু করতে। সরেজমিনে গিয়ে তেভাগার থেকে বন্দীর ঋণসালিশী আইনের কাজেই বেশি জড়িয়ে পড়লুম। গিয়ে দেখি গত বারো বছরে ঋণসালিশী বোর্ডগুলি প্রায় কোন কাজই করেনি। যে-সব জমিদার অধমর্ণদের জমি বন্ধকী তমস্থক করেছিলেন তাঁরা তখনও নির্বিবাদে সুদসমেত উপস্বত্বভোগ করছেন। উপরন্তু মাঝে মাঝে পুলিশের সাহায্যে জমি ক্রোক করিয়ে জমি বেমালুম আত্মসাৎ করে যাচ্ছেন। আমার বড় কাজ হল যতখানি পারি ঋণসালিশী বোর্ডের অসমাপ্ত কাজ কাজির বিচার চালিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে করতে এবং সেই সঙ্গে তেভাগার অর্ডিনান্সের প্রচার করে তার কাজ চালু করার জন্য দপ্তর বসাতে। সরকারকে বলে একজন প্রাক্তন ঋণসালিশী অফিসারদের সার্ক্‌ল্‌ কাজ থেকে আনিয়ে আমার সঙ্গে রাখলুম। তাঁদের সকলের এই কর্মসূচী যে খুব ভাল লেগেছিল তা বোধহয় নয়। তাঁদের কাজ ছিল, আবেদনপত্র গ্রহণ করে, নথিপত্র দেখে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে, অকুস্থলেই হুকুম জারি করা এবং পুলিশের সাহায্যে সে হুকুম তামিল করানো। এটি ছিল ফসল কাটার সময়, এবং অফিসারদের কাজ ছিল কাটা ফসল ভাগ করে, অর্ধেক ভাগচাষীকে দিয়ে, জমিদারের তরফ থেকে তার কাছ থেকে রসিদ নিয়ে, সেই রসিদের ভিত্তিতে জমির সেট্‌ল্‌মেণ্ট খতিয়ান ভাগচাষীর নামে রেকর্ড

করা। এই কাজে অবশ্য আমি সি-পি-আইয়ের সভ্যদের সাহায্য পাইনি, যদিও তখন পার্টি হিসাবে সি-পি-আই প্রকাশ্যে পুনরায় কাজ শুরু করেছে। এই কার্যসূচিতে আমি সবথেকে সাহায্য পাই, নতুন এস-পি গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে, যিনি এর আগে মালদায় আমার এস-পি ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে স্থানীয় পুলিশ স্থানীয় জমিদারদের উৎকোচ বা প্রলোভন উপেক্ষা করে, আমাকে বিশেষ সাহায্য করে।

আমি যে কারণে স্তম্ভিত, এমন-কি রাগে ও ঘৃণায় হতবাক হই সেটি গত বারো বছর ধরে স্থানীয় ঋণসালিশী বোর্ডগুলির কর্তব্যে অবহেলা দেখে। আগেই বলেছি তাদেরই সহকর্মীদের কৃপায় ১৯৩২ সালেই মুন্সীগঞ্জে সারা মহকুমায় ঋণসালিশীর প্রায় সমস্ত মামলার সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং ১৯৪৬ সালেই ঋণসালিশী বোর্ডগুলির কাজ সমাপ্ত হয়ে অধিকাংশ ঋণসালিশী অফিসার সাব-ডেপুটি চাকরিতে প্রোমোশন পান। কিন্তু একা নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানাতেই কুড়িদিনে কমপক্ষে একশ' ঋণসালিশী মামলায় কাজির বিচার করতে বাধ্য হই, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ঋণ শুরু হয় পনেরো থেকে ত্রিশ বছর আগে, অর্থাৎ ঋণসালিশী বোর্ড-প্রথা চালু হবার অনেক আগে। যে কয়টি মামলার আমি নিষ্পত্তি করি তার প্রতিটির অধমর্ণ ই ছিল হয় সাঁওতাল, না হয় ধাঙড়। জমিদাররা অবাধে তাঁদের কুকর্ম চালিয়ে যান, তার মুখ্য কারণ, অধমর্ণদের প্রায় সকলেই ছিল নিরক্ষর এবং সমাজের নিম্নতম স্তরের। নিজেদের অধিকার বিষয়ে ছিল অজ্ঞ, মাথা সোজা করে নালিশ করার ছিল না সাহস। আমি যদি আচমকা এই একশ'টি মামলায় হোঁচট খেয়ে না পড়তুম তাহলে আদৌ জানতুম না গ্রামসমাজের শোষণ কাকে বলে, কী তার রূপ, মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি ও লোভ কত নিচে নামতে পারে, অমানুষিক হতে পারে।

প্রায় প্রতিটি মামলার উৎপত্তি হয় বিশ দশকের গোড়া থেকে ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে। প্রতি মামলাতেই খাতক গড়ে আড়াই একর ধানজমি জমিদার বা জোতদারের কাছে কবালা করে বাঁধা রেখে বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা ঐ ধরনের সামাজিক দায়িত্বরক্ষার জন্য পাঁচ থেকে দশ টাকা ধার নেয়। বিশ দশকের পাঁচ টাকা আজকের দিনে প্রায় পাঁচশ' টাকার সামিল। একটি সরকারি স্ট্যাম্প লাগানো কাগজে খাতকের টিপসই ও সাথীদের সই নিয়ে জমিদার একটি বন্ধকী তমসুকের কবালা করিয়ে নিতেন যার জোরে তিনি মহাজন প্রতিমাসে টাকায় টাকা সুদ আদায় করতেন। কচিৎ এই হার মাসে টাকায় আটআনা হারে বাড়ত।

উপরন্তু সরল কুসীদের বদলে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ত। ঋণের ফলশ্রুতি হিসাবে জোতদার খাতকের জমি দখল করে চাষ ও ফসল ভোগ করতেন, অনেক সময়ে ভরণপোষণের নামে খাতককে দিয়েই বেগার চাষ করাতেন। এইভাবে ঋণের বোঝা ক্রমশ বেড়ে চলত। আসল মালিক তখনই জমি ফেরত পেতেন যদি তিনি আসল স্থদ মিলিয়ে সমস্ত টাকা ফেরত দিতেন। বলা বাহুল্য সে সৌভাগ্য খুব কম জীবনেই আসত। ফল সহজেই অনুমেয়। জমির মালিক ও তাঁর সন্তানসন্ততি অচিরেই নিজের জমিতে জমিদারের দাসে পরিণত হত। শুধু তাই নয়, ঋণের বোঝা উত্তরোত্তর বেড়েই যেত। আসল বা স্থদের শোধ হিসাবে জোতদার যে ফসল আত্মসাৎ করতেন তার দাম তিনিই ফেলতেন নামমাত্র দরে।

বন্ধকী ধানজমির আয়তন হত গড়ে এক একর। অতএব আসল ঋণের পরিমাণ হত গড়ে দুই বা তিন টাকা। বঙ্গীয় কৃষিঋণ আইন স্থদের সর্বোচ্চ হার সরল কুসীদ দরে বেঁধে দেয়। আইনে আরো নির্দেশ হল, যে-যুগেই ঋণ শুরু হয়ে থাক, সালিশীর সময়ে স্থদের হিসাব হবে সরল কুসীদ হারে, আগের চুক্তির মত চক্রবৃদ্ধিতে নয়। স্থতরাং ঋণসালিশীর কাছে অঙ্ককষা যথেষ্ট সোজা হয়ে গেল। যে বছরে ও তারিখে দেয়া হয়েছে, সেই তারিখ থেকে সরল হারে স্থদের হিসাব করতে হবে। আসলের সঙ্গে সেই হিসাবকৃত স্থদ যোগ করতে হবে। সেই যোগফল হবে স্থদে-আসলে মোট ঋণের অঙ্ক। যে কয়বছর জোতদার জমির উপস্বত্ব ভোগ করেছে সেই কয়বছরের ফসলের মোট পরিমাণ ও গড় বাজারদর নির্ণয় করে মোট উপস্বত্ব ভোগের পরিমাণ নির্ণিত হবে। সেই পরিমাণটি হবে বন্ধকী তমস্থক হারে ঋণবাবদ খাতকের শোধের পরিমাণ। এই শেষ অঙ্ক থেকে প্রথম অঙ্কটি অর্থাৎ সরল হারে স্থদ ও আসলের যুক্ত অঙ্ক বাদ দিলে বেরোবে খাতকের কাছ থেকে জমিদার ন্যায্য অর্থের থেকে কত বেশী টাকা আদায় করেছেন অন্যান্য বন্ধকী তমস্থকীভোগ বাবদ। একটি উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে। আমি একটি কেস পাই, যেখানে ১৯২২ সালে খাতক জমিদারের কাছে দুটাকা ধার নিয়ে জমি বন্ধক দেয়। ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে সেই ঋণ স্থদে-আসলে চারহাজার টাকায় ওঠে। উপরন্তু মালিক জমিদার সাতাশ বছর ধরে জমির ফসলের পুরো উপস্বত্ব ভোগ করেন, এবং চাষীকে প্রতিবছর খোরপোষ মজুরি হিসাবে যৎসামান্য দেন। একই প্রকারে, আরেকটি মামলায় ১৯৩৫ সালে দুটাকা ঋণের বোঝা, স্থদে-আসলে ১৯৪৯ সালে এসে দাঁড়ায় ১৫০০ টাকায়। তার উপর থাকে বন্ধকী জমির উপস্বত্ব।

পরশুরাম 'সব বন্ধকী তমস্সুক, দাদা' অধিকারীদের যে চিত্র এঁকেছেন, সাগরদীঘি-নবগ্রামের জমি বন্ধক রাখা জমিদারদের পক্ষে তা হুবহু খাটত। পোশাক, পরিচ্ছদে মনে হত নিতান্তই দুরবস্থা। দেহও শুষ্ক, জীর্ণ, অসুস্থ, শরীর অযত্নে রাখা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, পরনে জীর্ণ বস্ত্র। প্রতি মামলার নিষ্পত্তির সময়ে আমি স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্ট, স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক এবং থানা অফিসারের উপস্থিতির ব্যবস্থা করতুম, তাছাড়া থাকতেন ঋণসালিশীর কাজে অভ্যস্ত পরিণতবুদ্ধি সার্ক্‌ল্‌ অফিসার। এইসব ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে, উত্তমর্ণ, অধমর্ণের সই নিয়ে, ঋণের হিসাব বুঝিয়ে অধমর্ণকে জমি ফেরত দিয়ে মুক্তি দেয়া হত। তার সঙ্গে নির্দেশ হত পরের দিন সকালে অমুক সময়ে অমুক স্থানের অমুক গাছতলায় জোতদার যে উদ্বৃত্ত টাকা এতকাল ভোগ করেছেন সেই টাকা ফেরত দেবার জন্য নিয়ে আসবেন, একই সাক্ষীদের সামনে ও সই নিয়ে সেই টাকা অধমর্ণকে ফেরত দেবেন। এবং এই ফেরত দেয়া হবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে। যতক্ষণ না তিনি জীপে করে নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছচ্ছেন ততক্ষণ সকলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবেন। তাঁর সমুখে গুণে গুণে সাক্ষ্য নিয়ে টাকা অধমর্ণকে ফেরত দেয়া হবে।

১৯৪৯-এর নভেম্বরে, দীর্ঘ নয় বছর চাকরি করার পরেও, জয়ন্তীকে দার্জিলিং-এ পড়ানোর খরচ চুকিয়ে আমার এমন সঙ্গতি থাকত না যে সাতদিনের নোটিসে আমি পাঁচশ' টাকা বার করতে পারি। সুতরাং আমি যখন এইসব মামলায় একদিনের নোটিসে তিন-চার হাজার টাকা নগদ ফেরত দেবার আদেশ লিখতুম তখন আমি আশ্চর্য হয়ে যেতুম যে এই টাকার অঙ্ক শুনে জোতদারের মুখে বিন্দুমাত্র আর্তির ছাপ পড়তে দেখতুম না। জোতদারটি দেখিয়ে যখন আভাকে বলতুম, সে পরের দিন চার হাজার টাকা নগদ নিয়ে এসে ফেরত দেবে, তখন আভাই অবিশ্বাসের স্বরে আঁৎকে উঠে বলত, 'ঐ লোকটা! ও তো একশ' টাকারও মালিক নয়, কী করে তুমি ভাবলে ও চার হাজার টাকা আনবে? চার টাকাও আনতে পারবে না, দেখো!' আশ্চর্যের ব্যাপার, পরের দিন ভোরে সে ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে গাছের তলায় সযত্নে রেখে দেয়া হাজার টাকার নোটের তাড়া নিয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমি জানলুম দরিদ্রতম এলাকাতেও সাধারণত কত কাঁচা টাকা গ্রামের জোতদারদের হাতে সর্বদা মজুত থাকে, দেখতে তারা যতই দীনহীন হোক।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এ ধরনের তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি আজকের দিনে

একেবারেই সম্ভব নয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দল আজ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং জোতদারের এই টাকায় বখরা বসাবার জন্য নখদন্ত প্রয়োগ করে কোন সরকারি কর্মচারির এই ধরনের বিচারের বিরোধিতা করবেন, এমন-কি সরকারও। রাজনীতি ও ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার নামে বেমক্কা টাকা রোজগারের লোভ এত বেড়েছে, যে নৈতিক ন্যায় অন্যায় বোধও বিসর্জিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে এসব বিরোধিতা কিছুই হয়নি, যদিও জোতদারদের এই 'অপমানে' জেলার অনেক নেতা মনে মনে চটেছিলেন, অথচ মুখ ফুটে কোন আপত্তি জানাননি।

উনিশ দিনের দিন আমার একশ'-সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করে, তাঁবুবাসের পালা সাঙ্গ করে পরের দিন পুরো এলাকাটি শেষবারের মত চক্কর দেব ভাবলুম। পরের দিন বেলা একটা পর্যন্ত সবই বেশ নির্বিবাদে চলল। দুপুরে খাবার জন্য তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছি, এমন সময়ে জনাদশেক সাঁওতাল হঠাৎ আমার জীপের সমুখে দাঁড়িয়ে পড়ে নামার জন্য ইশারা করল। তাদের নালিশ হল সরকার থেকে উপজাতি এলাকার জন্য যে টিউবওয়েল মঞ্জুর করা হয় স্থানীয় জোতদার সেটি উপজাতি এলাকায় না বসিয়ে তিনমাস আগে নিজের বাড়ির সমুখের উঠোনে বসিয়েছেন। জোতদারের বাড়ি কাছেই, এক মাইলের মধ্যে। জীপে গিয়ে জোতদারকে ধরলুম, জোতদারদের যে ধরনের বর্ণনা আমি উপরে দিয়েছি, ঠিক সেই ধরনের এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। দেখেই মনে হয় ধূর্ত, ক্রূর, সুদখোর! ইতিমধ্যে ঘুরেফিরে টিউবওয়েলটি আমি পরীক্ষা করেছি। মনে হল সাঁওতালদের কথাই সম্ভবত ঠিক, নতুনই হবে, কারণ টিউবওয়েলটির গায়ে তখনও বড় বড় সবুজ ছোপ লেগে আছে। নতুন টিউবওয়েলে যে রং থাকে তাই। জানতে চাইলুম টিউবওয়েলটি তিনি কবে কিনেছেন, সেই সঙ্গে টাকার রসিদ, গ্যারান্টি কাগজ, ব্যাপারীর ঠিকানা দেখতে চাইলুম। কোন কাগজপত্র নেই, অথচ লোকটি বলেই চলল নিজের পয়সায় ওটি করিয়েছেন। তখন বেলা দেড়টা বেজে গেছে। সকালের খাটাখাটুনিতে আর খিদেয় সারা গা আর পেট জ্বলছে, নিষ্ফল তর্ক আর ভাল লাগছে না। আভা আমার হাত ধরে টেনে নেবার আগেই আমি সুদখোর বুড়োর বাঁ গালে টেনে এক চড় বসিয়েছি। যে বিশ্রী ঘটনা ঘটল তাতে হতভম্ব হয়ে গেলুম। চড় মারতে না মারতে পোকাখাওয়া একটা কালো কষের দাঁত ফটাং শব্দ করে মুখ থেকে বেরিয়ে মাটিতে কাঁকরের উপর ঠক করে পড়ল। মুখে আমার কথা ফিরে আসতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। সঙ্গের দারোগাকে

বললুম, উপজাতি তদারকি অফিসারকে জানিয়ে টিউবওয়েলটি তুলিয়ে সাঁওতাল গ্রামে যথাসম্ভব বসিয়ে দিতে।

স্থানীয় ও শহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভদ্রলোকদের পক্ষে ঘটনাটি স্বভাবতই সহ্যের অতীত হল। গাছ থেকে কোঁচড়ে টুপ করে পড়া পাকা ফলের সঙ্গে বুড়োর এই পোকাখেকো দাঁতটির তুলনা করা যায়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সিভিল প্রসিডিওর কোডের আশি ধারা অনুযায়ী একটি নোটিস আমার উপর জারি হল। প্রজাদের সমুখে যেভাবে অপমানিত হয়েছেন, তার জন্য, উপরন্তু দাঁতটি খোয়াবার জন্য, ভদ্রলোক পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে আদালতে কেস করার নোটিস দিলেন। ভাগ্যক্রমে আমার মামলা লড়তে হয়নি। তার আগে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকার থেকে পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেটের পদে নিয়োগের আদেশ এসে গেছে। ফলে মোকদ্দমাটি আর ওঠেনি।

ইতিমধ্যে কলকাতায় গিয়ে স্কুলফেরত জয়তীকে নিয়ে এসেছি। ধাঙর বিজয় সরকার আর সাঁওতাল সাহেব মাঝি প্রায়ই এসে আমাদের জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদায় হাত লাগাত। একদিন সকালে আভার সামনে বিজয় চাপ্‌টি খেয়ে বসে পকেট থেকে পাতলা গাঢ় বেগুনি রঙের কাগজের একটি ছোট্ট মোড়ক বার করল। এই ধরনের কাগজ তখনকার দিনে স্যাকরারা ব্যবহার করতেন, নতুন গহনা মুড়ে রাখার জন্য। ভয়ে ভয়ে সে মোড়কটি আভার সমুখে তুলে ধরে বলল, দিদির জন্য সে সামান্য একটি উপহার এনেছে। কী জিনিস হতে পারে ভেবে মোড়কটি খোলামাত্র অদ্ভুত স্বরে আভা এমন চিৎকার করল যে আমি নিচের অফিস থেকে দৌড়ে এলুম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি আভা বেশ বিচলিত হয়েছে; হাতে হার নিয়ে আভার হাত কাঁপছে, বলল 'দেখ, বিজয় কি করেছে?'

প্রশ্নের উত্তরে বিজয় স্বীকার করল সে তার এক একর জমির অর্ধেক বাঁধা দিয়ে টাকা তুলে 'দিদি'র জন্য এই উপহারটি বানিয়েছে। আমার চোখে জল আসে আর কি! মুন্সীগঞ্জের রফির কাছে আমি যে পুরস্কার পেয়েছি, যার কথা আগের খণ্ডে লিখেছি, তার মত এত বড় পুরস্কার খুব কমই পেয়েছি। একটি অফিসার ডেকে বিজয়ের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলুম তিনি যেন স্যাকরাকে হারটি ফেরত নিইয়ে বন্ধকী জমি খালাস করিয়ে বিজয়কে ফেরত দিয়ে আমাকে রিপোর্ট করেন।

ক্ষমতার প্রতাপে মানুষের চরিত্র দূষিত হয়। হুকুম দিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে আমি চুপি চুপি আরেকজন বিশ্বস্ত অফিসারকে পাঠালুম, গোপনে খোঁজ নিতে

বিজয় সত্যিই জমি বন্ধক রেখেছিল, না যেসব লোক আমার ঋণসালিশী অভিযানে উপকৃত হয়েছে, তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে এই সোনার হার গড়িয়েছে। আমাকে সাহায্য করার সময়ে অনেক খাতকের সঙ্গেই বিজয়ের আলাপ হয়, তাদের পক্ষে বিজয়কে এইটুকু আপ্যায়িত করা স্বাভাবিক। নিজের ছোট মন ও সন্দেহবাতিকে লজ্জিত হলুম এবং সেই সঙ্গে বিজয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল যখন জানলুম সে এসব কিছুই করেনি, সত্যিই নিজের জমি বন্ধক রেখে টাকা তুলেছিল। সামান্য কর্তব্য করার পরিবর্তে এত বড় পুরস্কার কপালে কমই জোটে।

বছরের ঘটনাবলী

সারা ১৯৪৯ সাল ধরে ইতিমধ্যে অনেক জল বয়ে গেছে। ২০ জানুয়ারি তাঁর অভিষেক ভাষণে প্রেসিডেন্ট ট্রুমান বিস্তারিতভাবে তাঁর চারপয়েন্ট সূচির উল্লেখ করলেন। অনুন্নত দেশগুলিকে কীভাবে সাহায্য করা হবে বললেন। 'অনুন্নত' কথাটি সুখশ্রাব্য করার জন্য 'উন্নতিশীল' কথাটি আন্তর্জাতিক ব্যবহারে তখনও চালু হয়নি। ১ ফেব্রুয়ারি বৃটেনে বস্ত্র রেশনিং শুরু হয়, অনুরূপ সময়ে কলকাতায় বস্ত্র রেশনিং বন্ধ করা হয়। ব্যাপারটি মনে আছে এই কারণে, বস্ত্র রেশনিং-এর সময়ে বাবা খাটো বহরের নয়-হাতি ধুতি পরতেন। রেশনিং চলে যাবার পর আবার পুরো বহরের দশ-হাতি ধুতি পরা শুরু করলেন। মাথাপিছু একবছরে নির্দিষ্ট বর্গগজ হিসাবে কলকাতায় বস্ত্র রেশনিং চালু হয়। বাবা সাধারণত পুরো বহরের থানধুতি পরতেন। রেশনিং-এর সময়ে খাটো বহরের ছোট দৈর্ঘ্যের ধুতি পরার স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি ছিল যে পুরো বহরের থানধুতি রেশনদোকানে আসত খুব কম। অতএব তাতে যদি তিনি ভাগ বসাতেন তাহলে বিধবাদের ভাগে থান-ধুতি কম পড়তে পারে। পুরুষ মানুষ খাটো বহরের ধুতি পরলে এসে যায় না—গান্ধীজি নিজে খাটো ধুতি পরে তাকে জাতীয় মর্যাদা দিয়েছিলেন—কিন্তু বিধবাদের পক্ষে খাটো থানধুতি লজ্জার কথা।

১৮ এপ্রিল আয়ারল্যাণ্ডে 'আয়ার' সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়, বৃটেন অবশ্য উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে দখল ছাড়েনি। একটি ছোট্ট প্রতিবেশী দ্বীপের উপর এত শ'বছর ধরে চরম অত্যাচার বৃটেন অন্য কোন দেশের উপর চালায়নি। ১২ মে বার্লিনের ঘেরাও বা ব্লকেড তোলা হয়। অল্প পরেই হয় পশ্চিম জার্মানিতে যুক্ত

সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা, রাজধানী হয় বন্। এরপর প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব-জার্মানির গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। ১ অক্টোবর চীনে জনগণের জনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার রাজনীতি ও মানসে ম্যাকার্থিবাদ অত্যন্ত বিকার সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। ২৬ নভেম্বর ভারতের সংবিধান পরিষদ ভারতের নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। বছর শেষ হয় ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েটনামের স্বাধীনতা দিয়ে।

১৯৪৮-এর মার্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সি-পি-আইকে যখন নিষিদ্ধ করে তখন আমি যে বিষয়ে উদ্বিগ্ন হই, নেহরু তাকে পরে অভিহিত করেন 'ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বকারী আইনের জোয়ার' বলে। স্মরণ করুন, তার পরেই ১৯৪৯-এর ৬ জানুয়ারি 'মধ্যভারত সাধারণ নিরাপত্তা আইন' পাস হয়। এর বলে মধ্যভারতের রাজ্য সরকার বে-আইনি কার্যকলাপে লিপ্ত অভিযোগে যে-কোন ব্যক্তিকে বে-ওজর জেলে আটক রাখার ক্ষমতা নিলেন। এইভাবে অল্পে অল্পে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার যে অভিযান শুরু হল, তার সঙ্গে যুক্ত হল কারণে-অকারণে শান্তিরক্ষার অজুহাতে জনসাধারণের উপরে পুলিশের গুলি চালানো। একই সঙ্গে আরেক আপদ দেখা দিল। প্রশাসনিক কর্মচারিদের মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রবণতা এল, ফলে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও আপামর নির্বিশেষে সমান বিচারের ঐতিহ্যে চিড় ধরল।

১৯৪৯-এর শুরুতেই একটি বিষাদের ঘটনা ঘটে : ২ মার্চ সরোজিনী নাইডুর মৃত্যু হয়। স্মৃতিকথার প্রথম খণ্ডে লিখেছি তাঁর প্রথম বক্তৃতা শুনি রংপুরে ১৯২৬ সালে। আসন্ন প্ল্যানিং বা যোজনা কমিশনের অগ্রদূত হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একটি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়, তার সভ্য হন কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদ্। ডাঃ জ্ঞানচাঁদ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পরিসংখ্যান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

১৯৪৯-এর ২৭ এপ্রিল লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীদের কনফারেন্সে একবাক্যে সকলে ভারতকে কমনওয়েলথের সভ্যপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। বলা হয় এই আমন্ত্রণ ভারত সাধারণতন্ত্র হবার পরও বহাল থাকবে। ১৯ জুন গণভোটে চন্দননগরের বাসিন্দারা ভারতের সঙ্গে এক হবার সপক্ষে ভোট দেন।

১৯৪৯-এর জুনে পশ্চিমবঙ্গে এক সঙ্কট ঘনিয়ে ওঠে। দক্ষিণ কলকাতার উপ-নির্বাচনে শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হন। এই পরাজয়ে উত্তেজিত হয়ে নেহরু প্রকাশ্যে বলেন, এই পরাজয় থেকেই বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা জনসাধারণের আস্থা হারিয়েছে।

নেহরু এই বলে শেষ করেন : কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয়েই 'আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলাদলি ও ষড়যন্ত্রে ঝাঁঝরা' হয়ে গেছে এবং ডাঃ রায় সে-অবস্থা সামলাতে অপারগ। নেহরু বললেন তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ গভীরভাবে রোগক্লিষ্ট। ২২ জুন কলকাতার রাস্তায় হাঙ্গামা ঘটার দরুণ পুলিশ গুলি চালায়, ফলে তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। নেহরু বললেন, 'যে সরকার জনসাধারণের আনুগত্য রাখার জন্য ঘনঘন গুলি চালাতে বাধ্য হয়, সে সরকার জনসাধারণের আস্থা নিশ্চয় খুইয়েছে।' নেহরু নিজে, এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা, কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে যদি তাঁর এই প্রতীতি দৃঢ়চিত্তে মেনে চলতেন, তাহলে কত ভাল হত !

এর ঠিক পরে ১২-১৪ জুলাই, নেহরু যখন কলকাতায় সফরে আসেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রকাশ হয়। ১২ জুলাই যখন তিনি শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় পার হয়ে শহরে ঢুকছেন তখন 'নেহরু ফিরে যাও' ধ্বনি ঘনঘন উচ্চারিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির উদ্দেশে ঢিল ও জুতো ছোঁড়া হয়। ১৪ জুলাইয়ের প্রকাশ্য জনসভায় তাঁর বক্তৃতাকালে পুলিশের দলকে উদ্দেশ্য করে একটি বোমা পড়ে, বিস্ফোরণে একটি পুলিশ মারা যায়, তিনজন আহত হয় !

দিল্লীতে ২২ জুলাই কংগ্রেসের কার্যকরী মিটিং-এ এই সুপারিশ হয় : (১) ছয় মাসের মধ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন হোক ; (২) ইতিমধ্যে রাজ্যে একটি নতুন অন্তরিম মন্ত্রিসভা গঠিত হোক ; (৩) রাজ্যে কংগ্রেসের একটি প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হোক। এই প্রস্তাবগুলির খুঁটিনাটিতে যাবার স্থান এ-বইয়ে নেই। আমি যে সবকিছু জানতুম তাও নয়। তবে এইটুকু মনে আছে তখন আমার মনে এইসব সুপারিশ গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি করে। গত তেতাল্লিশ বছরে অবশ্য দেশনেতাদের এই ধরনের অযথা বা অল্পে ভড়কানো, চিন্তাহীন হঠকারিতা জলভাতের মত আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

১৯৪৯-এর ২২ জুন ডাঃ বি-সি রায় নলিনীরঞ্জন সরকারের উপর মুখ্যমন্ত্রীর ভার অর্পণ করে ইওরোপ অভিমুখে যাত্রা করেন। তার প্রাক্কালে নেহরুকে তিনি যেসব চিঠিপত্র লেখেন এখন পড়ে মনে হয় তিনি নেহরুর ব্যবহারে আহত ও বিরক্ত হয়েছিলেন। ২ সেপ্টেম্বর তিনি ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে বিরোধী-পক্ষের জে-সি গুপ্ত প্রথমে যে বারো দফা অভিযোগ এনেছিলেন, তাতে আরো পাঁচটি দফা যোগ করেন। সবগুলি সম্বন্ধে নজির দলিল নেহরুকে পাঠিয়ে দেন। ডাঃ রায়ের অবর্তমানে নলিনীরঞ্জন সরকার পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে

অভিযোগগুলির স্খালনার্থে কৈফিয়ৎ ও যুক্তি, এবং প্রতিটি অভিযোগ সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সবকিছুই সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। ডাঃ রায় বিদেশ থেকে ফিরে বম্বেতে নেমে সেখানে সংবাদপত্রের এক বৈঠকে যেসব কথা বলেন, সে-সবই কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির বিরুদ্ধে জনমত সংহত করে।

১০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস বিধায়ক সমিতি ডাঃ রায়ের উপর আস্থা প্রকাশ করে। ভোট হয় স্বপক্ষে ৩৪, বিপক্ষে ১৪। দিল্লীতে ৪-৫ অক্টোবরের মিটিং-এ ডাঃ রায় তাঁর মন্ত্রিসভার স্বপক্ষে বিবৃতি ও কৈফিয়ৎ দেবার পর, একুশজন সভ্য সম্বলিত কেন্দ্রীয় কার্যবাহী সমিতি তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে।

এ-সব সত্ত্বেও কাগজে-কলমে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থেকে গেল। এরপর শুরু হল দীর্ঘকাল ধরে নেহরু, প্যাটেল ও রায়ের মধ্যে পত্রালাপ। শেষ পর্যন্ত নেহরু স্বীকার করলেন: (ক) পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের স্রোতে পশ্চিমবঙ্গ কত বিপর্যস্ত হয়েছে; (খ) পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন অনুপাতে কত কম অর্থসাহায্য, কত শ্লথগতিতে দেয়া হয়েছে; (গ) এইসব বিলম্বের ফলে পশ্চিমবঙ্গে কত অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে; (ঘ) উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান আসলে কেন্দ্রের দায়িত্ব; কেন্দ্রের থেকে সেই সমাধানের জন্য যে সাহায্য প্রাপ্য, সে সাহায্য প্রয়োজন অনুপাতে যেমন কম, তেমনি সর্বদা অতি বিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে।

এই সময়ে আমি প্রায়ই ভাবতুম, নেহরুর মাপের নেতা এত অল্পে এত বিচলিত কী করে হতে পারলেন! মনে পড়ল, দেশভাগের পর দিল্লীর দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে তিনি কীরকম ছেলেমানুষের মত বিচলিত হয়েছিলেন, এবং তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মাউন্টব্যাটেন কীরকম মুরুব্বিয়ানা করেছিলেন। মনে হত হঠাৎ যদি কোন বিদেশী শক্তি আক্রমণ করে, নেহরু কী মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত, সমাহিত ও শক্ত হাতে হাল ধরতে পারবেন? অবাক লাগল, উপনির্বাচনে শরৎ বসুর মত বিরোধী নেতার জয়ে এত বিচলিত হবার কী ছিল, যে তিনি বহু-কালের বিশ্বস্ত, প্রাচীন সহকর্মীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন দোষারোপ করলেন! যতই হোক, শরৎ বসু শরৎ বসুই, তাঁর নিজস্ব গুরুত্ব থাকবেই। তাছাড়া বাঙালীরা স্বভাবতই কারোর ভাল সহ্য করতে পারে না, সুযোগ পেলে কাদা ছুঁড়বেই। ডাঃ রায় অবশ্য আত্মসম্ভ্রম দেখিয়ে এই স্বল্পস্থায়ী অস্বস্তিকর অবস্থা কাটিয়ে উঠলেন। দুজনের মধ্যে দূরত্ব চলে গিয়ে বন্ধুত্ব ফিরে এল। তবে ঠিক এরই কিছু পরে রফি আহমদ কিদোয়াই-এর সঙ্গে নেহরুর বিচ্ছেদ আরো দুর্ভাগ্যময় হয়।

অবশেষে ১৯৪৯-এর শেষে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে নির্বাচনের জল্পনা শেষ হল। ইতিমধ্যে নতুন এক সংকট দুঃস্বপ্নের ছায়া ফেলল। সে সংকটে পাকিস্তান বিপর্যস্ত হল, তার ধাক্কা ভারতের উপরও পড়ল। ১৮ সেপ্টেম্বর বৃটেন হঠাৎ আইন করে তার পাউণ্ডের মূল্য আমেরিকান ডলার ৪·০৩ থেকে ২·৮০-তে কমিয়ে দিল। এই মূল্যহ্রাসের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের যে মোটারকম পাউণ্ড তহবিল জমেছিল সেটি ঝপ করে কমে গেল, ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধে ভয়ানক আঘাত লাগল, তার কারণ বৃটেনের পদানুসরণ করতে অস্বীকার করে পাউণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান তার মুদ্রামূল্য কমাতে রাজি হল না।

১৯৫০-এর ২০ ফেব্রুয়ারি শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ এক মহান ব্যক্তিত্ব হারাল। উপরন্তু তিনি ছিলেন অতি উচ্চস্তরের দেশাভিমানী রাজনৈতিক নেতা, সর্বদা সবদিক বিচার করার পর পদক্ষেপে অভ্যস্ত, তার সঙ্গে ছিলেন অনমনীয় স্বাধীনতা যোদ্ধা, একাধারে বিশ্বস্ত বন্ধু এবং দুর্ধর্ষ বৈরী অথচ বিন্দুমাত্র নীচতা ছিল না। দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী, সকলের কথা মন দিয়ে শুনতে সর্বদাই প্রস্তুত।

জেলাজীবনের উপসংহার

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের একান্তে মালদায় থাকার সময়ে নতুন ভারতে বহুমুখী প্রচেষ্টার মধ্যে দামোদর উপত্যকা উদ্যোগের পুরো সংবাদ বা তার তাৎপর্য সম্বন্ধে আমার সম্যক বোধোদয় হয়নি। তা সত্ত্বেও আমার ধারণা ও গর্ব ছিল, যে যদি কোন লোক একক অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টায়, খুঁটিনাটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বলে, আদর্শনিষ্ঠায় এবং দেশাত্মবোধে এই উদ্যোগের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে থাকেন তিনি ডাঃ মেঘনাদ সাহা। বছরের পর বছর নীরবে খেটে তিনি টেনেসি ভ্যালি উদ্যোগের আদর্শে দামোদর উপত্যকা সম্বন্ধে একটি বিরাট তথ্যসম্বলিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ আর্জি তৈরি করেছিলেন।

১৯৪৮ সালে সংবিধান সংসদ এই বহুমুখী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বলিত প্রস্তাবগুলি পাকাপাকিভাবে অনুমোদন করে। ঠিক হয় মোট পঞ্চান্ন কোটি টাকা খরচে, এই উপত্যকায় ভবিষ্যতে বন্যার আশঙ্কা রদ করা যাবে। তার পরিবর্তে আটলক্ষ একর জমিতে ভাল সেচের ব্যবস্থা হবে এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে তদানীন্তন

বিজলির চাহিদা পূরণ করবে। সংকল্পে লেখা ছিল, দামোদর নদীর উৎস থেকে হুগলী নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত সমগ্র এলাকা জুড়ে এই প্রকল্প কার্যকরী হবে। এটির নাম হল দামোদর ভ্যালি স্কীম। নির্বাহ করার অধিকরণের নাম হল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। ইতিমধ্যে ওড়িষ্যায় হিরাকুদ বাঁধ চালু হয়েছে।

দামোদর ভ্যালি স্কীম কীভাবে রক্তমাংসের আকার ধারণ করল তা স্বচক্ষে দেখলুম যখন ১৯৪৯ সালে মুর্শিদাবাদে গিয়ে ময়ূরাক্ষী সংকল্পের প্রারব্ধ কাজের সঙ্গে পরিচয় হল। কান্দী মহকুমায় রাঢ়ের ডাঙাজমিতে সেচের জন্য বড় বড় বিস্তৃত খাল খোঁড়া হয়েছে দেখে আনন্দে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হল, হাঁ, এইবার দেশের কিছু হচ্ছে বটে। পশ্চিমবঙ্গের সেচবিভাগের এঞ্জিনিয়াররা নিজেদের ঢাকঢোল না পিটিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছেন। মেসাঞ্জোরে একটি নতুন ধরনের মাটি ও পাথর দিয়ে বাঁধ তৈরি হচ্ছে। এ-ধরনের মাটি ও পাথর দিয়ে অত বড় বাঁধ আগে তৈরি হয়নি। এই বাঁধের জন্যে কানাডা থেকে সাহায্য আসার দরুণ এর নাম দেয়া হল কানাডা বাঁধ। এই বাঁধ থেকে দু'হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সৃষ্টি হবে, সেই সঙ্গে সম্ভব হবে ছ'লাখ একর জমির সেচ: মুখ্যত বীরভূম জেলায়, তার সঙ্গে বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার অংশে। সিউড়ি শহরের কাছে তিলপাড়া বাঁধ আর তার সেচখালগুলি ধার্য তারিখের দু'বছর আগেই শেষ হয়। ফলে ১৯৫১ সালের ২৯ জুলাই, ডাঃ বি-সি-রায় সে বাঁধটির উদ্বোধন করেন। তার তুলনায় যদিও ডি-ভি-সির পরিকল্পনাটি অনেক আগেই কাগজে-কলমে সম্পূর্ণ করা হয়, তা সত্ত্বেও তার প্রথম বিজলী উৎপাদন কেন্দ্র আর প্রথম বাঁধ—বিহারের তিলায়া—তৈরি হতে আরো আড়াই বছর লাগে। ১৯৫৩-এর ২১ ফেব্রুয়ারি নেহরু এই দুটির উদ্বোধন করেন। দামোদর উপত্যকায় সবশুদ্ধ ছ'টি বাঁধ তৈরি হয়: তিলায়া, কোনার, বোখারো, মাইথন, পাঁচেট পাহাড় আর দুর্গাপুর।

১৯৪৯-এর শেষে নতুন ধরনের কাজে যোগ দেবার প্রাক্কালে, কলকাতায় কার্যোপলক্ষ্যে এই প্রথম বাস করতে যাবার আগে, ভাবলুম, ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পুরো নয় বছরের কাজে আমার জীবনে বা চেতনায় কী লাভ হয়েছে। প্রথমেই মনে হল স্বাধীন ভারতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। চাকরি যখন শুরু করেছিলুম তখন তো এ বিষয়ে মোটেই নিশ্চিত ছিলুম না। কুকুর যেমন নতুন পরিবেশে এসে নাক তুলে বারবার হাওয়া শোঁকে, ঠিক তেমনভাবে আমি যেন চন্দননগরে, বিশেষত মালদায়, স্বাধীনতার নতুন হাওয়া

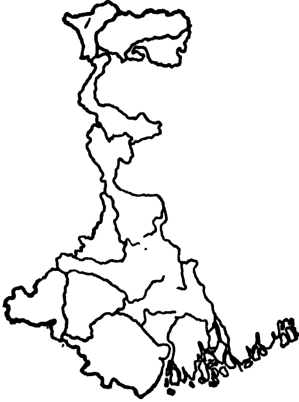
শুঁকতুম। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের ক্ষত মন থেকে অনেকটা শুকিয়ে গেছে, তার সঙ্গে গেছে ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি, শেষে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচার ও অঙ্গহানি। যদিও সে-সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানার ঠিক বাইরে, নদীয়া জেলার ধুবুলিয়ায়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিত্যক্ত বিমানবন্দরে বিরাট উদ্বাস্তু শিবির ভয়ঙ্কর অ্যাটম বোমার মেঘের মত দিনে দিনে ফুঁসে উঠছে। জেলা অধিকারিকের কাজে নিযুক্ত থেকে জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়ে আমি মনে মনে ধন্যবোধ করি, সেই সুযোগে জানতে পারি দেশের মাটির তৃণমূলের জীবন কীরকম, কী তাকে বাঁচায়, কী তাকে বিপন্ন করে। সাধারণ নাগরিকের মানবাধিকার, আত্মসম্মান কিসে আসে সে সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ এবং তাতে বিশ্বাস আমার দৃঢ় হল। আরো ধারণা হল কী কী অবস্থায় সে বোধ খর্ব হয়; তার বিরুদ্ধে এল প্রচণ্ড ক্রোধ। ১৯৪০ সালে জীবনের শুরুতে বুঝেছিলুম ভিজিটিং কার্ডে আমার নামের পরে ছাপা তিনটি অক্ষরের জোরে আমি যে-কোন দরজাতেই অনায়াসে প্রবেশ পেতে পারি, তা যতই সাধারণের নাগালের বাইরে হোক। কিন্তু সমাজের সবথেকে নিচের তলে কী করে ঢুকতে হয়, সেখানে কী করে সাদর অভ্যর্থনা পেতে হয় শিখতে গেলে আমাকে বিশেষ অনুশীলন করতে হবে। এই নয়-দশ বছরে আমি মোটামুটি জেনেছি কী জানতে হলে, শিখতে হলে, পেতে হলে কোথায়, কেমন ভাবে খুঁজতে হবে, দেখতে হবে, কীভাবে বাস্তবজীবনের সমস্যা সম্বন্ধে আসল জ্ঞান হতে পারে, কীভাবে সে-সবের সমাধান সম্ভব। একান্ত অসমান যুদ্ধে নিপাতিত মানুষের জন্য কিভাবে লড়াই করা প্রয়োজন এবং তা করতে হবে, তার জন্যে কপালে যদি অপবাদ ও দুর্নাম জোটে তাও স্বীকার।

জীবনের এই ক্রান্তিকালে যে কাজে কলকাতায় যাব ভেবে, ১৯৪০ সালে লণ্ডনে রজনী পাল্‌মে দত্তের সঙ্গে আলাপে তাঁর মুখে আই-সি-এসদের সম্বন্ধে প্রথম প্রশংসা বাণীটি মনে পড়ে গেল: ভারতবর্ষের যে-কোন বিষয়ের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আই-সি-এসরা একক গোষ্ঠী হিসাবে সবথেকে বেশী অবদান রেখে গেছে। উপরন্তু সে জ্ঞান সাধারণের-বোধগম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে সেই ধরনের জ্ঞান সেন্সাসের কাজে আহরণ করে নতুনভাবে লিপিবদ্ধ করব, সেই হল আমার আদর্শ। সেই সূত্রে আমার ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা হল সেন্সাসের শেষে এই রাজ্য সম্বন্ধে এমন একটি বিশদ বিশ্লেষণমূলক রচনার সৃষ্টি করে যাব যা নাকি আমার পূর্বসূরীদের কাজের পাশে সম্মানের আসন পেতে

পারে। যখন ১৮৭২ থেকে প্রতিদশকে একে একে সেন্সাস অধিকারীদের নাম ও তাঁদের কাজের কথা মনে হল—(প্লাউডেন) বেভার্লি, বুর্ডিলন, রিজ্‌লি, গেট, ও'ম্যালি, ভাষাবিদ গ্রিয়ার্সন—তখন মাথা বিনয়ে ও শ্রদ্ধায় আপনিই নত হয়ে যেত। তা সত্ত্বেও মনে মনে লোভ হত। তবে একটি বিষয়ে আমার বেশ আত্মবিশ্বাস এসেছিল, বিশেষত ১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষ লড়ার ফলে। যে-কোন জটিল অবস্থায় কী করে উপযুক্ত সহকর্মীর দল জড়ো করে, অচ্ছেদ্যভাবে একসূত্রে গেঁথে, তাদেরকে প্রাণমন উৎসর্গের জন্য তৈরি করতে হয়, তার উত্তর আমি আয়ত্ত করেছি।

কিছু চরিতার্থতা : জনগণনা ১৯৫১

ভূমিকা



পৃথিবীতে যে-সব দেশে জনগণনা সংগঠিত ও বিশ্লেষিত হয় তাদের মধ্যে ভারতের জনগণনা নিঃসন্দেহে সবথেকে বড় ও জটিল কাজ। চীন দেশে সম্প্রতি এ-কাজ শুরু হয়েছে এবং সে দেশের কয়েকটি গণনার ফলাফল ও বিশ্লেষণের কাজ মনে রেখেও বিনা দ্বিধায় এ দাবি করা যায়। কারণ চীন যদিও মোট লোকসংখ্যায় ভারতের থেকে এখনও অনেক এগিয়ে, এবং তার আয়তনও ভারতের থেকে অনেক বেশী, তবুও ভারত বহুবিস্তৃত নানা জটিল সারণি ও বিশ্লেষণ প্রস্তুতি ও প্রকাশে এখনও অগ্রগণ্য। গত শতকে ডব্লিউ-সি প্লাউডেন, ডব্লিউ-ডব্লিউ হাণ্টার প্রভৃতিরা বহু পরিশ্রম ও সুদূরদর্শিতা ব্যয় করে জনগণনার মাধ্যমে এ দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চিত্রের উদ্ঘাটনকল্পে এক বৃহৎ সংগঠনের ভিত্তিস্থাপন করেন। প্রতি দশ বছর সারা ভারতের জাগতিক ও নৈতিক অবস্থা কীভাবে বদলেছে ও বদলাবে তার একটি তুলনামূলক চিত্রসৃষ্টির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের যুগে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান উপদেষ্টা অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে, এবং তাঁর সময় থেকে প্রতি দশকের সেন্সাস কমিশনারের সাহায্যে জনগণনার উদ্দেশ্য, আহরণ ও পরিবেশনব্যবস্থার পুনঃসংস্কার হয়, যার ফলে জনগণনার ফলাফল যথাযথভাবে দেশের সামাজিক ও ভৌগোলিক যোজনার উন্নতিকল্পে প্রধান উপাদানে পরিণত হয়। সেই উদ্দেশ্যে প্রতিটি গ্রাম থেকে শুরু করে সমগ্র দেশের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং প্রাদেশিক ধাপে ধাপে যাবতীয় পরিসংখ্যান একই ছাঁচে গ্রথিত করে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে জনবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বহু দক্ষ ও পারদর্শী পণ্ডিতের সংখ্যাও

বৃদ্ধি পায়। সারা পৃথিবীময় তাঁদের চাহিদা বাড়ে, বিশেষ করে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিশ্বব্যাংকে, আই-এম-এফ প্রভৃতি জগদ্ব্যাপী সংস্থায়।

অনেকের ধারণা নেই, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মধ্যে যাঁরা এই দশসালা জনগণনার কাজে নিযুক্ত হতেন, তাঁরা এই কাজের দরুণই সতীর্থদের মধ্যে বিশেষ সম্মানের আসন লাভ করতেন। কাজের চরিত্রই এমন ছিল, যে কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁদের কৃতিত্ব ফুটে উঠত। তার কারণটি সরল ও স্পষ্ট : কেন্দ্র বা প্রদেশের যে-কোন স্তরের কথাই বলুন, প্রতি দশ বছরে সরকারের সর্বোচ্চ অর্থাৎ সেক্রেটারির পদে অন্তত দু'শ' জন অফিসার নিযুক্ত হতেন, এবং সেই সঙ্গে প্রতি প্রদেশে অন্তত পাঁচ জন সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার একের পর এক নিযুক্ত হতেন। এঁরা সকলেই হতেন বাছাই-করা অফিসার। কিন্তু তাঁদের, বিশেষত সেক্রেটারি-দের কাজ পরবর্তীকালে লোকে খুব মনে রাখত না। একমাত্র ঐতিহাসিক গবেষকের কাছে হয়তো তাঁরা পরিচিত থাকতেন। এরই মধ্যে প্রশাসনে যাঁরা কার্যগতিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন তাঁদের সংখ্যা হত অল্প। অন্যদিকে প্রতি প্রদেশে বা কেন্দ্রে দশবছরে মাত্র একটি সেন্সাস অধিকর্তা বা কর্তা সম্ভব হত, যাঁর কাজ সেই দশবছরের পক্ষে তখন ও পরে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হত। বিশেষত, কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দশকে দেশের ও জনগণের অবস্থা কীরকম ছিল সে-বিষয়ে যাঁরা গবেষণায় ব্যাপৃত তাঁদের মধ্যে। এই কারণে আমার মনে উচ্চাভিলাষ জাগল ভারতের বা তার কোন প্রদেশে বিশ শতকের মাঝামাঝি সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা কীরকম ছিল তা যদি কোন পাঠক বা গবেষক জানতে চান, তবে তাঁদের পক্ষে আমার কাজের মূল্য কোনদিন ম্লান হবে না। রজনী পাল্‌মে দত্ত ১৯৪০ সালে লণ্ডনে আমাকে যা বলেছিলেন সেটি হল আমার বীজমন্ত্র। সেন্সাস কাজের আরেকটি আকর্ষণ ছিল। সেন্সাসের কাজে সরকারি হাঁকডাক কম, সুতরাং মনে অফিসারসুলভ হামবড়াভাবের আশঙ্কা কম। যাঁরা লোকচক্ষে থাকতে চান, তাঁদের এ-কাজ ভাল লাগা স্বাভাবিক নয়, এ-কাজ তাঁরা নির্বাসনের সামিল মনে করবেন। ফলে অন্যকাজে থাকার তুলনায় এ-কাজে থাকার মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়, কারণ এ-কাজের জন্য প্রার্থীসংখ্যা কম। আপনি আপনমনে নিজের পরিতৃপ্তিমত কাজ করার সময় পেতে পারেন।

অন্যদিকে জনগণনার কাজ ছিল যেমন পরিশ্রমের তেমনি ঝঞ্ঝাটের। বাঁধা গতের সরকারি কাজের থেকে ছিল কয়েকগুণ শ্রমসাধ্য, উপরন্তু সমস্ত কিছু বোঝা

একা কাঁধে বইতে হত, অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার উপায় ছিল না। ভারতীয় সেন্সাসের ইতিহাসে এমন সেন্সাস খুবই বিরল যেটিতে অন্তত একজন সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও কাজের মাঝখানে অথবা শেষ হবার আগে অসহ্য পরিশ্রমের বলি হয়ে প্রাণ হারাননি। ইওরোপীয় রূপকথার ফিনিক্স পাখির মত ছিল সেন্সাসের জীবন। প্রতি দশবছর আগের দশকের চিতাভস্ম থেকে নতুন কাজ ফিনিক্স পাখির মত নতুন করে জন্মে, পরের দু'বছর পূর্ণ মহিমায় পাখা মেলে নিজের প্রতিষ্ঠা জারি করে, আবার নীরবে, সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপনের পর, নিজেরই চিতাভস্মে বিলীন হয়ে যেত। কাজটি এত নিঃসঙ্গ ও শ্রমসাধ্য যে অনেক অফিসার কাজ সম্পূর্ণ করার আগেই মারা যেতেন।

১৯৩১ সালে আমার বয়স তখন চোদ্দ। ঐ সালের সেন্সাসের পর আমার বাবা ও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে সেই বছরের সেন্সাসের প্রাথমিক ফলাফলের আলোচনা শুনে ভবিষ্যতে সেন্সাসে কাজ করার বাসনা জন্মায়। এই বাসনা দৃঢ় হয় ১৯৪১ সালে কুষ্টিয়ায় জনগণনার কাজে ভাগ নেবার পর। সেই থেকে আমার ইচ্ছা হয় আমার প্রদেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভাণ্ডারে যদি আমি এমন কিছু অবদান রেখে যেতে পারি যা নাকি ভবিষ্যতে লোকে মনে রাখবে। সেই কামনাসিদ্ধির জন্য বর্তমানে যদি সতীর্থদের কাছে এই অকিঞ্চিৎকর কাজে নিয়োগের জন্য উপেক্ষা বা অনুকম্পা পাই, তাও সই। লোকে যদি ভাবে সরকার আমাকে অনুপযুক্ত মনে করে নগণ্য কাজে দূরে আধোছায়ায় ঠেলে দিয়েছেন, তাও স্বীকার।

লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করার অনিচ্ছা ছাড়াও, এই কাজের বিরুদ্ধে আরো গুরুতর যুক্তি কাজ করত। কাজটি ছিল কেন্দ্রের গৃহমন্ত্রণালয়ের অধীনে। কলকাতায় কোনদিনই হোমমিনিস্ট্রির বড় বা কর্মিবহুল দপ্তর ছিল না, যার থেকে নতুন দপ্তর বাঁধার সাহায্য পাওয়া সম্ভব। কাজে কাজেই আমার মিনিস্ট্রি প্রত্যাশা করত আমি নিজের চেষ্টায় কেন্দ্রের ও প্রদেশের অন্যান্য দপ্তরের সাহায্য আদায় করব। অন্যান্য কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে বিশেষ কিছু আশা করা বৃথা। কারণ দেশ স্বাধীন হবার পর প্রতিটি দপ্তর নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। অন্যদিকে সেন্সাসের কাজে প্রদেশিক সরকারের সাহায্য ছাড়া একপাও নড়া সম্ভব নয়। মাথার উপরে মুখ্যমন্ত্রী ও চীফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে, একেবারে তলায় গ্রামের স্কুল মাস্টার থেকে চৌকিদার পর্যন্ত। অতএব আপনার সমুখে ছিল বিরাট এক পরীক্ষা। আপনার যত কিছু ওজন, শক্তি, লোকের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া ও মনভেজানো

ক্ষমতা সবকিছুরই উপর টান পড়ত কী করে আপনি কেন্দ্র ও প্রদেশের দপ্তরগুলিকে সুখী রেখে নিজের কাজ ঠিক সময়ে ভালভাবে তুলতে পারবেন। সেন্সাসের কাজের ধারা প্রায় দিন ও ঘণ্টা ধরে বাঁধা, তার থেকে নড়চড়ের উপায় নেই। সেই ধারা শুধু একটি ধারা নয়; নানা ধারার সমষ্টি, প্রত্যেকটির আবার নিজের নিজের দিন ও ঘণ্টা বাঁধা। প্রত্যেকটি অপরটির সঙ্গে ঠিকমত সময় মিলিয়ে নিলেই তবে এমন একটি সামগ্রিক ধারা তৈরি হবে যার কৃপায় শেষফলগুলি নির্বিঘ্নে আপনার দপ্তরে আসবে। গুণে দেখলে সব বিভিন্ন ধারার সমষ্টি প্রায় ত্রিশটি হয়।

জেলায় কাজ করার সময়ে সবকিছু আপনার মুখের সমুখে জুগিয়ে দেবার রেওয়াজ ছিল। প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি কর্মি কিছুদিনের মধ্যেই জানত আপনি কী চান, কী পছন্দ করেন, সেইমত আগে থেকে করে দিত। একটি ছোট উদাহরণ দিই, আপনি খাসকামরায় বসে কোন ভদ্রলোককে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন, তার শেষে গাড়ি করে আপনার বেরনোর কথা। আগন্তুককে নমস্কার করে, আপনি চেয়ার থেকে উঠে বিদায় দিচ্ছেন দেখামাত্র দরজার বাইরের দ্বারী ড্রাইভারকে খবর দিল। ভদ্রলোক ঘর ছাড়ার আগে আপনার দ্বারে আপনার গাড়ি এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে আপনি যেখানে যাবেন, যদি ফোন থাকে সেখানে খবর গেছে আপনি ক' মিনিটের মধ্যে পৌঁছচ্ছেন, সেখানে আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্য লোক প্রস্তুত। বিপদহরণ নাজির সর্বত্র বিরাজ করতেন, ফলে আপনাকে যাকে বলে কুটিটি নেড়ে দুটি করতে হত না। কিন্তু সেন্সাস করতে এসে প্রতিটি কাজ নিজে না করে উপায় ছিল না। কাজে যোগ দিয়ে লেখার প্রথম কাগজটি, টাইপরাইটার, কার্বন, পিন, ভিক্ষা বা ধার করে শুরু করা থেকে, মহাফেজখানা থেকে আগেকার সেন্সাসের নথিপত্র পর্যন্ত নিজের হাতে উদ্ধার করতে হত। এমনকি চেনাজানার জোরে প্রাদেশিক অফিসের থেকে সরকারি ডাকটিকিট শুদ্ধ ভিক্ষা করে নিয়ে আপনাকে চিঠি ডাকে দিতে হত। আমার ভাগ্য ভাল ছিল। রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ডাক অফিসকে তুষ্ট করে আমাকে ডাকে চিঠি দেবার ব্যবস্থা করতে হল। আজকালের অর্থে তুষ্ট নয়, মিষ্টি ব্যবহারে তুষ্ট করা।

সবথেকে মুস্কিল হল, প্রাদেশিক কর্মচারিদের কেন্দ্রীয় পূর্তবিভাগের সঙ্গে আগে থেকে আলাপ না থাকায় সে দপ্তর থেকে বাসের জন্য বাড়ি বা ফ্ল্যাট পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। অথচ বাসস্থানের ব্যবস্থা না করলে, প্রথমেই ঠিকমত সংসার গুছিয়ে বসতে না পারলে, নতুন কাজে মন বসানো দুষ্কর। নানা বিপত্তি ও সমস্যা

লেগেই থাকবে। তা ছাড়া সরকারি কাজের জন্য সরকারি গাড়ি থাকে না। কলকাতার সেন্সাস.দপ্তরে নয়বছর থাকাকালে সেন্সাসের নিজস্ব কোন গাড়ি ছিল না, রাজ্যের সহকর্মিদের কৃপায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গাড়িই ছিল সম্বল। ১৯৫৮ সালে সেন্সাস কমিশনার নিযুক্ত হয়ে আমি প্রতি রাজ্যে সেন্সাস দপ্তরের নিজস্ব গাড়ির ব্যবস্থা করি। ১৯৫১-র সেন্সাসের সময়ে পকেটে এত পয়সা থাকত না যে পেট্রোল কিনে নিজের গাড়িতে এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে ছোটাছুটি করি। উপরন্তু ড্রাইভার না থাকলে নিজের গাড়িতে যাওয়া সবসময়ে নিরাপদ হত না, গাড়ির যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম চুরি যাবার ভয় থাকত। বাধ্য হয়ে বাস-ট্রাম ধরতে হত, সময়সাধ্য হত, যদিও বাসে-ট্রামে এখনকার মত ভীড় হত না।

প্রথম কয়েকমাসের পরিশ্রম, চিন্তা ও ধকলে শরীর মন জীর্ণ হল। দৌর্বল্য বিশেষ হয়নি, কিন্তু চিন্তায় পেটে ঘায়ের মত হয়ে হজমের গোলমাল শুরু হল। দেড় বছর কাজ করার পর ১৯৫১ সালে জনগণনা শেষ হবার পর জামাইবাবু আমাকে স্কুল অভ ট্রপিকাল মেডিসিনে ভর্তি করে নেন। তিনি আমাকে সারিয়ে তোলেন। ১৯৫০ সালের প্রথম ছয় মাসে চিন্তায়, উদ্বেগে, একলা সমস্ত কাজ করে, তদুপরি দপ্তরে সম্পূর্ণ অপরিচিত, নতুন কর্মিদের কাজ শিখিয়ে কাজ শুরু করার পরিশ্রমে ও চিন্তায় আমার সময়ে সময়ে এমন উদ্বেগ ও হতাশা আসত যে প্রথম বছরের গোড়ার দিকে এ-ডি-এম হিসাবে হাওড়ায় দাঙ্গা বন্ধ করার কাজ শেষ হলে, নতুন চীফ সেক্রেটারি এস-এন রায় আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলেন আমি দার্জিলিং-এ ডেপুটি কমিশনার পদে যেতে রাজি আছি কি না, তখন আমি প্রায় রাজি হয়ে গেছলুম। সেই সময়ে আভা যদি বিশেষ জোর করে আমাকে নিরস্ত না করত; নিজে আগ্রহ করে এসে কাজ শুরু হতে না হতেই কাজ ছেড়ে পালানো গর্হিত ও কাপুরুষোচিত হবে একথা জোর করে না বলত, তা হলে হয়তো আমি কাজ ছেড়ে চলে যেতুম, কিন্তু পরবর্তী জীবনে বিবেকের দংশনে নিজের কাছে চিরকাল ছোট হয়ে যেতুম। ওদিকে সেন্সাস কমিশনার আর-এ গোপাল-স্বামী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আপত্তি জানিয়ে আমার স্থানান্তর বন্ধ করেন। সেন্সাস কাজের শুরুতে প্রায় পুরো দেড় বছর এই ধরনের একান্ত নিঃসঙ্গতা প্রথম থেকে আমাকে সেন্সাস দপ্তর স্থায়ী করার প্রয়াসে বদ্ধপরিকর করে। যদি দপ্তর স্থায়ী নাও করতে পারি, আমার উত্তরাধিকারী আমার কাছ থেকে সাজানো দপ্তর ও সুশিক্ষিত কর্মিদের পাবেন, এই ছিল আমার লক্ষ্য।

পরজীবীভুক-বৃত্তি

১৯৫০ সালের ৮ জানুয়ারি সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে যোগ দেবার আগে থেকেই আমি চেয়েচিন্তে জোগাড় বা আদায় করা শুরু করি। ডাঃ বি-সি রায়, চীফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন, অর্থসচিব বিনয়কুমার দাশগুপ্ত সেন্সাস কাজে কেন্দ্র ও প্রদেশের গণ্ডীরেখা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন বা তাঁদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না, একথা মনে করা মোটেই ঠিক হবে না। সুতরাং, আমাকে তাঁরা যেভাবে সমস্ত সাহায্য ঢেলে দিলেন, তার মূলে ছিল, স্বাধীন ভারতের প্রথম সেন্সাসটি যাতে যথাসম্ভব ভাল হয়, ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকাজে সহায়ক হয় সেই আগ্রহে। ভারতে জনগণনাকাজ এখনও অনুরূপ কাজের তুলনায় সবথেকে কম ব্যয়ে সম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞের সবথেকে প্রধান অঙ্গ—দ্বারে দ্বারে ঘুরে জনগণনা—যেটি রাজ্য সরকারের সব শাখাপ্রশাখা ও কর্মচারী ছাড়া সম্ভব নয়, উপরন্তু আছে প্রতিটি নাগরিকের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সদিচ্ছা। ১৯৫৩ সালে যখন ঢাল তরোয়ালের চিহ্নমাত্র না নিয়ে শুরু করি তখন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রায় সব দপ্তরের সচিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখা ও তাঁদের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত কিছুই সম্ভব হত না। শুধু তাই নয়। তাঁদের সঙ্গে নিধিরাম সর্দারের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ সেটুকু অন্যদের প্রত্যক্ষ জানানো প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁরা সেন্সাসকে অবহেলা না করেন। যত নিকটে সম্ভব শারীরিক অবস্থান এবং প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাতের অধিকার আছে, এই নিদর্শনের বিশেষ সার্থকতা আছে। এটি চিরন্তনী নীতিসুধা।

চীফ সেক্রেটারি ও মেম্বর বোর্ড অভ রেভেনিউর কাছে আর্জি পেশ করার ফলে লোয়ার সার্কুলার রোডের অব্যবহিত দক্ষিণে বিশপ লেফ্রয় রোডের পল ম্যানশনের ৮নং ফ্ল্যাট নিজের নামে পেতে বিশেষ হাঁটাহাঁটি করতে হল না। সেখানে আমরা ১৯৫০-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত ছিলুম। মধ্যে অবশ্য ১৯৫৫ সালের পাঁচ মাস ছিলুম বর্ধমানে, তার পরের মাস দুই-তিন ছিলুম দু'নম্বর লী রোডে, ডাঃ অনিল রায়ের বাড়ির দোতলায় (যেখানে আগে আর-এস ত্রিবেদী থাকতেন) এবং তার পরে কয়েক সপ্তাহ পল ম্যানশনের ২০নং ফ্ল্যাটে। রাজ্য সরকারের কৃপায় রাইটার্স বিল্ডিংসের দোতলায় ডালহৌসি স্কোয়ারের উপরে হোম সেক্রেটারির ঘরের দুটি ঘর পরে একটি নিজস্ব অফিস-ঘর পেলুম। মুখ্যমন্ত্রীর কৃপায় রাইটার্স বিল্ডিংসে এখনকার রোটাণ্ডার পাশে এবং একতলায় পুলিশ-রক্ষিত এলাকায় পশ্চিমের সিঁড়ির তলার সমস্তটি, অর্থাৎ প্রায়

৩৫০০ বর্গফুট আমার দপ্তরের জন্য ছেড়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী ও চীফ সেক্রেটারির নির্দেশে আমার যাবতীয় অফিসের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম—কাগজ, পিন, টাইপ-রাইটার, যাবতীয় আসবাবপত্র, ক্যালকুলেটর, ডাক অফিসের সাহায্য, ডাক-টিকিট, রেডিওগ্রাম, টেলিফোন ইত্যাদি যাবতীয় সুযোগসুবিধা বিনামূল্যে পাই। সেন্সাস তহবিল থেকে এইসব বাবদ এক পয়সাও খরচ করতে হয়নি। উপরন্তু কলকাতা মহানগরের সেন্সাসের জন্য আলাদা দপ্তর হিসাবে প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের কমিশনার বাড়ির দোতলায় অর্ধেকের বেশী জায়গা উপহার পাই। এইসব দপ্তরে ব্যবহারের জন্য যাবতীয় আসবাবপত্র এবং ডাকবিভাগের সমস্ত খরচ রাজ্য সরকারের অনুগ্রহে পাই।

মুখ্যমন্ত্রী ও চীফ সেক্রেটারির ঘরের এত কাছে অবস্থানের কিছু মূল্য অল্প-দিনের মধ্যেই দিতে হল। ক্রমশ আমার ধারণা হল মুখ্যমন্ত্রী ও সুকুমার সেনের স্থলাভিষিক্ত সত্যেন রায় ধরেই নিলেন আমি কিছুটা ফালতু অফিসার, কাজকর্ম বিশেষ নেই, হঠাৎ জরুরি প্রয়োজনে আমাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সুকুমার সেনের তুলনায় সত্যেন রায় নৈর্ব্যক্তিক কম ছিলেন, প্রয়োজনে নিজেকে আরোপ করতে দ্বিধা করতেন না। ১৯৫০-এর ২৭ মার্চ কথাবার্তা নেই আমাকে অকস্মাৎ হাওড়ার দাঙ্গা থামাতে সশরীরে তাঁরা আমাকে হাওড়া পাঠিয়ে দিলেন। হাওড়া-সংকট নির্বাপিত হতে না হতেই সত্যেন রায় আমাকে দার্জিলিঙে পাঠাতে চাইলেন। এ বিষয়ে আগেই বলেছি। ১৯৫১ সালে মাঠেঘাটে জনগণনার কাজ শেষ হয়েছে অথচ সেন্সাসের আসল দপ্তরের কাজ তখনও শুরু হয়নি, তখন উনি আমাকে কুচবিহারে চালান করার জন্য ব্যস্ত হলেন। কুচবিহারে চালের অনটনের দরুণ শহরে পুলিশ ক্রুদ্ধ জনতার উপর গুলি চালাতে বাধ্য হয়, অতএব ওঁরা ভাবলেন একে পাঠালে মন্দ হয় না। ঠিক সেই সময়ে আমি কয়েকদিনের ছুটিতে কাশ্মীরে থাকায় সে-যাত্রা রক্ষা পেলুম। তার ঠিক পরেই, ত্রিপুরার পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে, সে-যাত্রায়ও নির্বাসন থেকে কোনমতে উদ্ধার পাই।

১৯৫১ সালে জনগণনার পর নিজের দল নিয়ে নিরিবিলি একমনে সারণি তৈরির কাজ ও ফলাফলের বিশ্লেষণে মন দেবার সময় এল। সুতরাং রাজ্য সরকারের উপর আমার নির্ভরতা কমেছে। বুঝলুম এবার চুপচাপ সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে পাট উঠিয়ে কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কমিশনারের অফিসে আশ্রয় নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর অনুগ্রহে রাজ-

ভবনের হাতার উত্তরপূর্ব সিংহদ্বারের ঠিক ভিতরে সেন্সাস দপ্তরের জন্য বড়, অতি সুন্দর, আলোহাওয়া-ভর্তি, নিরিবিলি কাজ করার পক্ষে একান্ত উপযুক্ত একটি বড় 'নিসেন হাট' আমি পেলুম। চটপট সেখানে দপ্তর সরিয়ে নিয়ে গেলুম।

প্রস্তুতি

১৯৫০-এর ৮ জানুয়ারি সেন্সাসের কাজে যোগ দিয়ে এত ডুবে গেলুম যে ভারতের প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব আমি ভাল করে উপভোগ করতে পারিনি। শুধু মনে আছে সর্বত্র, বিশেষ অফিসপাড়ায়, আলোর দীপাবলি উৎসব খুবই সুন্দর-ভাবে করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে থ্রি হাণ্ড্রেড ক্লাবে নৈশভোজটিও খুব জমকালো হয়। ভারতের শেষ গভর্নর জেনরল, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী অবসর নেয়ায় আমরা আনন্দিত হই। তাঁর স্থলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ হলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি। রাজাগোপালাচারীর মুখাবয়ব আপাতদৃষ্টিতে ভলটেয়ারের কথা মনে করিয়ে দিত। কিন্তু আমার কাছে ১৯৪২ সালের ২ মে যা ঘটে, এবং যার বিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছি, তার পর থেকে তাঁকে নাট্যকার মলিয়েরের কোন মুখ্য চরিত্রের কথা মনে হত।

কলকাতা হাইকোর্টে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন উৎসবে একটি ঘটনা ঘটে, বলি। আমার একজন মুন্সীগঞ্জের পূর্বসূরী টি-জে-ওয়াই রক্সবরা তখনও হাইকোর্টের জজ। স্বাধীন ভারতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের জজের সম্মান পেয়ে আনন্দিত হন। সেই কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তাঁর কথায় বলি। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট সকালে হাইকোর্টের চূড়ায় স্বাধীন ভারতের নতুন পতাকা তোলার সময়ে জজরা তাঁদের জমকালো পোশাক, তার সঙ্গে পরচুলা পরে সারি দিয়ে গম্ভীরভাবে বসে আছেন। উৎসব শেষে, তাঁরা উঠবেন, এমন সময়ে ধুতি ও পাঞ্জাবিপরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রায় ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে এসে, তিন পা দূরে থেমে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'মিঃ জাস্টিস্ রক্সবরা, আশাকরি আমাকে মনে আছে!' রক্সবরা সাহেব তাঁর দিকে একটু ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে, ভদ্রলোকটি আবার গলা উঁচিয়ে বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি পূর্ববঙ্গের অমুক জেলার অমুক শহরের অমুক। ১৯৩২ সালে আন্দোলনে গ্রেপ্তার হই। আপনি আমাকে ছয় মাসের জেল দেন, তার ফলে হই আমি রাজনৈতিক নেতা। সেই

থেকে আপনার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞবোধ করি।' রক্সবরা সাহেব ছিলেন টাকমাথা, বেশ লম্বা, রোগা। পল ম্যানশনের কোণাকুণি লী রোডের দোতলা-বাড়িতে প্রতিবেশী হিসাবে থাকতেন। প্রত্যহ নিজে একটি পুরনো অস্টিন গাড়ি চালিয়ে হাইকোর্টে যেতেন, পাশে বসে থাকত মাথায় শামলা ও পরনে উর্দি পরা, বুকে আড়াআড়ি লাল পেটি আর তকমা সাঁটা তাঁর আর্দালি। গাড়ি চালাবার সময়ে তাঁর লম্বা জিভের সরু ডগা মুখ থেকে বেরিয়ে নাকের ডগার উপর ঠেকত।

১৯৫০ সালের ২৭ মার্চ বিকেলবেলা আমাকে হাওড়ার দাঙ্গা থামানোর কাজে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে জনগণনার প্রস্তুতির কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েছে। ২৯ মার্চ সৈন্যদের সঙ্গে আমি যখন হাওড়া শহরের অলিগলিতে টহল দিচ্ছি, তখন ১৯৫১ সালের সেন্সাস কার্যসূচী বিষয়ে আমার প্রথম বিশদ ছাপানো সার্কুলার ডাকযোগে সর্বত্র পাঠানো হচ্ছে। ঐ তারিখে দেয়া সার্কুলারটি আগামী বছর জনগণনার প্রতিটি ক্রমিক কার্যসূচি সবিস্তারে বিবৃত করে, ১৯৫১-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত তারিখক্রমে বিশদ দিনপঞ্জী দেয়। তাতে থাকে জন-গণনা কাজের ত্রিশটি প্রধান অথচ বিভিন্ন শাখার ধারা, কখন কোন্ ধারা আরেকটির সঙ্গে মিশে বৃহত্তর ধারার সৃষ্টি করবে।

প্রথমেই ছিল সেন্সাস আইনটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা। সরকারের কী অবশ্য করণীয়, নাগরিকের বা কী কর্তব্য। দ্বিতীয় ছিল, মাথাগুণতির জন্য প্রকৃষ্ট উপায়ে কী করে প্রতিটি গ্রাম বা এলাকার ভৌগোলিক চৌহদ্দি ঠিক করতে হবে এবং প্রতিটি খণ্ডে কী ধরনের গণনাকারী ও পরিদর্শক নিযুক্ত করলে প্রতিটি পরিবারকে গণনা করা সম্ভব হবে। তৃতীয়, সমস্ত কর্মকাণ্ডের উপযোগী কী ধরনের সংগঠন গড়তে হবে। প্রতি সপ্তাহে একে একে কিরকম আঁটসাঁট-ভাবে কাজে অগ্রসর হতে হবে, সেন্সাস পঞ্জিকায় তার বিশদ ব্যাখ্যা ছিল। চতুর্থ, সর্বোচ্চ স্তর থেকে শুরু করে নিম্নতম স্তরে কী করে সেন্সাস কাজের প্রশিক্ষণ ক্লাস চালাতে হবে, কতদিন চলবে, তার নির্দেশ। মাথাগুণতির সংগঠনে প্রথম বড় কাজ প্রতিটি পরিবার যে বাড়িতে, বা বাড়ির অংশে, এমন-কি একটি বিশেষ ঘরের অংশে বাস করে তার জন্য আলাদা একটি পুরো সংখ্যা বা বাটা সংখ্যা তুলি ও রং দিয়ে দেয়ালে লিখে তালিকাভুক্ত করা। এরই ফলে প্রতিটি বাড়ি, পরিবার ও লোকসংখ্যার একটি প্রাথমিক গণনা সম্পূর্ণ হয়। পরে, অন্তিম গণনার সঙ্গে সেই প্রাথমিক গণনা মিলিয়ে নির্ণীত হবে গুণতি কোথায় বেশী-কম হয়ে

থাকতে পারে। প্রাথমিক গণনার সময়ে ভিন্ন একটি প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, যেটি শুধুমাত্র বাছাই করা অল্পসংখ্যক পরিবারে জিজ্ঞাসা করা হবে.। উদ্দেশ্য, মাত্র সেই পরিবারগুলিতে সন্তানধারণবয়স্কা (১৫-৪৫ বছর), এখনও বিবাহিত অবস্থায় আছেন এমন মহিলাদের কাছে প্রশ্ন করে উত্তর সংগ্রহ হবে কোন্ কোন্ বয়সে কোন্ কোন্ ছেলে বা মেয়ে জন্মেছে, তাদের মধ্যে কারা বেঁচে আছে, এখন প্রত্যেকের কত বয়স, যে-সব সন্তান মারা গেছে তাদের মধ্যে কয়টি ছেলে, কয়টি মেয়ে, কোন্ কোন্ বয়সে মারা গেছে। স্বামী কী কাজ করেন, মহিলাই বা কী কাজ করেন। এই প্রশ্নপত্রটি পরিসংখ্যানতত্ত্বে আমার নতুন গুরু শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রস্তুত করেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে শৈলেনদা, প্রখ্যাত রাজচন্দ্র বসু ও সমরেন্দ্রনাথ রায়ের সতীর্থ ছিলেন। পরিসংখ্যানে; সংস্কৃত শাস্ত্রে, সাহিত্যে, নৃতত্ত্বে, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বে শৈলেনদা এমন বিশিষ্ট জ্ঞানী ছিলেন যে তাঁর কাছে স্ব-স্ব-বিষয়ে পণ্ডিতরাও হার মানতেন।

প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসের সপ্তাহে আমাদের বুক যেন হঠাৎ দরাজ হয়ে গেল। ১৯৪৬ সালে হৃদ্‌রোগ থেকে আরোগ্যের পর হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিজয় আচার্যের কাছ থেকে যে মরিস গাড়িটি কিনেছিলুম, ২৪ জানুয়ারি সেটি এবং তার সঙ্গে আরো ২৫০০ টাকা দিয়ে আমরা ১৯৪৬ সালে তৈরি একটি ২ লিটার সানবীম-টলবট সেলুন গাড়ি কিনলুম। নতুন গাড়িটি তার গড়নে ও অলঙ্কারে খুব জমকালো। সমুখে বনেটের দুধারে রেডিয়েটারের নিচের দিকে বড় ঝকমকে রুপোর প্লেটিং করা সুন্দর দুটি 'উইণ্ড-টোন' হর্ন, দুটি প্রকাণ্ড ঝকঝকে শক্তিশালী হেডল্যাম্প, রেডিয়েটারের মাঝখানে হলদে কাঁচ লাগানো ততোধিক সুন্দর একটি ফগ্‌ল্যাম্প, অর্থাৎ কুয়াশায় যে আলো কার্যকরী হয়। তাছাড়া সানবীম-টলবটের প্রসিদ্ধ রেডিয়েটার গ্রিল্ যার সঙ্গে বেণ্টলি গাড়ির গ্রিলের তুলনা করা চলে। প্রকাণ্ড লম্বা পিছন দিক থেকে সমুখে সরু হয়ে যাওয়া বনেট: স্টিয়ারিঙের পিছনে চালক বসে থাকলে তার মনে হবে গাড়িটি চলতে শুরু করলে হুহু করে মাইলের পর মাইল অবলীলাক্রমে গিলে ফেলবে। বনেট তুলে এঞ্জিন দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবার মত। মিশন রো'র হাওড়া মোটর কোম্পানির বড় মিস্ত্রির সঙ্গে আমার ভাব ছিল। গাড়ি কেনার আগে তাঁকে গাড়ির এঞ্জিনটি সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞেস করতে গেলুম। বনেট খুলেই এঞ্জিন দেখে বললেন, 'এর আর কি দেখব, দেখছেন না, স্বয়ং শিবঠাকুরটি বসে আছেন।'

বহু বছর পর ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা পড়ে।

আইভান স্বরিটা তখনও আসানসোলের এস-ডি-ও। নতুন সানবীম-টলবট গাড়িটি চালিয়ে আমরা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এক শুক্রবার আসানসোলে গেলুম। বার্নপুর, কুলটি, দিশেরগড়ের ভারপ্রাপ্ত ভদ্রলোকদের সঙ্গে আইভান আমাদের আলাপ করিয়ে দিল। শনিবার ও রবিবার পর পর দুই সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন মিলে একের পর এক ক্লাবের 'বারে' রীতিমত যাকে বলে পাব-ক্রলিং, তাই করলুম। আইভানের কুকুর স্যালির তখন দু'তিনটি বাচ্চা হয়েছে। তার মধ্যে যে সবথেকে তার মায়ের মত দেখতে সেই ছানাটিকে বেছে নিয়ে কোলে তুলে জয়তী আর তাকে নামাবে না। ইতিমধ্যেই নাম রেখেছে জিলি। ফিরে আসার সময়ে, জয়তী তার মাকে খুব ধরল, জিলিকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। আভার কুকুর মোটে ভাল লাগত না, মহা আপত্তি। অনুনয় বিনয় করে জয়তী মাকে বলল, 'মা, তুমি বল ছেলে মানুষ করতে খুব কষ্ট হয়। আমি যদি জিলিকে এখন থেকে মানুষ করি, তাহলে আমার ছেলে মানুষ করা অভ্যাস হয়ে যাবে।' এরপর আর আপত্তি চলে না।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে দিল্লীতে সর্বভারতীয় সেন্সাস কনফারেন্স হয়। গৃহমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে সভা আরম্ভ করলেন। তাঁর ভাষণ যেমন উদ্দীপক তেমনি সুগ্রথিত। তার আগে সর্দার প্যাটেলকে কখনও দেখিনি। সারা শরীরে কর্তৃত্ব ফুটে উঠত বললে কম বলা হয়। অতি বলিষ্ঠ, এমন-কি ঈষৎ স্থূল, খর্ব চেহারা। দেখে মনে হত যেন বটগাছের গুঁড়ি। প্রশস্ত কাঁধের উপর মহেঞ্জোদারোভাস্কর্যনিন্দিত মাথা। নতুন দিল্লীর সংসদ মার্গের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মূর্তিটিতে তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ভালই ফুটে উঠেছে। শরীরে ছিল কর্তৃত্ব আর অবিচলিত সংকল্পের ছাপ, তার সঙ্গে ধৈর্য, ক্ষমা ও মানবিকতা। চাক্ষুষ দেখলে বোঝা যায়, কী করে, কোন হৈ চৈ না করে, শান্ত, দৃঢ় হাতে, প্রায় নীরবে অত স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি অতগুলি দেশীয় করদ রাজ্যকে স্বাধীন ভারতে আত্মস্থ করে নিলেন। তাঁর দৃঢ়-সংকল্প, সংযত, শান্ত ব্যক্তিত্বের পাশে নেহরুর মত ব্যক্তিকেও একটু ছটফটে, অশান্ত মনে হত। মনে হত হ্যামলেটের মত নানাদিক চিন্তা করার ফলে নেহরু মনস্থির করতে পারছেন না। এই কারণেই সম্ভবত নেহরু অনেক সময়ে সংকল্পে অটল থাকতে পারতেন না। ১৯৪৭-এ দিল্লীর দাঙ্গায় এবং তারপরে শরৎবাবু যখন নির্বাচন জেতেন তখন বিচলিত হয়ে বিধানবাবুর সঙ্গে তিনি যে ধরনের ব্যবহার করেন, তাতে আমার যে খুব ভাল লেগেছিল তা নয়। মনে হত তিনি

টি-এস এলিয়টের মত বড় বেশী 'যদি', 'সম্ভবত', 'কিন্তু' রোগে ভুগছেন। সেই অনুপাতে প্যাটেলের মন নিশ্চয় কম জটিল ছিল। কোনকিছু স্থির করলে নড়চড় করতেন না। কিছুটা নেহরুর কন্যা ইন্দিরার মত। অতীতের দিকে যখন দৃষ্টি ফেলি, আমার এখন মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন ওঠে নেহরুর বদলে প্যাটেল প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলে হয়তো ভারতের গৃহনীতি আরো সুদৃঢ় ও স্থিরলক্ষ্যভিত্তিক হত। কিন্তু যেহেতু সে-যুগে আমার ঠিক কি ধরনের মতামত ছিল সেবিষয়ে আমি সততার সঙ্গে এই স্মৃতিকথা লিখব ঠিক করেছি, সেই হেতু আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে ১৯৫০ সালে প্যাটেলকে দেখার পর যদিও আমার মনে বিশেষ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছিল প্যাটেল সীমিত চরিত্রের লোক। নেহরুর মত দেশের সর্বজনগ্রাহ্য কাণ্ডারী হবার মত ব্যক্তিত্ব তাঁর নেই। তাছাড়া, তখন প্রথম কর্তব্য ছিল দেশবাসীকে শিখিয়ে, পড়িয়ে, প্রজাতন্ত্র ও পার্লামেন্টারি নীতি কায়েম করা, যার জন্য আমার এখনও মনে হয় নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছিলেন সর্বজনগ্রাহ্য দুই নেতা।

১৯৫১ সেন্সাসের প্রাক্কালে সর্বভারতীয় কমিশনার আর-এ গোপালস্বামী স্বাধীন ভারতের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের সহায়কল্পে আগেকার প্রচলিত প্রশ্নপত্র, সংজ্ঞা, চিরাচরিত সারণিগুলিতে অনেক পরিবর্তন আনেন। সবথেকে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ নতুন যে ব্যবস্থা তিনি প্রবর্তন করেন, যার কৃপায় দীন, ক্ষুদ্রতম গ্রামেও পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তুতির পথ প্রশস্ত হয় সেটি হচ্ছে প্রতি গ্রাম ও জনপদের জন্য তার যাবতীয় অধিবাসীর জনতাত্ত্বিক পরিচয় প্রাথমিক সেন্সাস সারণিতে থাকবে। থাকবে প্রতিটি গ্রামের নাম, জরীপের নম্বর, আয়তন, অধিকৃত গৃহসংখ্যা, মোট জনসংখ্যা, সাক্ষর সংখ্যা, মালিক চাষী, ভূমিহীন চাষী, ভূমিহীন কৃষিমজুর, কৃষিকাজ করেন না অথচ ভূস্বামী, ফল বা পশুপক্ষী পালনে, ব্যবসা, পরিবহন, অন্য শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, চাকুরি প্রভৃতিতে উপার্জনকারী কর্মীসংখ্যা। উপরোক্ত প্রতিটি পরিসংখ্যান ও সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে ক'জন কী কাজে নিযুক্ত থেকে রোজগার করে, এবং ক'জন সেই রোজগারের উপর নির্ভর করে তার বিশদ তথ্য। ১৯৫১ সালের প্রাথমিক সেন্সাস সারণিতে প্রতিটি খাতে স্ত্রীপুরুষের হিসাব ছিল না। ১৯৬১ সেন্সাসে সে রীতি প্রবর্তিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই সর্বভারতীয় সারণিতে আমরা প্রতি গ্রামের আরো জনতত্ত্ব-বহির্ভূত তথ্য যোগ করি: যেমন গ্রামে ক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোস্টঅফিস,

মিউনিসিপালিটি-সুলভ সুযোগসুবিধা আছে কিনা: যেমন পাকা রাস্তাঘাট, জলসরবরাহ, বিজলি, পরিশ্রুত জল, বড় রাস্তার সঙ্গে সংযোগের দূরত্ব। এই তথ্যগুলি আমরা ১৯৫১-র পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক সেন্সাস সারণিতে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু করি। এছাড়া চিরাচরিত সেন্সাস সারণি, এবং ১৯৫১ সালে নতুন প্রবর্তিত অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক সারণিও যোগ করা হয় এবং সে-সব সারণির প্রতিটিতে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে তথ্য আলাদা করে দেখানো হয়।

আগের প্রতিটি সেন্সাসে এবং ১৯৫১-র সেন্সাসেও ব্যক্তিগত কাজ ও সংস্থাগত কাজ মিলিয়ে একটিমাত্র কাজের সংজ্ঞায় প্রতি কর্মীকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই-এল-ও) দুটি শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তন করে: একটি ব্যক্তিগত দক্ষতা ও কাজের তালিকা; অন্যটি কর্মী যে সংস্থায় কাজ করে তার উৎপাদনানুগত শিল্পসংস্থার নামের তালিকা। ১৯৫১ সালের কর্মের শ্রেণীবর্ণনার একটি সুবিধা ছিল। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ কাজই ছিল স্বাধীন জীবিকা, স্থানীয় পরিবেশে যজমানি উৎপাদনের পরিবর্তে মূল্য অথবা উৎপন্ন অন্য বস্তুর বিনিময়ে। যিনিই শ্রমিক তিনিই শিল্পের মালিক ও শ্রমিক হতেন, অন্য মালিকের শ্রমিক নন। চিরাচরিত কর্মশ্রেণী সারণিটিও যথেষ্ট বিশদ ছিল, প্রায় ছয়শ'টির উপর বিভিন্ন জীবিকার বর্ণনা ছিল। আই-এল-ও প্রথায় এক হাজারের উপর জীবিকা ও শিল্পসংস্থার দুটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবিভাগভিত্তিক সারণির প্রস্তুতি প্রথম শুরু হয় ১৯৬১-র সেন্সাসে।

১৯৪১ সালের সেন্সাসে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ, মাত্র চারটি মূল সারণি প্রস্তুত হয়। ১৯৫১ সেন্সাসে তৈরি হয় মোট সাতাশটি বিভিন্ন সারণি। তার মধ্যে ছয়টি সারণি হয় দেশের সমগ্র অধিবাসীর, তাতে থাকল দশকে দশকে জনসংখ্যার কী পরিবর্তন হয়েছে তার হিসাব। আরো আটটি সারণিতে পাই বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিবরণ: তার মধ্যে থাকত প্রতিটি কর্মীর সংজ্ঞা (১) মালিক, মাইনে-করা শ্রমিক, স্বাধীন জীবিকা বৃত্তি; (২) প্রতি কাজে সমস্ত কর্মীর বয়সানুসারে, প্রতি পাঁচ বছর বয়সের ভাগ; (৩) প্রতি ব্যক্তির শিক্ষার মান, সতেরো ভাগে ভাগ করা। বাকি তেরোটি সারণিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও পারিবারিক তথ্য। প্রতিটি সারণিতে প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, (মহকুমা) থানা বা তালুক পর্যন্ত প্রশাসনিক ভাগের হিসাব থাকত।

যে-কোন দিক দিয়েই দেখলে, স্বীকার করতেই হবে ১৯৫১-র সেন্সাস অতীতকে পিছনে ফেলে একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করল। তার জন্য মুখ্যত দায়ী

আর-এ গোপালস্বামীর চিন্তা, প্রতিভা, সারা দেশের উন্নতিকল্পে দেশময় কী কী মৌলিক তথ্য একান্ত প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে জ্ঞানবুদ্ধিপ্রসূত বোধ। ১৯৫১ সালের আগে পর্যন্ত ভারতীয় সেন্সাস ছিল মূলত প্রশাসন, আইন ও শান্তি বজায়, ও প্রয়োজনমত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিভেদসৃষ্টির সহায় বা অস্ত্র। কিন্তু ১৯৫১ সালের পর সেন্সাস হল দেশের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিকল্পে পরিকল্পনার সহায়। ১৯৬১ সেন্সাসের মন্ত্র হল ১৯৫১-র কাঠামোকে আরো সুবিস্তৃত ও নিখুঁত করে প্রতিষ্ঠিত করা, আরো বিচিত্রগামী করা, পরিকল্পনামত ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করে তার জন্য নতুন মালমশলার সৃষ্টি করা, সংজ্ঞার সূক্ষ্ম অনুশীলন আরো বিচিত্র ও বিস্তৃত করে নতুন সারণি প্রস্তুত করা, পৃথক পৃথক সংজ্ঞানুযায়ী, বিভাগানুযায়ী নতুন বা বিস্তারিত সারণির সৃষ্টি করা। সেই উপায়ে নতুন নতুন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের সাহায্যে জ্ঞানভাণ্ডারের সৃষ্টি করা।

তিন নম্বর সার্কুলার সর্বত্র পাঠিয়ে আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় গিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নিজে দেখা করে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দৃঢ় করার ব্যবস্থা করছি এমন সময়ে হাওড়ায় অকস্মাৎ দুর্বিপাক ভেঙে পড়ে। অবশ্য নিতান্ত অকস্মাৎ বলা যায় না। পাঁচ মাস আগে থেকেই দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছিল, কিন্তু কবে, কী ভাবে সে দুর্যোগ চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছবে তা কেউ আন্দাজ করতে পারেননি।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক

আগেই বলেছি, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯-এ বৃটিশ পাউণ্ডের দাম সরকারিভাবে হ্রাস করার পর, ১৯ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ পরের দিন, ভারত তার টাকার মূল্য পাউণ্ডের অনুরূপ হারে কমিয়ে দেয়। ডলারের তুলনায় পাউণ্ড-স্টার্লিং ও ভারতীয় টাকার মূল্য এক কলমের খোঁচায় আগের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের বেশী কমে যায়। ফলে আন্তর্জাতিক অর্থবাজারে ভারতের যে স্টার্লিং তহবিল গড়ে উঠেছিল, এক নিমেষে তার মূল্য এক-তৃতীয়াংশের বেশী কমে গিয়ে সংকট দেখা যায়। ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত থেকে পাকিস্তানের মাল রপ্তানির মূল্য ও পরিমাণ যত হয় তার থেকে পাকিস্তান থেকে ভারতে মাল রপ্তানির মূল্য ও পরিমাণ অনেক বেশী হয়। সেপ্টেম্বরের শেষে ভারতের টাকার

মূল্য হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঝপ করে পড়ে, প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তান, পূর্বের চুক্তি একতরফা হিসাবে ভঙ্গ করে, ভারতে রপ্তানির জন্য জাহাজে বোঝাই পঞ্চাশ হাজারের বেশী কাঁচাপাটের গাঁটরি বা বেল, জাহাজ থেকে নামিয়ে নিয়ে রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। এই পঞ্চাশ হাজার বেল পাটের মূল্য কোটি কোটি টাকা ভারত সরকার অনেক আগেই পাকিস্তানকে আগাম দিয়েছিল।

ভারত-পাকিস্তানের বাণিজ্য সম্বন্ধ দ্রুত খারাপ হয়ে ১৬ ডিসেম্বর একেবারে ভেঙে পড়ে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রেল বা স্টীমারে মাল চলাচল অনিশ্চিত কালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। ভারত পাকিস্তানে কয়লা রপ্তানি বন্ধ করে। তদুপরি পাঞ্জাবের সেচের খালগুলিতে জলসরবরাহ এবং উদ্বাস্তুদের সম্পত্তির নিষ্পত্তি বিষয়ে নানা সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পাকিস্তান সরকার সহসা এক কঠোর-অর্ডিনান্স জারি করলেন, যার ফলে সেই সরকার নিজে সমস্ত কিছু উদ্বাস্তু সম্পত্তির অধিকারী হলেন। ফলে বহু হিন্দু পরিবার করাচি থেকে ভারতে চলে আসে। সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের টিপে বার করে তাড়িয়ে দেয়া শুরু হয়। এতসংখ্যক উদ্বাস্তু এত দ্রুত চলে আসে যাদের থাকার এবং দেখাশোনার ব্যবস্থা দিল্লী ও পশ্চিমবঙ্গের সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। পাকিস্তান অর্ডিনান্স এমন ভাষায় জারি হল যার ফলে যদি কোনদিন অবস্থার উন্নতিও হয় তবুও উদ্বাস্তরা ফিরে গেলে নিজ নিজ সম্পত্তি ফেরত পাবে এমন আশা রইল না। ভারতে পাট ও অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্য রপ্তানি বন্ধ করে নিজের দুর্গতি নিজের উপর টেনে আনার পূর্ববঙ্গীয় প্রতিকার হল দেশ থেকে ব্যাপকভাবে হিন্দু খেদানো। ১৯৫০ সালে ৫ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত (আমি মুর্শিদাবাদ থেকে চলে আসার প্রায় দেড় মাস পরে) বাগে ট্রাইবিউনালের রায় দুই রাজ্যের সীমানার যৎসামান্য অদলবদল করা ছাড়া অন্য কোন সমস্যার সমাধান বিষয়ে সাহায্যে এল না। ঢাকায় আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনার সন্তোষকুমার বসুর আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত ফুলতেই থাকল। এর সবথেকে মর্মস্পর্শী সাক্ষী হয়ে আছে তদানীন্তন তোলা, নিমাই ঘোষের ছায়াছবি 'ছিন্নমূল'।

১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই ঢাকা শহর ও খুলনার হিন্দুদের উপর খুব খুনোখুনি ও হিন্দুপাড়ায় ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়। ধর্মান্তরকরণ কাজে আগ্রহ পড়ে যায়। ঢাকা শহরের অবস্থা এত সঙ্গীন হয় যে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বত্র একনাগাড়ে সান্ধ্য-আইন বা

কার্ফিউ জারি থাকে। ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় চীফ সেক্রেটারিদের যে বৈঠক হয় তাতে উভয় দেশে কড়াহাতে ব্যাপক শান্তিভঙ্গ দমন ব্যবস্থা নেয়া হবে এই সিদ্ধান্ত হয়। ইতিমধ্যে কলকাতায় হাঙ্গামা ও দাঙ্গা ঘটতে শুরু করেছে। ১০ ফেব্রুয়ারি ডাঃ রায় দাঙ্গাবাজির বিরুদ্ধে কড়া সতর্কবাণী জারি করেন, সেই সঙ্গে কী উপায়ে সরকার দাঙ্গাহাঙ্গামার নিরসন হতে পারে সে বিষয়ে সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পণ্ডিত নেহরু উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে, ডাঃ রায়ের অনুরোধে একদিনের জন্য ৬ মার্চ কলকাতায় আসেন। রাণাঘাট ও হাবড়ায় (২৪ পরগণা) উদ্বাস্তু শিবিরগুলি দেখতে ১৬ মার্চ পুনরায় আসেন। ইতিমধ্যে ৪ মার্চ তিনি এই বিবৃতি দেন, 'বাংলার অবস্থায় আর বিলম্ব সহ্য হবে না।' সেই সঙ্গে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খানের কাছে যুগ্ম আলোচনা ও আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদন জানান। দুর্ভাগ্যবশত এরই কয়েকদিন পরে ২৬-২৭ মার্চ হাওড়া শহরে মুসলমানদের উপর ব্যাপকভাবে, যা নাকি কলকাতায় ১৯৪৬-এর ১৬ অগাস্টের পর আর কখনও হয়নি, সেইরকম হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু না হওয়া পর্যন্ত লিয়াকৎ আলী খাঁ নেহরুর ৪ মার্চের আবেদনে কোন সাড়া দেননি। অবশেষে ২৯ মার্চ করাচিতে তিনি আশাপ্রদ বক্তৃতা দেন। বলেন, ২ এপ্রিল তিনি দিল্লী যাচ্ছেন।

২৪ মার্চ হাওড়া পাটকলগুলিতে ইতস্তত মুসলমানকর্মী কিছু কিছু খুন হয়। স্থানীয় পুলিশ আরো যদি তৎপর হয়ে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে স্থানীয় গুণ্ডাদের হাজতে ভরত, তাহলে হয়তো দাঙ্গা ছড়াত না। পুলিশের খাতায় নিজ নিজ এলাকায় ছোটবড় গুণ্ডা ও দুশ্চরিত্রদের বিশদ তালিকা থাকে, যারা নাকি চিরকাল যে-কোন বিপাকের সুযোগ নিতে তৎপর হয়। এই পূর্বাহ্নিক ব্যবস্থা এক্ষেত্রে নেয়া হয়নি। ২৫-২৬ একাদিক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে হঠাৎ ২৭ মার্চ হত্যাকাণ্ড একেবারে তুঙ্গে উঠে সারা হাওড়া শহরে ছড়িয়ে পড়ল।

২৭ মার্চ দুপুরে রাইটার্স বিল্ডিংসে নিজের ঘরে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছি, হোম সেক্রেটারি ব্যস্তপায়ে না-জানান দিয়ে ঢুকে বললেন, বেলা ৩টের সময়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। ১৯৫০-এর প্রজাতন্ত্র দিবসের পর রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী সম্বোধন বন্ধ হয়। বেলা ২-৫৫ মিনিটের সময়ে যখন মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকলুম দেখি তিনি ফোর্ট উইলিয়ামের সবথেকে বড় বড় অফিসারের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন: উপস্থিত ছিলেন জি-ও-সি মেজর জেনরল এস-বি-এস রায়, ফোর্ট উইলিয়ামের ভোগরা ব্রিগেডের প্রধান

ব্রিগেডিয়ার রন্ধাওয়া, এবং আরেকজন কর্নেল, তাঁর নাম মনে নেই। তার আগেই শুনেছি সামরিক কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে হাওড়াতে 'প্রশাসনের সাহায্যে' বাহিনীকে নামানোর জন্য আহ্বান করা হতে পারে। হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কুমার অধিক্রম মজুমদারের স্বাস্থ্য তখন ভাল চলছে না। শহরের নানা স্থানে দৌড়াদৌড়ি করতে তিনি পারছেন না। অতএব ব্রিগেডিয়ার রন্ধাওয়া তাঁর সেনাদের নিয়ে শহরে বারবার টহল দিয়ে শহরের প্রতিটি ঘাঁটি ও সন্ধিস্থলে পাহারা বসিয়ে দাঙ্গা দমন করতে সাহায্য করবেন। এই কাজে ঠিকমত নির্দেশ ও সঞ্চালনের জন্য একজন পরিণতবয়স ও বুদ্ধির অসামরিক প্রশাসনিক অফিসারের প্রয়োজন। ব্রিগেডিয়ার রন্ধাওয়া ইতিমধ্যে হাওড়ার টাউন হলে তাঁর ফৌজ ও দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে শহরের নানাস্থানে সৈন্যঘাঁটি বসিয়ে সর্বত্র টহল দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

রাইটার্স বিল্ডিংসে তখন আমিই নাকি একমাত্র লোক যার 'গুণ্ডা' অফিসার-দের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং যার নাকি তখন বিশেষ কিছু কাজ নেই। অর্থাৎ, কী এমন রাজকার্য করছে বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না। দেখলুম ঐটুকু সময়ে হোমরা-চোমরা ফৌজি অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে ডাঃ রায়ের কথা বলার ধরনও তাদের মতো অর্থাৎ ফৌজি হয়ে গেছে। আমার দিকে মুখ তুলে একবার তাকিয়েই বললেন : 'এখনই হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তোমাকে চার্জ নিতে হবে। কেন্দ্রের গৃহমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তোমাকে ছেড়ে দিতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। এই মিটিং শেষ হলেই ব্রিগেডিয়ার রন্ধাওয়া তোমাকে হাওড়ায় নিয়ে যাবেন। তুমি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনামত সব কিছু করতে পারবে, কোন বাধা নেই। চিন্তা কোরো না, যা কিছু করবে, পুরো সমর্থন পাবে।' ফৌজিদের মত কাটা কাটা করে কথা বললেন। ভাবখানা, "হুকুম, হুকুমই। বুদ্ধি খাটিয়ে কর, ব্যস্"।

হাওড়ায় দাঙ্গা দমন

জেনরল রায় আমাকে সঙ্গে করে ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে গিয়ে হাওড়া শহর ও পারিপার্শ্বিকের একটি বড় স্কেলের (১৬"=১ মাইল) ম্যাপ দেয়ালে টাঙিয়ে অল্পকথায় উপদ্রুত অঞ্চলের অবস্থা আমাকে বোঝালেন, কোথায় কোথায় কত সৈন্যের ঘাঁটি করেছেন। বিভিন্ন রঙের মুণ্ডিওলা পিন দেখে বোঝা যায় প্রত্যেকটি

পিন কতগুলি সৈন্য ও অফিসারের প্রতীক। প্রধান প্রধান সড়ক ও উপদ্রুত অঞ্চলগুলির পারিপার্শ্বিকের বিশদ বিবরণ দিলেন। কোথায় কত কী ধরনের গাড়ি, আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি মোতায়েন হয়েছে তাও বললেন। ব্রিগেডিয়ার রনধাওয়াকে মৃদুভাষী স্থিতধী মানুষ বলে মনে হল। আমার ধারণা হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কুমার অধিক্রম মজুমদার নিজের অসুস্থতা হেতু সৈন্যদের নিয়ে রীতিমত ঘোরাফেরা করতে পারেননি বলেই এই হাঙ্গামা বেড়ে ওঠে। তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা এত বড় বড় ফৌজি অফিসারদের সান্নিধ্যে, হয় ঘাবড়িয়ে যায়, না হয় দাঙ্গা দমনে তাদের উৎসাহ ছিল না।

ফোর্ট উইলিয়ামে জেনরল রায়ের সঙ্গে যাবার আগে, আমার চিন্তা হল কী করে খোদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পুরো দায়িত্ব থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। তা না হলে দাঙ্গা শেষ হবার পর হয়তো আমি হাওড়ায় আটকে যাব। আমার বাবার থেকে কুমার অধিক্রম মাত্র দশ পনেরো বছরের ছোট, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতুম। তিনিও আমাকে স্নেহ করতেন। পাছে তাঁর স্থলে অভিষিক্ত হলে তিনি মনে কষ্ট পান, সেও আমার চিন্তার আরেকটি কারণ হল। অতএব কনফারেন্সের অব্যবহিত পরেই আমি এক মিনিটের জন্য গৃহসচিব রণু গুপ্তের সঙ্গে দেখা করে বললুম, যেহেতু হাওড়ার দাঙ্গা দমনই হবে আমার একমাত্র কাজ, অন্য কিছু নয়, সুতরাং সে কাজের জন্য আমি যদি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ঘোষিত হই, তাহলেই যথেষ্ট হবে, আমার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হবার কোন শখ নেই। বিজ্ঞপ্তিতে এইটুকু পরিষ্কার করে দিলেই হবে যে দাঙ্গা দমন কাজে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, একাজে আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে থাকব না। আমি রণু গুপ্তকে পরিষ্কার করে বললুম, কুমার অধিক্রম কোনভাবে মনক্ষুণ্ণ হন, আমি চাই না। রণু গুপ্ত আমার কারণটি বুঝলেন। গেজেটেও আমাকে এ-ডি-এম হিসাবে ঘোষণা করা হল। পরের দিন, অর্থাৎ ২৮ মার্চের 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকা এই ঘোষণাটির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার নতুন কাজ সম্বন্ধে লেখে। লেখাটির মধ্যে একটি ভুল ছিল। কাগজে ছাপা হয় হাওড়ায় মার্শিয়াল ল' জারি হয়েছে। আসলে মার্শিয়াল ল' বা ফৌজি শাসন জারি নয়, বে-সামরিক সরকারের সাহায্যে ফৌজের সহায়তা আমন্ত্রিত হয়েছে। ফৌজি কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নেননি, সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল বেসামরিক সরকারের, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

এমন হুড়োহুড়ি করে, প্রায় ছোঁ মেরে, ব্রিগেডিয়ার রনধাওয়া জীপে তুলে আমাকে হাওড়া নিয়ে গেলেন যে আমি আভাকে অফিস থেকে একটা ফোন করে

জানাবারও ফুরসত পাইনি, পিওনের হাতে চিঠি দিয়ে পাঠানো দূরের কথা। রাত্রি সাড়ে দশটার আগে আমি কোথায় আভাকে জানাতে পারিনি। সুতরাং রাত সাড়ে দশটায় যখন প্রাথমিক কর্তব্যগুলি সেরে—হাওড়া থেকে আমি আধ-ঘণ্টার জন্যে পল ম্যানশনে এলুম, তখন দেখি আভা চিন্তায় আকুল। কোনরকমে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে আবার হাওড়ায় ফিরে গেলুম। পরের ত্রিশ ঘণ্টা অবিরাম হাওড়া শহরের অত্যন্ত সরু ঘিঞ্জি অলিগলিতে পণ্টন নিয়ে টহল দিয়ে বেরিয়েছি। কার্ফিউ সত্ত্বেও এমন অব্যবস্থা ছিল যে গলিঘুঁজিতে লোক গিজগিজ করত, যেন সান্ধ্য আইনের কোন বালাই নেই। কঠোরভাবে পণ্টন নিয়ে শোরগোল করে টহল দিতে দিতে, তারই মধ্যে অন্তত জনা বারো দুষ্কৃতকারীর উরু বা পায়ে তাগ করে গুলি ছুঁড়ে তাদের জখম ও পঙ্গু করে, মিলিটারি লরীতে প্রত্যেককে হাসপাতালে চালান করে, উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে কার্ফিউ সম্বন্ধে মর্মান্তিক ভীতির সঞ্চার করে, অবশেষে, ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে কার্ফিউ একান্তভাবে বলবৎ করার ফলে রাস্তাঘাট, অলিগলি জনমানবশূন্য হয়ে গেল। কার্ফিউ অমান্য করলে প্রাণ-সংশয়কারী সাজা নিশ্চিত, এই ভীতি প্রতিষ্ঠিত করে, তবে আমরা পরের দিনের সকালে কিছু জলখাবার খেতে টাউন হলের ঘাঁটিতে ফিরে গেলুম। হাওড়ায় প্রথম দু'দিন পণ্টন যে ভুলটি করে, আমার মনে হয় ১৯৪৬-এর ১৬ অগাস্টেও সেই ভুলটি হয়। ১৯৪৬ ও ১৯৫০, দুই সালেই, দুটি শহরেই, পণ্টনরা রাজপথ দিয়ে দলেদলে আগাগোণা করে। কিন্তু অলিগলিতে ছোট ছোট ফৌজের দল (প্লেটুন বা হাফ-প্লেটুন) পাঠিয়ে জনসাধারণকে যমের ভয় দেখিয়ে বাড়িতে ঢুকে থাকার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেয়নি। অথচ দাঙ্গায় হত্যাকাণ্ড বেশী হয় অলিগলিতে, রাজপথে তত নয়। অলিগলিতেই অতর্কিতে লোক আক্রান্ত হয়ে আততায়ীর হাতে বেশী সংখ্যায় প্রাণ হারায়। অলিগলিতে ভাল করে টহল না থাকলে, আততায়ীরা চট করে বাড়ি থেকে গলিতে বেরিয়ে সমুখে যাকে পায় তাকে খুন করে আবার গলির বাড়িতে গা ঢাকা দেয়। হাওড়াতে আমি স্থির করি, প্রশস্ত সোজা রাজপথগুলির প্রতি চৌমাথায় ছোট ছোট পণ্টনের দল রাইফেল হাতে মোতায়েন থাকবে, যাতে তারা এক চৌমাথা থেকে অন্য চৌমাথা পর্যন্ত সোজা দেখতে পায়, ও প্রয়োজনে গুলি চালাতে পারে। এর দরুণ, রাজপথে যথাসম্ভব কম পণ্টন মোতায়েন করে, বাকি ফৌজকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে হরদম উপদ্রুত অঞ্চলের অলিগলিতে বারবার বেগে টহল দেবার ব্যবস্থা সম্ভব হয়। এইভাবে দুই ধরনের উপস্থিতিতে ও চলাচলে পণ্টনের সদা-উপস্থিতির

আতঙ্ক বজায় থাকে। সকলের উপর অবশ্য থাকবে ঢালাও হুকুম, কার্ফিউ অমান্য করলেই দ্বিরুক্তি না করে, কে, কী, কেন, দোষী কি নির্দোষী, এই প্রশ্ন বিন্দুমাত্র মনে স্থান না দিয়ে কার্ফিউ অমান্যকারীমাত্রেরই, প্রাণনাশ উদ্দেশ্যে নয়, নিম্নাঙ্গ ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে গুলি চালাতে হবে। এই স্থলে কার্ফিউ আইনের একটি 'বেআইনি' ব্যতিক্রম আমি করি। কার্ফিউ আইনের নিয়ম ছিল, গুলি করতে হলে প্রাণনাশই হবে উদ্দেশ্য। আমার মনে হল প্রাণনাশ করলে জনসাধারণের মনে ফৌজ সম্বন্ধে অযথা বিদ্বেষ আসে। পা ভেঙে দিয়ে পঙ্গু করলে, বিদ্বেষ আসে না, 'ভক্তিমিশ্রিত' আতঙ্ক আসে। আমার মনে হয় অকস্মাৎ দাঙ্গায় যে মনস্তত্ত্বের সূত্র কার্যকরী হয় তা দাঙ্গাকারীদের সৃষ্ট আতঙ্কের পাল্টা আতঙ্ক সৃষ্টি করে দাঙ্গাকারীদের মনোবল বা দুঃসাহস যত তাড়াতাড়ি ভাঙা যায় ততই মঙ্গল, অর্থাৎ তত শীঘ্রই সবথেকে কম প্রাণহানি করে দাঙ্গা দমন করা সম্ভব হয়। পল্টনের সর্বত্রগামী উপস্থিতির সাহায্যে যত অল্পসময়ে সম্ভব চূড়ান্ত কিস্তিমাৎ করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে জনসাধারণের উপরে জয়লাভ। তাদের প্রাণে এই মর্মান্তিক আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেয়া নিতান্ত প্রয়োজন, যে শান্তি-উদ্ধারের অভিযানে পল্টনরা কার্ফিউ-ভঙ্গকারীদের মধ্যে কে দোষী কে নির্দোষী, কার মনে পাপ আছে, কার মনে নেই, সে বিষয়ে কোন তফাৎ করে না। পল্টন সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে, মোড়ের আড়ালে সর্বত্র আছে। যে কোন মুহূর্তে পল্টন হাজির হতে পারে,—এবং যদি আইনভঙ্গ চোখে পড়ে তাহলে নিস্তার নেই।

ব্রিগেডিয়ার রনধাওয়া রাজপথে লম্বা টহলের ভার নিলেন। তাঁর দ্বিতীয় অফিসার ছিলেন মেজর পি দয়াল, অধুনা দিল্লীর চেশায়ার হোমসের অধ্যক্ষ। তাঁর উপর ভার পড়ল নিরন্তর আমার সঙ্গে থেকে ফৌজিসেপাই নিয়ে অলিগলি ও বস্তিতে টহল দেবেন। সৌভাগ্যক্রমে ব্রিগেডিয়ার রনধাওয়া বা মেজর দয়ালের সঙ্গে আমার কোন বিষয়ে কখনও মতদ্বৈধ হয়নি। দুজনেই আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন। হাওড়ার টাউনহলটি হয়ে গেল একটি রণস্থলের ঘাঁটি। কয়েক ঘণ্টা অন্তর ব্যাপকভাবে সংবাদ প্রসারিত হত, গত কয়েক ঘণ্টায় কতজন লোক কার্ফিউ অমান্য করার জন্য শাস্তি পেয়েছে, বা তাদের অঙ্গহানি হয়েছে। পল্টনের জোয়ানরা চমৎকার কাজ করেছিল। প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে এমন বাঙালীর সরু সরু কাঠির মত পায়ে তাগ করে দূর থেকে গুলি ছুঁড়ে সেগুলি ভেঙে দেয়া যথেষ্ট কৌশল ও লক্ষ্যভেদের কাজ। ডোগরাদের

মধ্যে এরকম বেশ কয়েকজন ওস্তাদ রাইফেলবাজ ছিল।

২ এপ্রিল, রবিবার লিয়াকৎ আলী খান যখন দিল্লীতে এলেন, তখন নেহরু তাঁকে এই সংবাদে আশ্বস্ত করেন, যে ৩০ মার্চ থেকে হাওড়া শহরে একজন মুসলমানেরও প্রাণনাশ হয়নি। ভাবতে খারাপ লাগে যে লিয়াকৎ আলী খানকে বৈঠকে আনার জন্য হাওড়ায় দাঙ্গার ও প্রাণহানির প্রয়োজন হয়।

খুনোখুনির ব্যাপারে, বিশেষত নৃশংস কাপুরুষোচিত হত্যায়, মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে তফাৎ খোঁজা বৃথা। ২৭ মার্চ সন্ধ্যা থেকে ৩০ মার্চ সকাল ৬টার মধ্যে আমরা ঘুসুরি এলাকার অপ্রত্যাশিত আনাচ-কানাচ থেকে প্রায় ষাট বা ততোধিক মুসলমান মিল শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করি। এছাড়া অন্যান্য জুটমিল এলাকা থেকে আরো শবদেহ উদ্ধার হয়, প্রতিটিই নৃশংসভাবে কাটাকুটি ও খণ্ডিত করা। কতগুলি মৃতদেহ এত বীভৎসভাবে কাটাকুটি, ছিন্নভিন্ন করা, যা নাকি ভয়ানক হিংস্র জন্তুর পক্ষেই সম্ভব।

জানি না পণ্ডিতজী তাঁকে পাঠিয়েছিলেন কিনা তবে মৃদুলা সারাভাই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে আমাকে তাই বললেন। সে যাইহোক, যতদিন না হাঙ্গামা ও খুন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়, ততদিন মৃদুলা সারাভাইয়ের সঙ্গ আমার ভালই লেগেছিল। পাঞ্জাবের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি ত্রাণকার্য সম্বন্ধে ভাল পরামর্শ দিতেন এবং মুসলমান শ্রমিক ও তাদের পরিবারদের ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তাদের নিজেদের গ্রামে, অথবা পূর্ব-পাকিস্তানে পাঠাবার ব্যবস্থা কত সুষ্ঠুভাবে করা যায়, সে সম্বন্ধে সৎপরামর্শ দিতেন। সেই সঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ত্রাণকাজের ভাল পরামর্শ দিতেন।

পরের চার সপ্তাহ, অর্থাৎ এপ্রিল মাসের গোটাটাই ব্রিগেডিয়ার রন্‌ধাওয়া, মেজর দয়াল, পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন বিভাগের মেজর টুটু ঘোষ, রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংস্থার পূর্বতন কর্মী নিখিল সেন, ভারতীয় রেলওয়ের নীহার মল্লিক আর আমি, এই ছয়জন মিলে যে-কোন সমস্যায় একমনপ্রাণে কাজ করেছি। হাওড়া টাউনহলে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি এলেন। টাউনহলে স্থিত ফৌজি জোয়ানরা ভাল করে চা তৈরি করে তাঁদের সমুখে ধরে দিত। জয়প্রকাশ নারায়ণও এসেছিলেন। তাঁর চোখ ও ভাব দেখে মনে হয়েছিল তিনি যেন অন্য কোন জটিল সমস্যার চিন্তায় মগ্ন। ১৯৭৫ সালে এমার্জেন্সির সময়ে এবং তারপরে যেমন সম্পূর্ণ সজাগ দেখেছি, তেমন মোটেই নয়।

তবে, একজন ব্যক্তি তার আচারে ব্যবহারে আমাকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত করে,

সে মুন্সীগঞ্জের ছাত্রনেতা সামসুদ্দিন আহমদ। পাঠকের মনে থাকতে পারে মুন্সীগঞ্জে থাকতে আমি তাকে নির্বিচারে একান্ত ভালবাসতুম ও বিশ্বাস করতুম। আমার সময়ে সে ছিল মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় বামপন্থী নেতা ও অক্লান্ত কর্মী। মৈমনসিংহ ও চন্দননগরে আমার বাড়িতে সে অতি নিকট আত্মীয়ের মত থাকত। আগের মত এবারও সে ১৯৫০-এর এপ্রিলের গোড়ায় ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে পল ম্যানশনে আমাদের বাড়িতে সোজা উঠল। আমি বোকামি করে তার কোন খোঁজখবর না নিয়ে, তাকে সেদিন সকালে হাওড়ার নানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে, কোথায় কী ঘটেছিল সব বলি। সামান্য ছুতোয়, সেদিন আমাদের কাছে রাত্রে না থেকে, সে পল ম্যানশন ছেড়ে চলে যায়। আমি যখন সামসুদ্দিনকে নিয়ে হাওড়ায় গেছি, সেদিন দুপুরবেলা, পুলিশের আই-বি থেকে. নিজেদের পরিচয় দিয়ে, আভাকে ফোন ক'রে সামসুদ্দিন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সামসুদ্দিন হাওড়া থেকে ফিরে বিদায় নেবার পর আভা আমাকে আই-বি'র ফোনের কথা বলে। দিনদুয়েক পরে ঢাকায় গিয়ে সে ঢাকাময় সভা করে হাওড়ার হত্যাকাণ্ড বিষয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করে। ফলে ঢাকায় আবার একপ্রস্থ খুনোখুনি হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের পর সে বাংলাদেশ থেকে ফেরেনি। আমি যখন দিল্লীতে ছিলুম তখন সামসুদ্দিন আমাকে ইসলামাবাদ থেকে দুটি চিঠি দেয় দিল্লীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব করে। আমি যখন ১৯৭৪-৭৫ সালে পর পর দুবার ঢাকায় যাই তখন তার ভাই শফিউদ্দিন আহমদ ঢাকা সাংবাদিক সমিতির সম্পাদক। কলকাতায় আমার যোধপুর পার্কের বাড়িতে সে ১৯৮৯ সালে এসেছে। ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে আমি যখন বাংলাদেশ সরকারের কাজে ঢাকায় যাই, তখন সে সোনারগাঁও হোটেলে এসে আভা আর আমার সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করে। প্রতিবারই সে তার দাদার সম্বন্ধে অত্যন্ত কাঁচুমাচু ভাব দেখায়।

২ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত লিয়াকৎ আলী খাঁ ও পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে বৈঠক চলে। ৮ এপ্রিল তাঁরা যুক্ত বিবৃতি দেন। ইতিহাসে এই বিবৃতি নেহরু-লিয়াকৎ আলী খাঁ চুক্তি বলে খ্যাত। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীয় মুদ্রার আন্তর্জাতিক মূল্যহ্রাসের পর দুই দেশের বাণিজ্যে যে-সব সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধান করে এই চুক্তি। দুইদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কী ধরনের অভ্যন্তরীণ নীতি হবে সে বিষয়েও সিদ্ধান্তে বলা হয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই জোর দিয়ে বলেন, প্রতিদেশেই গুরুলঘুনির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ই তার নিজের নিজের দেশের

নাগরিক হিসাবে সেই দেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দেখাবে। যে-কোন অভিযোগে এক দেশের নাগরিককে সেই দেশের সরকারের কাছেই আবেদন করে নিরাকরণের প্রত্যাশা করতে হবে। দুই সরকারই নিজ নিজ দেশের সব নাগরিকের সমান অধিকার আছে—এই আশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। পূর্ববঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার থেকে সকল উদ্বাস্তুকে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। দুই সরকারই স্থির করলেন, নিজের দেশে যে-কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণ ও ব্যাপকতা নিরূপণ করার জন্য অনুসন্ধান কমিশন বসবে। সেই সঙ্গে ঠিক হল উপদ্রুত অঞ্চলে, যতদিন না হাঙ্গামা শেষ হয়, প্রতি সরকার একজন করে মন্ত্রী মোতায়েন রাখবেন। তার উপর পূর্ববঙ্গে, আসামে ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা আলাদা সংখ্যালঘু কমিশন প্রতিষ্ঠিত করবেন। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মুখ্যমন্ত্রীরা ১৯৫০-এর ১৫ মে ঢাকায় যান, ইতিমধ্যে দুইজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী—মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন। ১৯৫০-এর ১৫ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি তাঁদের ইস্তফা গ্রহণ করেন। ১৯ এপ্রিল পার্লামেণ্টে শ্যামাপ্রসাদ তাঁর বিবৃতিতে ভারতের মনোভাব 'দুর্বল, অব্যবস্থিতচিত্ত ও স্ববিরোধী' বলে অভিহিত করেন।

১৯৫০-এর ২ মে আমি সেন্সাসে ফিরে গেলুম। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের মত হাওড়ার দাঙ্গা আমার মনকে একইভাবে কেটে-ছিঁড়ে শুদ্ধ করে।

সেন্সাসে প্রত্যাবর্তন

দাঙ্গায় বাধা পড়ায় ১৯৫০-এর মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় ঘুরে সেন্সাসের কাজ পরিদর্শন সম্ভব হয়নি। বরাতক্রমে মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমাদের সংসারে একটি খুব লাভ হল। ধ্রুবানন্দ দাস বলে আমরা একজন অতি দক্ষ পরিচারক বা বেয়ারা পেলুম। ঘরের সমস্ত কাজে এত পাকা ও নির্ভরযোগ্য এবং একান্ত বিশ্বাসী ব্যক্তি আমরা মোজাফ্‌ফরের পর আর পাইনি। তাকে প্রথম কয়েকমাস আমাদের নিজেদের সংসারে মাইনে দিয়ে রাখলুম। কিছুদিন পরেই আমি তাকে সেন্সাস দপ্তরে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মী করে নিলুম। মফঃস্বলের কাজে সে হল অপরিহার্য। একাধারে সামাদ ও মজিদের কর্মকুশলতার সঙ্গে সে সুদক্ষ বেয়ারা আর বাবুর্চির কাজেও পটু ছিল। এক ঘণ্টারও কম নোটিসে সে শুধু একটি সুটকেসে আমার এক সপ্তাহের মত প্রয়োজনীয় জামাকাপড়, জুতো, প্রসাধনের সামগ্রী, ইত্যাদি নিজের বিবেচনায়

বুঝে-সুঝে সব প্যাক করে নিত। সেই সঙ্গে আরেকটি ব্যাগে চালডাল, মশলাপাতি, মাখন, ডিম, টিনের খাবার, রুটি, তার সঙ্গে রান্নার বাসন-কোসন সুদ্ধ গুছিয়ে নিত। আরেকটি ব্যাগে বা হোল্ড-অলে সে ভরে নিত বিছানার চাদর-পত্র, মশারি, পাতলা তোষক, তোয়ালে আর শোবার জামাকাপড়। উপরন্তু কাঁধে ঝোলানো একটি ব্যাগে নিত রাস্তার জন্য জিনিসপত্র : থাকত একটি কেটলি, গুটি দুয়েক ডিম, কিছুটা পাঁউরুটি, একটি পাঁউরুটি সেকার জালি, চিনি, নুন, টিনে জমানো দুধ। রাস্তায় দুরপাল্লা যেতে যেতে যদি কোন দোকানে উনুন জ্বলছে দেখত, তখনই চট করে জীপ থামিয়ে আমার জন্য কিছু রুটি সেকে, রুটি-মাখন, ডিম ও চা তৈরি করে দিত। মাথায় তার নিশ্চয় একটি পুরো তালিকা গাঁথা থাকত. ফলে কোন্ জিনিস কোন্ সময়ে পথে প্রয়োজন হতে পারে এমন কোন একটি জিনিসও কোনদিন সঙ্গে নিতে ভোলেনি। ১৯৯০ সালে মারা যাবার কিছুদিন আগে, আটাত্তর বছর পর্যন্ত সে আমাদের কাছে ছিল। কোনদিন তার হিসাবে ভুল হয়নি। আমি তাকে অগ্রজের মত মান্য করতুম।

যখনই বেলাশেষে গন্তব্যস্থানে যে-ডাকবাংলায় রাত কাটাতে হবে সেখানে পৌঁছতুম, সে প্রথমেই আমার জন্য চা, সিদ্ধ ডিম, দুটি টোস্ট ধরে দিত। খেতে শুরু করেছি, ইতিমধ্যে সে আমার বিছানা পেতে স্নানের ব্যবস্থা করে দিত, সেই সঙ্গে আলনায় স্নানান্তে পরার জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখত। তার আগেই আমার শোবার ঘরটি ঝাড়পোঁছ, জমাদারকে দিয়ে স্নানঘর, শৌচঘর পরিষ্কার করানো হয়ে গেছে। এইসব সেরে সে দুপুরের বা রাতের খাবার রাঁধতে বসে যেত। এক কথায় সে বাড়িতে সৃষ্টি করত হোটেলের আরাম, আর ডাকবাংলায় সৃষ্টি করত বাড়ির আরাম।

১৯৫৫ সালে বর্ধমানে বদলি হবার আগে কলকাতাস্থিত ভারত সরকারের ছাপাখানার অধ্যক্ষ বি-কে রায়কে ধরে আমি ধ্রুবকে সেই ছাপাখানায় জমাদারের পদে ভর্তি করিয়ে দিই। এখানেই ধ্রুব ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত চাকরি করে। সেখান থেকে অবসর নিয়ে সে দিল্লীর বাড়িতে আমাদের 'বেয়ারা এমেরিটাস' হয়ে ফিরে আসে এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রথমে দিল্লীতে পরে ১৯৮৩ সাল থেকে কলকাতায় থাকে। সে কয় বছর তার উপর সংসারের সব তদারকের ভার দিয়ে আমরা পরম নিশ্চিন্তে ছিলুম। আমাদের মনে বড় দুঃখ ছিল পরবর্তীজীবনে আমরা মুন্সীগঞ্জের সামাদ বা জলিলকে তাদের অবসরের পর দেখতে যেতে পারিনি। এমন-কি মজিদ বা তোজামলকেও নয়। ধ্রুব'র বেলায় এই ত্রুটি আমরা

স্খলন করতে সমর্থ হই। ১৯৮৬-এর প্রথমদিকে আমরা ওড়িষ্যার কটক জেলার কেন্দ্রাপাড়া থানার অন্তঃস্থ পাটামুণ্ডাই গণ্ডগ্রামের কাছে আইনেপাড়া গ্রামে ধ্রুব'র বাড়ি যাই। তার ছেলে নিরঞ্জন তখন ভুবনেশ্বরে রাজ্য সেন্সাস দপ্তরে পদস্থ অফিসার। ধ্রুব ভুবনেশ্বরে একটি সরকারি ফ্ল্যাট নিজের নামে কিনে ছেলেকে দেয়। একটি পুরো দিন ধ্রুব'র গ্রামে তার নিজের বাড়িতে, তার থাকার ঘর, খেতখামার, সংসার দেখে, তার পরিবারের সকলের সঙ্গে তার সমৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদায় আমোদ-আহ্লাদ করে আমরা বিশেষ আনন্দ পাই। ধ্রুব কলকাতা থেকে ১৯৮৯ সালের শেষে দেশে ফিরে যায় এবং ১৯৯০-এর অগাস্টে নিজের ভিটায় মারা যায়। আভা তখন একটি কঠিন অপারেশন থেকে সবে সেরে উঠছে, সেজন্য তার শ্রাদ্ধে আমাদের যাওয়া হয়নি। ছেলে নিরঞ্জন এখনও আমার জন্মদিনে, বিজয়ায় ও বড়দিনে হয় গ্রিটিং টেলিগ্রাম, নয় প্রণামী চিঠি পাঠায়।

দুর্গম রাস্তা, তার উপরে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থানে, যতদূর চোখ যায় সমতল ভূপৃষ্ঠ দেখে দেখে একঘেয়েমি আসে। উপরন্তু জনগণনা কাজের প্রস্তুতি পরিশ্রম ও ধৈর্যসাপেক্ষ, একঘেয়ে তো বটেই। প্রতি জায়গায় একই ছক বারবার ঘুরে-ফিরে যাচাই করে নিতে হয়; সেই সঙ্গে, আপনি যাদের কাজ দেখছেন, তাদের কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা, তাদের দিয়ে করিয়ে স্বচক্ষে দেখে নিতে হয়। অতএব কাজে যাতে মনোযোগ আসে তার জন্য প্রয়োজন হয় এমন কিছু নেশা বা উদ্দেশ্য যা আপনাকে, সুকুমার রায়ের 'খুড়োর কলে'র মত একস্থান থেকে অন্যস্থানে অন্য তাগিদে ঠেলে নিয়ে যাবে। এ বিষয়ে প্রতিটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। জেলার মধ্যে যত্রতত্র ইচ্ছামত ঘোরার জন্য একটি জীপ ও চালক দিতেন।

যে-নেশার কথা ভাবলুম সেটি হল সারা রাজ্যের আনাচে-কানাচে যদি কোথাও দেখে বা শুনে মনে হয় কোন প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকীর্তি এখনও আছে, সে স্থানে গিয়ে বিশদ বিবরণ আহরণ করা এবং সেই সঙ্গে এক-আধটা ফোটো নেয়া। ১৯৫৪ সালের মধ্যে এইভাবে আমি প্রায় তিন হাজার ফোটো তুলেছিলুম, সবগুলিই তখনকার দিনের ব্রাউনি বক্স ক্যামেরা দিয়ে তোলা। চোখে সনাক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু তার থেকে ছাপাবার উপযুক্ত নয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত যদিও এই প্রচেষ্টায় যথেষ্ট পরিতৃপ্তি ও সার্থকতা পাই, তবু এই প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে পরে আরেকটি অনুসন্ধানের সম্ভাবনা ফাঁদি। পশ্চিমবঙ্গের যেখানে যত পুজা, পার্বণ, পরব ও মেলা হয় তার একটি সম্পূর্ণ

তালিকা তৈরি এবং প্রতিটি উৎসবের যদি কোন প্রাচীন পূজাস্থান বা স্থাপত্যের নিদর্শন থাকে, তার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ। সেই উদ্দেশ্যে আমি একটি বিশদ প্রশ্নপত্রের খসড়া তৈরি, স্থানে স্থানে তার যাচাই করে চূড়ান্ত প্রশ্নপত্রটি খাড়া করলুম। এই মহৎ যজ্ঞে আহ্বান করে এক আবেদনপত্র লিখে সে দুটি হাজার কয়েক সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ডাকে পাঠালুম প্রতিটি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, পোস্টমাস্টার, ডাক-পিয়ন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধ্যক্ষ, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ছেলেমেয়েদের ক্লাব ও স্থানীয় সংবাদপত্র অফিসগুলিতে। আবেদন করলুম প্রত্যেকে যেন যথাসাধ্য অনু-সন্ধান ও পড়াশোনা করে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নপত্রের যথাসম্ভব বিশদ উত্তর ও উৎসবের বিবরণ পাঠান। সেই সঙ্গে প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ইত্যাদি যেন থাকে, তার কারণ মুদ্রণের সময়ে তাঁদেরই রচনা যথাসম্ভব রক্ষা করে, রচনার তলায় তাঁদের নাম, ঠিকানা ও জীবিকা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে। সুতরাং সঠিক উত্তরের জন্য লেখক ও প্রেরক দায়ী থাকবেন। প্রথম যাচাই পত্রটি বিলি করা হয় ৯ জুলাই ১৯৫৭ তারিখে। চূড়ান্ত আবেদনটি পাঠানো হয় ১৮ মার্চ ১৯৫৮ তারিখে। এই সর্বব্যাপী অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করে, সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে এবং পঞ্চম ও শেষ খণ্ড ১৯৮৪ সালে। মোটা মোটা পাঁচটি খণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার আদ্যোপান্ত বিবরণ, একই নির্দিষ্ট রীতি ও বিষয়পরম্পরায় ছাপা হয়। প্রতি খণ্ডে থাকে বিশদ ম্যাপ ও ফোটোসম্ভার, বিস্তারিত সূচি, বিশ্লেষণী রচনা ও ম্যাপ। তার সঙ্গে থাকে প্রতিটি মেলা কোন্ পূজা বা পরব উপলক্ষ্যে হয়, কত লোকসমাগম হয়, কি কি পণ্যদ্রব্য আসে, তাদের স্থানীয় বিশেষত্ব বা মাহাত্ম্য কি, পূজা, পরব, পার্বণ যা হয় তার আরাধ্য দেবদেবী কী, স্থানীয় নাম, মূর্তির বর্ণনা ও মূর্তির ধ্যান জানা থাকলে ধ্যানের উদ্ধৃতি, গ্রামের সাধারণারাধ্য দেবদেবী না পরিবার-বিশেষের দেবদেবী এবং প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি থাকলে তার বিশদ বর্ণনা থাকবে। এই সুবৃহৎ, পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ কাজের জন্য, সর্ববিষয়ে দায়ী ছিলেন আমার সহকর্মী সুকুমার সিংহ ও অরুণকুমার রায়।

পুরনো স্থাপত্য, পোড়ামাটির কাজ, বিভিন্ন শৈলীর মন্দির ও মসজিদ এ সবের নেশা, তার সঙ্গে মুখ্যত সেন্সাসের এবং কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্টের কাজ, ১৯৫০-৫৪ এই পাঁচ বছরে আমাকে জীপের পিঠে বহু হাজার মাইল ঘোরায়। এই কয় বছরে ঘোরার ফলে পশ্চিমবঙ্গে এমন খুব কম গ্রামই ছিল যেখানে হয় সরাসরি,

না হয় তার পাঁচমাইলের মধ্যে আমি যাইনি। আমি যাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধা করতুম এবং আদর্শ হিসাবে মানতুম—নির্মলকুমার বসু ও রাধারমণ মিত্র—তাঁরাও বোধ-হয় এত আঁতিপাতি করে ঘোরেননি। উপরন্তু এইসব ঘোরার সময়ে, বিশেষত ১৯৫২-৫৪ সালে যখন সেন্সাসের কাজের সঙ্গে কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্টের কাজ করতুম তখন আমি অন্ত্যজের অন্ত্যজ জাতিদের—যেমন ধাঙর, বাগ্দি, বাউরি, ডোম—গ্রামে এবং তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে থেকেছি। ১৯৪১ সালে আমি অবিভক্ত নদীয়ার ভেড়ামারা থানায় যে অভিজ্ঞতার কথা আগের খণ্ডে লিখেছি, তার কথা মনে পড়ে যেত। প্রায়ই এই সম্প্রদায়গুলির কোন না কোন বাড়িতে আমি নিজে যেচে হয় একবেলা আহার করেছি না হয় রাত্রিবাস করেছি। ভুরভুরি কাটা পানাপুকুরে সবুজ হড়হড়ে জল, অথবা নোংরা, গন্ধময় কাঁকরভর্তি চালের ভাত, একটু পাতার ঝোল, জলের মত ডাল খেয়ে দেহের পাকস্থলীতে যে অভিজ্ঞতা আসে, সে অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর কোন কিছুই পাল্লা দিতে পারে না। এই ধরনের আহারে, বলা বাহুল্য, পুষ্টি খুব আসে না। উপরন্তু প্রায়ই কঠিন রক্ত-আমাশয় নিয়ে বাড়ি ফিরতুম। ছয় মাস ধরে যত্ন করে আভা যে পুষ্টি আমার দেহে সঞ্চারিত করত, একদিনের রক্ত-আমাশয়ে তা সব ধুয়ে যেত। তা সত্ত্বেও প্রতিবার এই ধরনের আহারে পরিবেশনের সময়ে যে স্নেহ ও যত্ন আমি পেয়েছি তা ভোলার নয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতার ফলেই আমার বিশ্বাস জন্মায় যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের শরীরকে একটি ফুটোভর্তি বালতি বলে ধরা যায়। যে বালতিতে বহু যত্নে যা পুষ্টি ঢালা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফুটোগুলি দিয়ে তার অনেক-খানি বেরিয়ে যায়।

কিন্তু রক্ত-আমাশয়ের থেকেও আমাকে আরেকটি জিনিস যা পীড়া দিত তা হল শারীরিক নিভৃতি বা আড়ালের অভাব। পায়খানা, প্রস্রাব, স্নান, বিশ্রাম কোন কিছুই লোকচক্ষুর আড়ালে সম্ভব হত না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে এই নিভৃতির অভাব যে কতখানি অস্বস্তিকর হতে পারে তা ঠিক বোঝা যায় না।

সহকর্মী ও গুরু

শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা আগেই লিখেছি। আমি যখন সেন্সাসে ঢুকি তখন শৈলেনদা, জুডিসিয়াল সার্ভিসের হলেও, রাজ্য পরিসংখ্যান সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন। সেই সংস্থার অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীমতী চামেলী বসু। শৈলেনদা পল ম্যানশন

থেকে সিকি মাইল দূরে এলগিন রোডে থাকতেন। বললেন, যেদিনই আমি টুরে না গিয়ে কলকাতায় থাকব সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়িতে তিনি আমাকে দু'ঘণ্টা স্ট্যাটিষ্টিক্স্ পড়াবেন। শৈলেনদা আমার সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন দত্তের আলাপ করিয়ে দেন। তিনি 'যমদত্ত' ছদ্মনামে লিখতেন, ইংরেজিতে যাকে বলে এক্রোনিম। পেশায় ছিলেন উকিল। ওকালতি বিদ্যায়, বিশেষত ইসলাম আইনে বিশেষ পারদর্শী হলেও অর্থার্জনে ছিল একান্ত অনীহা। অন্যপক্ষে বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ে ছিল অত্যন্ত উৎসাহ ও জ্ঞান। আমার মূল্যমানে তিনি ছিলেন দুর্লভ প্রতিভা। আমার বরাবরই ধারণা প্রতিভার একটি চিহ্নই হচ্ছে আদর্শ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হলে তার জন্য যে-কোন মূল্য দিতে কসুর করে না। সংখ্যাতত্ত্বের স্টোকাষ্টিক মড্‌ল্ থেকে শুরু করে উইলিয়াম টার্নারের আঁকা ছবি, যে-কোন বিষয়েই তিনি যেন সমান অধিকার ও নির্দ্বিধায় আলোচনা করতে পারতেন। 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে যত কিছু উদ্ভট বিষয়ে বিশ্বকোষ বলে মানতেন। শৈলেনদা এবং যমদত্ত উভয়ে আমাকে শেখান প্রকৃত শিক্ষিত মনের চিহ্ন হচ্ছে, যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকবে, তখন আন্দাজে ঢিল না মেরে পাঁচরকম জল্পনা না করে, তৎক্ষণাৎ তাক থেকে অভিধান বা বিশ্বকোষ টেনে বিশেষ পাতাটি খোলা।

শৈলেনদা ও যমদত্তকে নতুন গুরু বলে পেলুম, আমার বিশেষ সৌভাগ্য। শৈলেনদা অকালে মারা যাবার আগে পর্যন্ত ১৯৬১ সালের সেন্সাসের পর আমার অনেক লেখা ও বিশ্লেষণ সযত্নে দেখে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দেন। ১৯৬১-র সেন্সাসে গ্রীয়ার্সনের ভারতীয় ভাষাগুলির পুনরায় শ্রেণীবিন্যাসে,—যে কাজ আমার সহকর্মী শ্রী আর-সি নিগম বহু যত্নে সম্পন্ন করেন, সেই শ্রেণীবিন্যাস পরীক্ষায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যেমন অকাতরে সাহায্য করেন,—তেমনি সাহায্য করেন শৈলেনদা। উপরন্তু তিনি ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম শেডিউলভুক্ত ভাষাগুলির আধুনিক প্রথায় তুলনামূলক ব্যাকরণ তৈরি ও প্রকাশ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। দিল্লীতে ১৯৫৮ সালে চলে যাবার পরেও, আমি নিয়মিতভাবে যমদত্তর সঙ্গে তাঁর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়িতে দেখা করতুম, হয় দমদমে যাবার পথে, না হয় দমদমে নেমে বাড়ি যাবার পথে। শেষ দেখা হয় ১৯৭৫-এর মার্চ মাসে, মারা যান ঐ বছরের সেপ্টেম্বরে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রখ্যাত ফোটোগ্রাফার, কম্যুনিস্ট মতাবলম্বী, ভেরিয়ার এলুইনের বন্ধু ও শোভা জানার স্বামী, সুনীল জানার সঙ্গে আলাপ হয়। শোভা জানা ছিলেন বেবল

সুন্দরী ও বিদুষী, তেমনই ছিল তাঁর সহৃদয়, আত্মীয়বৎ ব্যবহার ও আলাপে উৎসাহ। শোভা ছিলেন ডাক্তারি পাস, ডাক্তারি ছাড়া গবেষণা করতেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বন্ধুমাত্রকেই মুগ্ধ করতেন। তাঁদের বাড়িতে সকলের ছিল অবাধ প্রবেশ। তার কিছুদিন পরে আলাপ হয় প্রেসিডেন্সী কলেজের সহপাঠী সনতের স্ত্রী কনক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এতদিন পর্যন্ত যে-সব কর্মরতা মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁরা প্রায় সবাই শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শোভা যেমন অন্য পেশায় লিপ্ত ছিলেন, কনক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আঞ্চলিক এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের এক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, বর্মার মেমিওতে মানুষ। চাকরি করতেন বলে তাঁরও ব্যবহারে সহজ আত্মবিশ্বাস ও সহৃদয়তা ছিল। তার কিছুদিন পরে স্থানীয় আমেরিকান কনসালেটের আইলিন এভারটনের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনিই প্রথম শিক্ষিত, পারদর্শী আমেরিকান মহিলা, যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। দুঃখের বিষয়, এতসব বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা পুরুষ এঁদের মত মহিলাদের চারদিকে ভিড় করতেন, যে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হত না।

সুনীলের বন্ধু ভেরিয়ার এলুইন একদা লিখলেন, বিলেত থেকে এদেশে আসার পর মহাত্মা গান্ধী ও মীরা বেনের সঙ্গে আলাপ হয়। সেই সময়ে বম্বেতে এক বৃটিশ আই-সি-এস অফিসারের সঙ্গে আলাপ হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ভারতে ভেরিয়ার কী উদ্দেশ্যে এসেছেন। যখন বললেন নৃতত্ত্ব, তখন সাম্রাজ্যের স্তম্ভটি নাক তুলে বলেন, 'বুঝেছি, স্তন-ও মন্দির-চূড়ার গবেষণা।' ফোটোগ্রাফার হিসাবে সুনীলের ভেরিয়ার এলুইনের দুটি উৎসাহেই ছিল তাঁরই মত সমান আগ্রহ। দুটি বিষয়েই তাঁর ছবি হল অতুলনীয়। ১৯৯২-এর প্রথমে আমার স্মৃতিকথার দুখণ্ড ইংরেজি বই যখন তাঁর কাছে লণ্ডনে পাঠাই, তখন সুনীল বইদুটির প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে লেখেন, তিনি যখন তাঁর ফোটোসংগ্রহ বিলেতে নিয়ে যান, তখন কাসটম্‌স্ বা শুল্ক ও রপ্তানি বিভাগ তাঁর স্তনচূড়া গবেষণাসংক্রান্ত ছবিগুলি দেখে সেগুলি অশ্লীলতা অপরাধে বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর, ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে বেঁচে যান। সুনীলের বাড়িতেই জে-বি-এস হলডেন ও স্ত্রী হেলেন স্প্যারোর সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আমন্ত্রণে হলডেন বিলেত থেকে কলকাতায় আসেন, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে বায়োমেট্রি বিভাগটি গড়ে তোলার জন্য। হলডেন পরে ১৯৬৩ সালে

আমাকে ১৯৬১-র সেন্সাসের অন্তর্গত সমগোত্রে বা একই রক্তের সম্বন্ধ-গ্রথিত পরিবারে মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে প্রস্ফুরিত হয় সে বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে সাহায্য করেন। হলডেনের ছিল পর্বতের মত বিরাট শক্ত চেহারা. সক্রেটিসের মত প্রকাণ্ড চওড়া কপাল। ওদিকে তাঁর স্ত্রী ছিলেন নিজের নামের সার্থক অধিকারী। ছোট্ট চড়ুইপাখির মত চেহারা, মেজাজের ঠিক নেই, ছটফটে, হাত-পা বশে রাখতে পারতেন না। ভারতে থাকার সময়ে একবার কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি বো-স্ট্রীটের এক হাকিমের হাতে তাঁর নিজের কুকুরকে রাস্তায় লাথি মারার অপরাধে বিরাট অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন।

তৃতীয় যে প্রতিভার সঙ্গে আমার আলাপ হল তাঁর নাম কমলকুমার মজুমদার। কবি চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় আলাপ করিয়ে দেন। চঞ্চল ও কমলবাবু, উভয়কে সেন্সাস সংক্রান্ত গবেষণায় লাগানোর সৌভাগ্য আমার হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ, বাণিজ্য, হস্ত ও নানাবিধ ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্বন্ধে তাঁরা প্রামাণ্য দলিল, ও তথ্য উদ্ধার করেন। সংগ্রহ হিসাবে সেগুলি ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের ১-সি খণ্ডে তাঁদের স্বনামে মুদ্রিত হয়। তাঁদের রচনাগুলি আদিম, লৌকিক, প্রাথমিক, ও দরবারি শিল্প ও শৈল্পীবিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্য ভাণ্ডার হয়ে থাকবে। কমলবাবু এবং যমদত্ত, কার প্রতিভা কত বিচিত্র-গতি আমি আজও সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারিনি। চিরস্মরণীয় চিত্রশিল্পী পিয়ের আগুস্ত রেনোয়ার পুত্র জঁ রেনোয়া ১৯৪৮-৪৯ সালে কলকাতা আসেন, বিখ্যাত 'রিভার' ফিল্মচিত্র তুলতে। যতদিন ছিলেন কমলবাবুর সঙ্গে রোজ যাতে দেখা হয় তার জন্যে ছেলেমানুষের মত এত ব্যস্ত হয়ে তাঁকে কলকাতাময় খুঁজে বেড়াতেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সেই হিসাবে সত্যজিৎবাবু রেনোয়ার কাছে অত কল্কে পেতেন না। রেনোয়া নাকি বলতেন, কমলবাবু ফরাসী পণ্ডিতদের থেকে ফরাসী ভাষা ভাল জানতে ও বলতে পারতেন। এ কথাটি তাঁর সম্বন্ধে, এবং সেই সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধেও যে প্রযোজ্য হতে পারে তা আমি কমলবাবু ও প্রমথ চৌধুরীর বাংলা বাক্যরচনায় শব্দবিন্যাস ও হঠাৎ-আলোর-ঝলকানি'র মত ক্ষুরধার মন্তব্য ও মেটাফরের প্রয়োগ দেখে বুঝতে পারি। আমার সঙ্গে আলাপ হবার কিছু পরে কমলবাবু একদিন আমাকে চৌরঙ্গীস্থিত আর্মি অ্যাণ্ড নেভী স্টোরর্সে নিয়ে গিয়ে পুরো সকালটি ইওরোপীয় লেসশিল্পের নানাবিধ নমুনা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝান, কী উপায়ে কোনটির কী ধরনের বোনার পদ্ধতি

সে-বিষয়ে। সে-শিক্ষা পরে ভেরমেয়ারের ও রেমব্রান্টের ছবি দেখা শিখতে আমাকে সাহায্য করে। ফ্রান্সের সেরা সেরা মদের বংশপরিচয়ে তাঁর ছিল যেমন দখল, তেমনি ছিল দেশী কালীমার্কার প্রতি আসক্তি। পল ম্যানশনে প্রায়ই আসতেন। আমার সঙ্গে যত নয়, আভার সঙ্গে আলাপে ছিল তাঁর ততোধিক আগ্রহ, সাংসারিক খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে ছেলে মানুষ করার নানা বিষয়ে। সাংসারিক খুঁটিনাটি বিষয়ে সমান উৎসাহ দেখেছি বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু, আমার অধ্যাপক সুশোভন সরকার, প্রাপ্তবয়সের গুরু শৈলেনদা ও যমদত্তের মধ্যেও। যখনই আসতেন কমলবাবু অতি সাবধানে থলিজড়ানো একটি বস্তু ঘরের কোণে সন্তর্পণে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দিতেন। যাবার সময়ে সাবধানে সেটি বাঁ হাতে বুকের কাছে তুলে নিতেন। তাতে কী আছে আন্দাজ করতুম, কোনদিন প্রশ্ন করিনি। আমার কাছে একটু দুষ্প্রাপ্য আর্মানিয়াক ব্র্যাণ্ডি ছিল, খুব তারিফ করে খেয়েছিলেন মনে আছে। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' প্রথম প্রকাশের অব্যবহিত পরে কমলবাবু একদিন এসে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ছবিটির ধাপে ধাপে বাঙালী মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দু সমাজের রীতিনীতি. স্ত্রীআচার, উৎসব, গৃহস্থালী-সংস্থানে কত অসঙ্গতি ও অজ্ঞানতা আছে একে একে বলে গেলেন, প্রায় সবগুলি মন্তব্যই অকাট্য মনে হল। সত্যজিৎ রায় যে সম্প্রদায়ে মানুষ হয়েছিলেন তাঁর এ-সব জানার কথা নয়। তবে, সবকিছুই নিখুঁতভাবে করা তো ছিল তাঁর পণ; না জানলেও শিখে নিতে পারতেন। কমলবাবুর মত নিশ্চিত জ্ঞান ও প্রতীতি আমি একমাত্র আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' বইতেই দেখেছি। পরে শুনলুম, সত্যজিৎবাবু কমলবাবুর নাম সহ্য করতে পারতেন না, সত্যমিথ্যা কোনদিন উভয়ের একজনকেও জিজ্ঞেস করিনি। প্রথম দেখানোর অল্পদিনের মধ্যে পরিতোষ সেন, আমার ভাই গুলু, আভা বিকেলের জলখাবারের আয়োজন করে পল ম্যানশনে আমাদের ফ্ল্যাটে সত্যজিৎবাবু, তাঁর স্ত্রী, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্বামী সুব্রত, বংশীধর চন্দ্রগুপ্ত, সুব্রত মিত্র প্রভৃতিকে চায়ে নিমন্ত্রণ করে সংবর্ধনা জানাই। পরিতোষবাবুর প্রস্তাবেই এটির ব্যবস্থা হয়। কমলবাবু যথারীতি আসল মুহূর্তেই উধাও। কমলবাবুর সঙ্গে আমার বরাবর যোগাযোগ ছিল, যখনই দিল্লী থেকে কলকাতায় আসতুম তখন খোঁজ নিতুম, মাঝে মাঝে দেখা হত। মারা যাবার কিছুদিন আগে তিনি তাঁর 'খেলার প্রতিভা' বইটি আমাকে উৎসর্গ করে আমাকে বিশেষ সম্মানিত করেন। যে কপিটি তিনি আমাকে পাঠান, সংলগ্ন চিঠিটিও আমি পরম মূল্যবান বলে রক্ষা করেছি। এই সময়ে বিষ্ণুবাবু ও

চঞ্চলের সূত্রে আরেক প্রতিভাবান পুরুষের সঙ্গে আলাপ হয় যাঁর কাছে তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি সবিশেষ ঋণী, তিনি পৃথীশ নিয়োগী।

১৯৫৪ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫১ সালের সেন্সাসের পুরো ছাব্বিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেই উপলক্ষ্যে একটি ছোট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। প্রদর্শনীটি হয় রাজভবনের হাতায় সেন্সাসের 'নিসেন হাটে'। প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সঙ্গে অনেক অমূল্য ঐতিহাসিক বই, নথিপত্র, সেন্সাস সংক্রান্ত আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে অনেক প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য, অপ্রকাশিত, কোষাগারে-রক্ষিত, নথি, মানচিত্রাদি-সম্বলিত একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। কমলবাবু সেই প্রদর্শনীটি আদ্যোপান্ত একা হাতে সম্পন্ন করেন। বাহুল্যবর্জিত, এত সর্বাঙ্গসুন্দর, সালঙ্কার অথচ নিতান্ত স্বল্পখরচে এত নয়নাভিরাম ও শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনী দ্বিতীয় হয়েছে বলে আমি জানি না। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আনন্দ প্রকাশ করে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

১৯৫৪ সালে সেন্সাসের কাজ শেষ করে কমলবাবু সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিশুদের শ্রেণীতে পড়ানো শুরু করেন। শিশুদের মধ্যে সৃজনীশক্তি প্রকাশে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হন। তাদের দিয়ে তিনি 'লক্ষণের শক্তিশেল' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেন। সাউথ পয়েন্টের দেখাদেখি স্থানীয় আরো স্বচ্ছল একটি বিদ্যালয় তাঁকে অনেক বেশী মাইনে দিয়ে টানতে চান। একদিন বিকালে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পল ম্যানশনে এসে সংসার কিরকম জাহান্নামে যাচ্ছে সে কাজে আভার কাছে নালিশের সুরে জানালেন: 'এই দেখুন, আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাউথ পয়েন্টে মাসে আড়াই শ' টাকায় মহা আনন্দে আছি, আর ওরা আমার নাকের ডগায় মাসে সাড়ে সাত শ' টাকা মাইনের গাজর দোলাচ্ছে। তারা কি জানে না ওদের স্কুলে গেলে আমি এখানে যে আনন্দ ও স্বাধীনতা পাই, তার ছিটে-ফোঁটাও পাব না? ওরা নিজেদের কী ভাবে বলুন তো?'

আরো একটি মাথায় ছিটওলা, প্রায়-প্রতিভামণ্ডিত ভদ্রলোক সেন্সাসে কাজ করতে এলেন। নাম সুধাংশুকুমার রায়। গুরুসদয় দত্তের কাছে কাজকর্ম শিখে-ছিলেন। সুধাংশুবাবু যাবতীয় লোকশিল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রেণীবিভাগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রতিটি শিল্পের শৈলী ও বহু জীবিত ওস্তাদ কারিগরদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তাদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সমজাতীয় শিল্পের কী সাদৃশ্য ও পার্থক্য সে বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। দেশের কোন্ স্থানের কোন্ গ্রামে কোন্ বিশিষ্ট হস্তশিল্প তৈরি হয়, সে পাণ্ডিত্যে সুধাংশুবাবু ছিলেন অদ্বিতীয় ও

অপরাজেয়। যে-কোন হস্তশিল্প দেখে তিনি বলে দিতে পারতেন, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা কি আসামের কোন্ স্থানে কোন্ সম্প্রদায়ের, এমন-কি সময়ে সময়ে কোন্ কারিগরের হাতের তৈরি। ১৯৫১-৫৪, তিন বছর সেন্সাসে কাজ করে তিনি এক আশ্চর্য কীর্তি রেখে গেলেন, যা তাঁর পূর্বে অন্য কেউ করেননি। বইটির বিষয় হচ্ছে 'বঙ্গের কারিগরদের জাতিবিন্যাস ও তাদের শিল্প'। তাঁর লেখা আমি সংশোধন ও সম্পাদন করে আমার 'দি ট্রাইব্‌স্ অ্যাণ্ড কাস্ট্‌স্ অভ ওয়েস্ট-বেঙ্গল' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করি।

সেন্সাসে কাজ করার সময়ে আরেকটি লাভ হয়। রাজভবনের 'নিসেন হাট' থেকে ওয়াটার্লু স্ট্রীট ধরে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট পার হয়ে সোজা মেরিডিথ স্ট্রীট ধরে সেণ্ট্রাল এভেনিউতে পৌঁছন যায়। মেরিডিথ ও সেণ্ট্রালের মোড়ে একদিকে আছে কফি বোর্ডের কফি হাউস ও অন্যদিকে ভারত ভবন। কফি হাউসে তখনও ছিল, এখনও আছে, দুটি ভাগ। একেবারে মোড়ের কোণের দরজায় ছিল 'হাউস অভ কমন্‌স্' বা কম দামের কফির পরিবেশন। তার ঠিক পাশে, মেরিডিথের উপর দরজায় ছিল 'হাউস অভ লর্ড্‌স', অর্থাৎ একটু বেশী দামের কফি। হাউস অভ লর্ড্‌সের উত্তর-পশ্চিম চতুর্থাংশে ছিল যাকে বলে প্রিভি কাউন্সিল। সেখানে বসতেন সত্যেন রায়, এ-ডি খান, ছোটকু সেন প্রভৃতি উচ্চপদস্থ অফিসাররা। হাওড়া থেকে নিখিল সেন ও মেজর টুটু ঘোষ আমাকে প্রিভি কাউন্সিলে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা নিয়ে যেতেন। দক্ষিণ-পূর্ব চতুর্থাংশে বসত হাউস অভ লর্ডস্, এখানে বসতেন ডি-জে কীমার ও সিগনেট প্রেসের দিলীপ গুপ্ত, সত্যজিৎ রায়, টাটা সংস্থার রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত, বংশীধর চন্দ্রগুপ্ত, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রভৃতিরা। পুস্তক প্রকাশে সর্ববিষয়ে অগ্রণী ছিলেন সিগনেট প্রেস। সত্যজিৎ রায় ছিলেন সিগনেট প্রেসের প্রধান শিল্পী।

সেন্সাস রচনাবলী

সেন্সাস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে ক্রমান্বয়ে ঘোরাঘুরির সময়ে নানা ফন্দি মাথায় ঘুরত, ১৯৫১-র রিপোর্টে আমি নতুন কি কি আলোচনার প্রবর্তন করতে পারি। সেই সঙ্গে মেলাগুলির গেজেটিয়ারের নতুন সংস্করণ লেখার সময়ে আমি কি কি নতুন বিষয় বা সমস্যার প্রবর্তন করব, যা পূর্বে কখনও করা হয়নি। কি করে সেন্সাস দপ্তরের আয়ু একে একে বাড়িয়ে যেতে পারি যার কল্যাণে সেন্সাসের

উত্তরাধিকারীদের হাতে আমি পাকা চাকরিতে নিযুক্ত সুশিক্ষিত একাগ্রচিত্ত কর্মী রেখে যেতে পারি, সে চিন্তাও মাথায় ঘুরত।

১৯৫১-র সেন্সাস রিপোর্টে আমার পূর্বসূরীদের বাঁধা ছক ত্যাগ করে নতুন ছকের প্রবর্তন করি। দ্বিতীয়ত, স্থির করি, আগেকার প্রথামত তিনটি খণ্ডের স্থলে মোট ২৬টি খণ্ড প্রকাশ হবে। এই বিচারের মূলে অবশ্য ছিল ১৯৫০-এর কেন্দ্রীয় সেন্সাস কনফারেন্সে গৃহীত একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত: পূর্বের সেন্সাস প্রশ্নমালার থেকে এবারের প্রশ্নমালা আরো বড় ও অর্থপূর্ণ করতে হবে। সেই বর্ধিত প্রশ্ন-মালার ভিত্তিতে আরো বিচিত্র ও ব্যাপক সেন্সাস সারণির মালা তৈরি করতে হবে, তাতে থাকবে জনসংখ্যামূলক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরি-সংখ্যানের সম্ভার, যার সাহায্যে আমাদের রাষ্ট্রের ও সমাজের ব্যাপক পরিচয় মেলে এবং রাষ্ট্রীয় যোজনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভব হয়। সাধারণের ও বিশেষজ্ঞের যুগপৎ কাজে লাগে এরকম মানের জ্ঞান ও বোধগর্ভ পরিসংখ্যানের প্রবর্তন করতে হবে। শেষত, প্রতি জেলার জন্য আলাদা একটি খণ্ড প্রকাশ করতে হবে, যাতে থাকবে সেই জেলার গেজেটিয়ারের সঙ্গে প্রতিটি প্রশাসনিক খণ্ডভূমি—যেমন মহকুমা, থানা, গ্রাম—তার জনসংখ্যা-সম্বলিত সেন্সাসগত পরিসংখ্যানের সারাংশ। উপরন্তু থাকবে গ্রাম থেকে শুরু করে প্রতিটি খণ্ডভূমিতে রাজ্যপ্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে জনহিতার্থে কি কি কাজ হয়েছে, কত ব্যয় হয়েছে তার হিসাব।

১৮৭২ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত যে-সব সেন্সাস রিপোর্ট লেখা হয় তাতে মোটামুটি পাঁচটি পরিচ্ছেদ থাকত। প্রথম অধ্যায়ে থাকত প্রাকৃতিক বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গত দশ বছরে জনসংখ্যার নানাবিধ পরিবর্তনের বিবরণ। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে গত দশবছরে গ্রামীণ ও শহরের জনগণের মধ্যে কি ধরনের জনতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যা-ঘটিত কি ধরনের আদান-প্রদান কি হারে হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে থাকত ভারতীয় সেন্সাসের জীবিকাব্যবস্থার তালিকানুযায়ী জনগণের জীবিকা ও অবলম্বনের কি কি পরিবর্তন হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় উন্নতিমূলক যোজনার কাজে জনসংখ্যাভিত্তিক পরিসংখ্যান কি ভাবে কাজে লাগতে পারে সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার ভিত্তি করে স্থির করলুম, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক সম্পদ, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যানুসারে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি বড় বড় ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রথমে ভাগ করে, প্রতি অঞ্চলে

গত পঞ্চাশ বছরে কি ধরনের বিবর্তন ও পরিবর্তন এসেছে, কেন এসেছে, তাদের পারস্পরিক ও পারম্পরিক গতি কিভাবে কোন্ পরিবর্তনের দিকে চলেছে তার পরিসংখ্যানভিত্তিক নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা। আমি মোটামুটি আগেকার পাঁচটি অধ্যায়ের কাঠামো রাখা ঠিক করলুম, তবে প্রতিটিতে বিশেষ ঝোঁক থাকত গত পঞ্চাশ বছরে রাজ্যের অঞ্চলগুলিতে কোন দিকে, কি গতিতে, পরিবর্তন কিভাবে এসেছে, সে গতি শুভ না অশুভ, গ্রাম ও শহরের, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে গুণাগুণ পার্থক্য কিভাবে বাড়ছে বা কমছে তার পরিসংখ্যানভিত্তিক নির্ণয় করা। আমার রিপোর্টে সবশুদ্ধ ছয়টি অধ্যায় হল।

এই ধরনের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এইসব পরিবর্তনের জন্য সরকারি নীতি, পদ্ধতি, প্রশাসন কতখানি দায়ী। এই উপায় অবলম্বনের ফলে অতীতের সরকারি নীতি ও প্রশাসনপদ্ধতির সুফল, কুফল সম্বন্ধে যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক ও তথ্যসম্বলিত মতামত প্রকাশ করা সম্ভব হবে মনে হল। আমার রিপোর্টে সরকারি নীতির দীর্ঘমেয়াদী কুফল সম্বন্ধে মন্তব্য বাদ গেল না। বিশেষত ১৯৪৭-এর পর স্বাধীনোত্তর যুগেও যে-সব নীতির সংশোধনব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি।

তাঁর আদেশমত আমার রিপোর্টের খসড়া আমি যথারীতি ভারতের সেন্সাস কমিশনার আর-এ গোপালস্বামীকে পাঠালুম। তিনি আমাকে দিল্লীতে তলব করলেন। সেন্সাস রিপোর্ট প্রস্তুত ব্যাপারে ঐতিহ্যসিদ্ধ ছক ত্যাগ করে সমালোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি নিজেই অবশ্য ঐতিহ্যসিদ্ধ ছক ত্যাগ করে অতি উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত রাখলেন : একটিমাত্র মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে তাঁর রিপোর্টটি লিখলেন। বিষয় হল খাদ্য ও জনসংখ্যা। এই চমৎকার, উদ্ভাসময় আলোচনায় তিনি জনসংখ্যা-বৃদ্ধির লাগামহীন কুফল সম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করে, 'বেহিসাবী মাতৃত্বে'র যথাসম্ভব দ্রুত হ্রাসের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলেন। এই শব্দটি তাঁকে মুহূর্তে সারা জগতে স্থায়ী খ্যাতি এনে দিল। আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমার রিপোর্টে সরকারের অতীত ও বর্তমান নীতিবিরুদ্ধে যে-সব সমালোচনামূলক মন্তব্য আছে, কেটে বাদ দিতে হবে। সে-সব অংশ বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে, সেগুলি কিভাবে পুনরায় ঢেলে সাজাতে হবে, সে বিষয়েও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপদেশ দিলেন। আমি বললুম আমি যথাসম্ভব ধ্যান ও পরিশ্রম দিয়ে রিপোর্ট লিখেছি, অতএব তাঁর আদেশ ও নির্দেশ মানতে আমি অপারগ। যদি মনে করেন, তিনি আমার রিপোর্ট মনের মত করে কেটেছেঁটে সাজাতে পারেন, আমার আপত্তি

থাকবে না, তবে সে রিপোর্ট সেন্সাস কমিশনের নামে ছাপাতে হবে, তাঁর হাতের কাজে আমি আমার নাম দিতে রাজি নই। এতে অবশ্য স্বভাবতই তিনি রাজি হলেন না।

বিরক্তি ও বিচলিতভাব ভাল করে ঢাকতে না পারলেও, তিনি যথেষ্ট উদার স্বরে বললেন, বেশ, আমার রিপোর্ট আমার নামেই ছাপা হতে পারে, তবে প্রথম পৃষ্ঠাতে সুস্পষ্ট অক্ষরে শুধু এই বয়ানটুকু থাকবে যে, রিপোর্টে যে-সব মন্তব্য ও মতামত প্রকাশ হয়েছে সবই লেখকের ব্যক্তিগত মতামত, তার কোনটিই সরকারের নিজস্ব মতামত নাও হতে পারে। আমি তাঁর নির্দেশ মানতে রাজি হলুম। কলকাতায় ফিরে তাঁর আদিষ্ট বয়ানটি তাঁকে পাঠিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিলুম। তাঁর কাছে বিদায় নেবার সময়ে তিনি এই বলে শাসালেন, ভবিষ্যতে আমি কেন্দ্রীয় সরকারে কোন পদের আশা যেন আদৌ না রাখি। সে আশা যে আমার মন থেকে শতযোজন দূরে, সে বিষয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করে বিদায় নিলুম এই বলে, যে ১৯৪০ সালে আমি যখন আই-সি-এসে ভর্তি হই, তখন আমার মনে সবথেকে উচ্চতম আশা এই ছিল, যে অবসর গ্রহণের আগে বড়জোর কোন নগণ্য বিভাগে আমি স্বল্পকালের জন্য সেক্রেটারি হব।

গোপালস্বামীর আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না তার প্রমাণ পেলুম আমার রিপোর্টটি ছাপা হয়ে যখন প্রথম কয়েক কপি সংবাদপত্রগুলিকে দেয়া হল, কাগজে প্রধান তথ্যগুলি প্রকাশের জন্য। সরকারিভাবে প্রকাশের পরদিনই 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজের প্রথম ও ভিতরের একটি পাতায় রিপোর্টের বড় বড় অংশ সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ উদ্ধৃত হয়। যে অংশে এইগুলি ছাপা হয় 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে সেই জায়গাগুলি প্রধান সংবাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। বন্ধু সমর সেন ছিলেন তখন 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজের সাব-এডিটর, তাঁর উপর প্রতিবেদনের কপিটি তৈরি করার ভার পড়ে। যেদিন প্রতিবেদনটি ছাপা হয় সেদিন সন্ধ্যায় সমর আমার বাড়িতে এসে তাঁর সম্পাদকের সঙ্গে এ বিষয়ে যে আলাপ হয় তার কথা বললেন। 'কপি' তৈরি করে ছাপাখানায় দেবার আগে সমর কিছুটা শঙ্কিতচিত্তে 'কপি'টি হাতে করে সম্পাদকের সঙ্গে (ইয়ান স্টিভ্‌ন্‌স্ কি চার্লটন আমার ঠিক মনে নেই) দেখা করে কপিতে কি আছে তাঁকে জানান। সমর সম্পাদককে বলেন কোথা থেকে উদ্ধৃতিগুলি করা হয়েছে উৎসটির যদি উল্লেখ না করা হয়, তাহলে যে-কোন পাঠকের স্বভাবতই মনে হতে পারে ১৯০০ সাল থেকে সরকারের কাজে যে-সব গলদ জমেছে উদ্ধৃতিগুলি তারই বিরুদ্ধে বামপন্থী রায়। সমর আরো

বললেন, সম্পাদক শুনে বললেন, সরকার যখন রিপোর্টটি সরকারিভাবে ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পার্লামেন্টে যদি সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি ওঠে, তার যথাবিহিত প্রত্যুত্তর দেয়া হবে সরকারেরই কাজ; 'স্টেট্স্‌ম্যান' উদ্ধৃতিগুলি দিয়ে তার নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করেছে মাত্র, নিজের মন্তব্য তো জাহির করেনি।

রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়ে গঙ্গাবক্ষে অগ্নিকাণ্ড হয়ে যাবে, এই উচ্চাশার কোন কারণ ঘটেনি। তবে এইটুকু প্রমাণ হল, যে রিপোর্টটি সেইকালের জিজ্ঞাসু ও সপ্রশ্ন চিন্তারই পরিচয় দিয়েছিল। উপরন্তু সদ্য স্বাধীনতা লাভের পরে দেশ যে যে-কোন অনুযোগ বা বিরূপ মন্তব্য প্রকাশে অবিচলিত থেকে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে সে আত্মপ্রত্যয় জনসাধারণের মনে ছিল। সেই সঙ্গে রিপোর্টটি ১৯৫১ সালের অন্যান্য খণ্ডগুলি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগরূক করল।

১৯৫১ সালের রিপোর্ট লেখার প্রস্তুতি হিসাবে আমি ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, জন শোর ও কর্নওয়ালিসের রচনা ও মন্তব্যগুলি পুনরায় ভাল করে পড়ি। সেই সঙ্গে আঠারো শতকের ফিজিওক্র্যাট ও মার্কেণ্টাইলিস্টদের বাদানুবাদও অনুধাবন করি। ন্যাচরাল ল', মরাল ফিলজফি তর্কাদি, কেনে (Quesnay), অ্যাডাম স্মিথ, পরে ম্যালথাস ও রিকার্ডোর আলোচনাদি পড়ি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পড়ি হেন্‌রি মে'ন, এবং আঠারো শতকের শেষের হেন্‌রি টেলর, কোলব্রুক ও ফ্রান্সিস বিউক্যানন হ্যামিলটন। এরপর আসে বহু আঞ্চলিক ইতিহাস, আঞ্চলিক উপজাতি ও কৃষক বিদ্রোহের বিবরণ ও বিশ্লেষণ, বিশেষ কাজে দেয় এন-কে সিংহ ও বিনয় চৌধুরীর কৃষক বিদ্রোহ বিষয়ে রচনাদি। তার পর এলেন ডব্লিউ-ডব্লিউ হাণ্টার, ডল্‌টন্‌, রিজলি, গেট, ও'ম্যালি ও হাটন্‌। ভূমিস্বত্ব প্রশ্নের অনুধাবনে পড়তে হয় নানা প্রকারের সাহিত্য, প্রধানত উনিশ শতকের শেষের ও বিশ শতকের জেলাওয়ারি সেটল্‌মেণ্ট রিপোর্ট, ফ্যামিজ্ঞারের রিপোর্ট, থাকবস্ত্‌ সার্ভের রিপোর্ট। এই ধরনের পড়াশোনার কেন্দ্রস্থল হয় গতশতকের শেষ চতুর্থাংশে লেখা ও প্রকাশিত গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, অসাধারণ, শ্রম, সততা ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে একের পর এক দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টগুলি। এইসব রিপোর্টগুলির মধ্যেই আমি একে একে খুঁজে পেলুম সেই উদ্ধৃতিগুলি যেগুলি ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 'বসুমতী' পত্রিকায় দিনের পর দিন প্রকাশ করতেন। এইসব উদ্ধৃতি থেকে আমার দৃঢ় ধারণা হয় ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের অন্তর্নিহিত কারণগুলি পূর্বযুগের দুর্ভিক্ষগুলির থেকে ছিল সম্পূর্ণ তফাৎ।

রাইটার্স বিল্ডিংসের সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি ও প্রেসিডেন্সী কমিশনারের লাইব্রেরি ছিল এইসব বই ও নথির অতি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। প্রসঙ্গত বলি, সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরিটি পুনঃ-সংস্কারে তখন সাহায্য করি বলে আমি ১৯৮৭-৯০ সালে এই স্মৃতিকথা লেখার সময়ে এই লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের অকুণ্ঠ সাহায্য পাই। দুটি লাইব্রেরির কৃপায় অনেক দলিল আমার প্রকাশনাগুলিতে পুনর্মুদ্রিত করা সম্ভব হয়। তখন জিরোক্স ছিল না, ফলে প্রতিটি জিনিসই আদ্যোপান্ত নকল, টাইপ ও মূলের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করে ছাপাখানায় দিতে হত। বিশেষ করে সে-সব দলিল যা কোন জেলার বর্তমান অবস্থা বোঝার পক্ষে ঐতিহাসিক তথ্য ও বিবরণ যুগিয়ে সাহায্য করে, এবং যেগুলি সাধারণ পাঠকের অজানা ছিল, কিংবা স্মৃতি থেকে প্রায় অবলুপ্ত, অথবা সহজে পাওয়া যেত না। দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করি কোলব্রুকের 'দি হাজব্যাণ্ড্রি অভ বেঙ্গল', অথবা বিউক্যানন হ্যামিলটনের অনেকগুলি জেলার পরিসংখ্যান-সম্বলিত বিবরণ, অথবা চুয়াড় বিদ্রোহ কিংবা ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের বিবরণ। কিংবা ধরুন জর্জ কিং লিখিত শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের ইতিহাস, অথবা জেমস্ হুকারের 'জার্নাল' থেকে উদ্ধৃতিগুলি। উদ্ধৃতিগুলির ব্যাপকতার আন্দাজ দেবার জন্য আমি এখানে সামান্য উল্লেখ করলুম।

এই শতকের প্রথম দুই দশকে যে জেলা গেজেটিয়ারগুলি প্রকাশিত হয় তাদের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার সংকল্প আমার মনে জাগে। হাণ্টারের সময়ে গেজেটিয়ার রচনার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় সেই ঐতিহ্য আমি অনুসরণ করলুম। ১৮৭০-এর দশকে প্রকাশিত হাণ্টারের জেলা বিবরণীগুলি হল আমার প্রচেষ্টার ভিত্তি। ১৯১০-২০ সালের গেজেটিয়ার লেখকদের পদানুসরণ করে যেখানেই হাণ্টারের ভাষা অপরিবর্তিত রাখা যায় সেখানে অপরিবর্তিত রেখে, যেখানে সংশোধন বা পরিবর্ধন আবশ্যক সেখানেই শুধু সে অংশ বা অধ্যায়গুলি আমি নতুন করে সম্পাদনা করি অথবা নতুন তথ্য ও মন্তব্য যোগ করি। আমার গেজেটিয়ার রচনাগুলি আগের থেকে একটু লম্বা ও বিশদ হয় কারণ ১৮৭০-১৯২০-তে পরিবর্তনের হার ও গতির থেকে ১৯২০-৫০-এর যুগে এই হার ও গতি অনেক বেশী ও দ্রুত হয়। ইতিমধ্যে অবশ্য ১৮৭০ বা ১৯২০ থেকে পরিসংখ্যান সংগ্রহের গুণগত মান ও পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি ও উন্নতি হওয়ায় আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। উপরন্তু নিজে সর্বত্র ঘুরে বেড়ানর ফলে আমার দখল ও আত্মবিশ্বাসও বেশী হয়।

নিচের গল্পটি থেকেই পাঠক সামান্য আন্দাজ পাবেন, জেলা গেজেটিয়ারগুলি সংশোধন ও পরিবর্তন করার আগে আমি কি ধরনের ঘোরাঘুরি করে স্বচক্ষে যাচাই করেছি। ১৯৫২ সালে ডেভেলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ শুরু করার ঠিক আগে, জলপাইগুড়ি জেলার গেজেটিয়ারের নতুন সংস্করণে প্রবৃত্ত হবার আশায় সে জেলার সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। জেলার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন আমার বন্ধু রঘুনাথ ব্যানার্জি। জেলার বনবিভাগের কর্তা ছিলেন জয়ন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। দুজনেই বন্ধু হিসাবে হাসিঠাট্টায় গল্পে দিন কাটাবার পক্ষে অতুলনীয়। সফরের সময়ে রঘু জীপের ষ্টিয়ারিং-এ বসতেন। প্রত্যহ সকালে ঘড়ি ধরে সাড়ে নয়টার সময়ে খেয়েদেয়ে বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে জীপে তিনজনে উঠতুম। পিছনে আরেকটি গাড়িতে থাকত ড্রাইভার ও দুজন পিয়ন। প্রতিদিন বেশ রাত্রে আমরা কোন বনবিভাগের বিশ্রামাগারে পৌঁছে, খেয়েদেয়ে, গল্প করে, নোট লিখে, সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘুমোতুম। সেকালে বনবিভাগের বিশ্রামাগারগুলি হত সরু তারের জালে চারদিকে মোড়া, সুতরাং মশার উপদ্রব থাকত না। সমস্ত ব্যবস্থা হত অতি সুন্দর, প্রত্যেকটি বিশ্রামাগারে থাকত একজন ওস্তাদ বাবুর্চি। সারাদিন পরিশ্রম করে ঘুরে ঘুরে নানা স্থান দেখে, মাঝে মাঝে নেমে স্থানীয় বাসিন্দাদের গ্রাম ও শহর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে নোট নিতুম। প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে দেড়শ' মাইল করে আটদিন একনাগাড়ে ঘুরলুম। প্রাকৃতিক সম্পদের খবর, নদীগুলির গতিবিধি; গাছপালা, জীবজন্তু, পাখি সম্বন্ধে খোঁজ নিতুম। যেমন নীলপাড়া রিজার্ভ বনের রেঞ্জারদের কাছ থেকে তাঁদের বনের জীবজন্তু, পশু-পক্ষীর পুরো তালিকা নকল করে নিয়েছি। তা ছাড়া, প্রতি বাংলার খাতায় থাকত আগেকার বনবিভাগীয় অধিকারীদের স্বচক্ষে দেখা বহু ভবঘুরে মৌশুমী পাখির তালিকা, যে-সব পাখি বহুদূর দেশ থেকে উড়ে এসে, কয়েকদিন থেকে আবার অন্যত্র উড়ে যেত। এই ধরনের তালিকা ও বিবরণ তৈরি ব্যাপারে তখনকার দিনের বনবিভাগের কর্তারা ও রেঞ্জাররা ছিলেন সুপণ্ডিত, সিদ্ধহস্ত, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বোধসম্পন্ন। বলা বাহুল্য আমরা প্রতিটি জনপদে স্থানীয় বসতি সম্বন্ধে অধুনাতম তথ্য আহরণ করতুম। দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তু আসার ফলে সারা জেলাময় ব্যাঙের ছাতার মত বসতি গজিয়ে ওঠে। এই সফরে আমরা একটি গোটা সকাল আলিপুরদুয়ারের বক্সাদুয়ার জেলে ঘুরে দেখে কাটাই। এবং সেখানকার নথিপত্র থেকে কোন্ কোন্ রাজবন্দী সেখানে কারাবাসে কাটিয়েছেন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করি।

এত ঘোরাঘুরি ও অবিরাম জীপ চালানোর পরে রঘু কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। শুধু যে অতি দক্ষ জীপচালক ছিলেন তা নয়, সারাক্ষণ আমাকে মুখে মুখে নানা তথ্য বলে গেছেন, কোথায় কী আছে, নতুন কী হচ্ছে। আমিও সবকিছু সংক্ষেপে টুকে নিয়েছি। অনেক উদ্ভট সংবাদও তার মধ্যে ছিল, যেমন তিস্তা বা রায়ডাক নদী ঘণ্টায় কত মাইল বেগে বহে, মোট কত জল নিষ্কাষণ করে। পুরো আটদিন এই ধরনের ঘোরাঘুরি করে আমি যখন অষ্টম-দিনের সন্ধ্যায় কলকাতায় ফেরার জন্য ট্রেনে উঠেছি, এবং ট্রেন আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গতি নিতে শুরু করেছে, এমন সময়ে রঘু চেঁচিয়ে বললেন, 'অশোক, প্রেসে দেবার আগে তুমি আমাকে তোমার খসড়া পাঠিও, আমি দেখে দেব। যা কিছু বলেছি সবই বেদবাক্য বলে ধরে নিও না।' ট্রেন প্ল্যাটফর্মের শেষে পৌঁছেছে। রঘু যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, গায়ে অসম্ভব শক্তি, প্রায় হেমিংওয়ের মত চেহারা। শুধু দাড়ি নেই, এই যা। আমি চেঁচিয়ে বললুম 'ক্ষেপেছো, রঘু, তুমি অত ফলাও করে বলছিলে, আমি তোমাকে উৎসাহ দেবার জন্য সব লিখে নিচ্ছিলুম, তা না হলে অভদ্রতা হয়। নিশ্চয় জানো যা বলেছো আমি সবকিছু বেমালুম উগরে দোবো না। বেমালুম, টোপ-ফাতনা সবকিছু গেলার মত লোক আমি নই।' শুনে রঘু এমনভাবে তাকালো, মনে হল হাতে পেলে আমার মাথাটি গুঁড়িয়ে দেবে। ট্রেন চলে গেল।

পরের দিন রঘুর ভাই দেবু, যে আমার কাছে বহরমপুরে ট্রেনিং-এ ছিল, যতীন দাস রোড থেকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন গলায় পল ম্যানশনে ফোন করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হবার আগে রঘুর হৃদ্‌রোগের অসুখ শুরু হয়েছে কিনা। 'হৃদ্‌রোগ, কিসের হৃদ্‌রোগ?' আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লুম। আমার কথা শুনে কি তার মনে হঠাৎ আঘাত লেগে হৃদ্‌রোগ? কয়েকদিন পরে জয়ন্তর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলুম। রঘু দেবুকে ফোন করে বলে আমাকে যেন বলে তার হৃদ্‌রোগ হয়েছে, যাতে আমার এই ধরনের রূঢ় কথা বলার জন্য বিবেকদংশন হয়!

অন্যান্য ফলাফল

১৯৫১ সেন্সাসে ব্যক্তিগত লোকগণনার স্লিপটিতে সর্বভারতে প্রযোজ্য প্রশ্নাবলী ছাড়াও শেষ একটি বাড়তি প্রশ্নের জন্য স্থান প্রতি রাজ্যকে দেয়া হল। রাজ্যের

নিজস্ব কোন বিশেষ অনুসন্ধান করার ইচ্ছা থাকলে এই স্থানটি ব্যবহার করতে পারবে। গৃহতালিকা প্রস্তুতির সময়ে আমরা নমুনা হিসাবে বিবাহিত নারীদের সন্তানাদি সম্বন্ধে যে প্রশ্নপত্র শৈলেনদার উদ্যোগে প্রবর্তন করি তার কথা উপরে লিখেছি। শৈলেনদা এই প্রশ্নপত্রের উত্তর থেকে কয়েকটি বিশেষ সারণি প্রস্তুত করান, তাদের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের নারীদের সন্তানধারণ, শিশুমৃত্যু, ছেলে ও মেয়ে শিশুর মৃত্যুহারের পার্থক্য, প্রতি দুই জন্মের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোকদের সন্তান জন্মদান শুরু হয়, জন্মহার সবথেকে বেশী হয়, এবং কোন্ বয়সে কমে যায়, সন্তানমৃত্যুর বিস্তৃতি কতখানি হয়, তার অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। শৈলেনদার গবেষণা কাজটি ১৯৫১ সেন্সাস রিপোর্টের ১সি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দেশ বিদেশের পণ্ডিত সমাজে এই গবেষণাটি বিশেষ সমাদর পায়। এই গবেষণাক্ষেত্রে সুপণ্ডিত, বিখ্যাত গবেষক ক্রিস্টোফার টীৎজে ১৯৫২-৫৩ সালে কলকাতায় এসে শৈলেনদার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শৈলেনদার সাকরেদ হিসাবে টীৎজের কাছে আমি বিশেষ স্নেহ ও সম্মান পেয়েছি। টীৎজে পরে নিউইয়র্কের পপুলেশন কাউন্সিলে ছিলেন, সম্প্রতি মারা গেছেন।

মালদা ও মুর্শিদাবাদে কাজ করার সময়ে আমি ভাগ ও মজুর চাষীদের সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি সে-বিষয়ে অনুসন্ধানার্থে আমি ব্যক্তিগত স্লিপের যে স্থানটি রাজ্যের অনুসন্ধানের জন্য প্রদত্ত হয়েছিল সেটির সদ্ব্যবহার করা মনস্থ করি। ভাগচাষে কতলোক কতখানি জমি দেন, এবং কত ভাগচাষী কি কি পরিমাণ জমির ভাগচাষে নিযুক্ত এবং কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে এই ভাগচাষের পরিমাণ কত বেশী ও ব্যাপক—এই অনুসন্ধান করা স্থির করি। মালদা ও মুর্শিদাবাদে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয় তার ফলে চল্লিশ দশকের প্রথমার্ধে এইচ-এস-এম ঈশাক তাঁর 'প্লট টু প্লট সার্ভে'তে যে তথ্যাদি আহরণ করেন, তাদের যথার্থতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ জাগে। মনে হয় ভাগচাষের ব্যাপকতা ও পরিমাণ সে অনুসন্ধানে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। স্মরণ থাকতে পারে ঈশাক সাহেব তাঁর তথ্যাদি আহরণ করেন সেট্‌ল্‌মেন্ট রেকর্ডগুলি থেকে, এবং যাচাই হয় ভূস্বামীর কাছে যে-সব দলিল ছিল তাদের উপর ভিত্তি করে। নথির বাইরে সরেজমিনে কে কি স্বত্বে ভোগদখল ক'রে জমি চাষ করছে বা করাচ্ছে এবং ফসল তুলছে, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করাই হল আমার উদ্দেশ্য। লক্ষ্য ছিল সেন্সাস গণনার সময়ে প্রতি চাষী-পরিবারে কত জমি ভাগে দেয়া হয়েছে, কত জমি ভাগে নেয়া হয়েছে, কত জমি ভাগে চাষ হয়েছে

তার প্রত্যক্ষ হিসাব নেয়া। চাষী সেই তথ্য দেবে সেন্সাস আইনের গোপনতা-রক্ষার ধারার আশ্বাসে। আমার সন্দেহ ছিল ভাগচাষের আসল পরিমাণ ও ব্যাপ্তি, নথিপত্রে যা আছে, তার থেকে অনেকগুণ বেশী।

তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের ফলে আমারই অনুমান সত্য বলে প্রতিপন্ন হল। শুধু তাই নয়, যথার্থ পরিমাণ ও ব্যাপ্তি বিষয়ে আমি মালদায় ও মুর্শিদাবাদে মোটামুটি যে অনুমান করেছিলুম তারই কাছাকাছি গেল। ঈশাক সাহেবের পরিসংখ্যানাদি আসল পরিমাণের থেকে অনেক কম ছিল। এই সব তথ্য ও সেট্‌ল্‌মেণ্ট এবং ঈশাকদত্ত পরিসংখ্যানের বিশদ তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সেন্সাসে আমার 'অ্যান অ্যাকাউণ্ট অভ ল্যাণ্ড-ম্যানেজমেণ্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৮৭২-১৯৫২' বইয়ে। ১৯৫৪ সালে বর্গাদার রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে সরকার যে আইন প্রণয়ন করেন, তার মূলে এই কাজটির কিছু তত্ত্ব ও তথ্যমূলক অবদান ছিল।

আরেকটি বই প্রকাশিত হয়, তার নাম হল 'দি ট্রাইব্‌স্ অ্যাণ্ড কাস্টম্‌স্ অভ ওয়েস্ট বেঙ্গল'। এটি জাতি ও উপজাতিদের বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের রচনার সমষ্টি। এর কথাই মনে রেখে ১৯৬১ সালের সেন্সাসে পণ্ডিতব্যক্তিদের আহ্বান করে বিশেষ বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখানো, ও সরকারের ব্যয়ে তাঁদের নিজ নিজ নামে প্রকাশিত হয়। বইটির শুরু হয় শৈলেনদার কতগুলি সম্পাদনা দিয়ে। এর পরে সুধাংশুকুমার রায় প্রণীত পশ্চিমবঙ্গের কারিগর জাতিগুলির বিবরণ ও তাদের শিল্প সম্বন্ধে প্রণীত প্রামাণ্য কাজ। তারপর আসে আমন্ত্রিত পণ্ডিতদের প্রবন্ধাবলী: যথা ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আশুতোষ ভট্টাচার্য। তদুপরি প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের শেষে রিজলি-আহৃত বহু নৃতাত্ত্বিক মাপজোপের বিশ্লেষণ-সম্বলিত গবেষণা, যা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের গবেষণাগারেও এ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি।

ইংরেজিতে লেখা আমার সেন্সাস রিপোর্টের অল্পবয়স্কদের পক্ষে সুখপাঠ্য একটি বাংলাভাষায় সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেন, মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মালখানগর গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক ভূদেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বহু বছর জাতীয় গ্রন্থাগারে সহকারী গ্রন্থাগারিক ও বিশিষ্ট লেখক হিসাবে যশোলাভ করে এখনও সরস্বতীর বন্দনা করে চলেছেন। বইটি অল্পবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের জন্যই লেখা। অনুবাদক বইটির একটি সুন্দর নাম দেন, 'আমার দেশ'।

সেন্সাস অফিস চালু রাখা

১৯৫২ সালে আর-এ গোপালস্বামীর পদোন্নতি হয়ে নতুন চাকরি হল। আমারই সতীর্থ, উত্তরপ্রদেশের রাজেশ্বরী প্রসাদ, ডেপুটি রেজিস্টার জেনরলের পদ পেয়ে গোপালস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হন। সেন্সাসের প্রতি তাঁর টান ছিল, এবং আমার সেন্সাস দপ্তর যাতে চালু থাকে সে বিষয়ে খুব সাহায্য করতেন। তার একটি কারণ ছিল। কোন অধস্তন অফিস চালু থাকলে কেন্দ্রীয় দপ্তর চালিয়ে যাবার একটি সঙ্গত কারণ হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে লেজই কুকুরকে নাড়ায়। তাঁর আগ্রহে ও উৎসাহে আমি একটি বড় রকম কাজে প্রবৃত্ত হলুম। স্বদেশত্যাগী ভারতের অন্যত্রবাসী জনগণের জন্য এ পর্যন্ত ফলাও-করে কোন সারণি তৈরি হয়নি। কলকাতার শিল্পাঞ্চলে অন্যরাজ্যের বহিরাগত যত লোক আছে, তাদের জন্মস্থান, মাতৃভাষা, বয়স, স্থিতি, লেখাপড়া, জীবিকা—এইসব বিষয়ের পরস্পর সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান তৈরি করা শুরু করলুম। এরই সঙ্গে সমানে চালু হল পারিবারিক গড়ন ও গুণাগুণ পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ। একটু পরে শুরু হল পুজা, পরব, পার্বণ-মেলাসংক্রান্ত অনুসন্ধানের প্রস্তুতি। উপরন্তু ১৯৫২ সাল থেকে শুরু হয়ে যে-সব বই মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে তার মুদ্রণের ব্যবস্থা। এই ক্রমে বছরগুলি একে একে গড়িয়ে যখন ১৯৫৮ সালে এল তখন আমি সেন্সাস কমিশনারের কাজে দিল্লী গেলুম। ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালের ১৫ জুলাই থেকে আমি সেন্সাস কাজের উপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে একের পর এক কাজে যোগ দিয়েছি ও করেছি—প্রথমে ডেভেলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে পর পর দুই পদে, তারপর বর্ধমান জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পদে, তারপর গৃহমন্ত্রকের দুর্নীতি দমন সচিব পদে, অবশেষে শিল্প, বিদ্যুৎ, বাণিজ্য, ক্ষুদ্রশিল্প, কুটিরশিল্প, সমবায় ও মৎস্যমন্ত্রকের সচিব পদে। ঐ-সব পদে কাজ করার সময়ে রাজেশ্বরী প্রসাদের আনুকূল্যে বরাবর অবৈতনিক সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে সেন্সাস দপ্তর আমার একান্ত অধিকারে ছিল। ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে ব্যবস্থার অনুমোদন করেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস অবলীলাক্রমে ১৯৬১ সালের সেন্সাসের ভার নিতে সমর্থ হয় এবং অন্যান্য রাজ্যেও পুরনো কর্মিদের ফিরিয়ে আনতে অসুবিধা হয়নি।

১৯৫১ সালের পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাসের যে সাতাশটি বই প্রকাশিত হয় তা এইরকম: জনগণনার রিপোর্ট ও বিশ্লেষণ, ২ খণ্ড: জন্ম-মৃত্যুহার ও বিশ্লেষণ ১৯৪১-৫০; জনগণনা সারণি; কলিকাতা মহানগরী; কলিকাতা শিল্পাঞ্চল;

জনগণনার সংগঠন বিবরণী; পশ্চিমবঙ্গের জাতি ও উপজাতি; পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিবরণী ১৮৭২-১৯৫০; পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও উৎসব; পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলার গেজেটিয়ার ও পরিসংখ্যান, ১৪ খণ্ড; পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত প্রাচীন কীর্তিসমূহ; আমার দেশ; ও 'মারে হাপরাম কো রেয়াঃক কথা'।

১৯৬১ সালের সেন্সাস ও পন্থজী

১৯৫৮ সালের জুন-জুলাই মাসে যখন আমি সেন্সাস কমিশনারের কাজে যোগ দেবার আদেশ পেলুম, তখন আমি একটু বিস্মিত হলুম, এই ভেবে গোপালস্বামী যে আমাকে শাসিয়েছিলেন, আমি কোনদিন কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করতে পাব না, সেই হুমকির কি হল! সে যাই হোক আমার সব থেকে ক্ষোভ হল, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে আর কাজ করা হবে না। একবার ভারতের সেন্সাসে যোগ দিলে ১৯৬৫-র আগে হয়তো ফিরতে পারব না, ততদিন ডাঃ রায় নাও থাকতে পারেন, কারণ তখনই তাঁর বয়স ছিয়াত্তর। পণ্ডিতজীর কাছে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হবে না জানতুম। পশ্চিমবঙ্গে কাজ করার সময়ে যে-সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়, যেমন—স্বরণ সিং, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, মোরারজি দেশাই, জগজীবন রাম, কে-এল-বাড, মনুভাই শাহ, টি-টি কৃষ্ণমাচারী (ইনি মুন্দ্রার মামলায় জড়িত হয়ে পড়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন), নিত্যানন্দ কানুনগো—কেউই ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রের ঔদার্যে ডাঃ রায়ের কাছাকাছিও যেতেন না। নতুন কাজে গোবিন্দবল্লভ পন্থ হলেন আমার মন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সম্প্রতি এসেছেন গৃহমন্ত্রী হয়ে। গৃহমন্ত্রকের বিশেষ সচিব, ভি-বিশ্বনাথন, ওরফে ভিশি, সেন্সাস দপ্তরেরও সচিব ছিলেন। আমি হলুম রেজিস্ট্রার ও সেন্সাস কমিশনার, তবে সরকারি পদমর্যাদায় যুগ্মসচিব। সেন্সাসের দায়িত্বে ভিশি ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গেই ছিল আমার সম্বন্ধ। গৃহমন্ত্রকের যে যুগ্মসচিব আমার দপ্তর দেখতেন তাঁর নাম ছিল ফতে সিং, তিনিও অত্যন্ত অমায়িক ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। ভিশি ছিলেন অসাধারণ লোক, বড় বড় কথা বা হামবড়াভাব একেবারে ছিল না। সে বিষয়ে সত্যেন রায়ের আশ্চর্য জুড়ি বলা যায়। প্রথমবার দেখা করতে গেলুম, বললেন, 'ও, তুমি! পন্থজী আমাকে কাজটি না দিয়ে তোমাকে দিয়েছেন! বললেন, আমি নাকি তোমার মত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে পারব না, আর সেন্সাসের কাজে একবার ঢুকলে এদিক-ওদিক তাকাবার জো

নেই, একেবারে মুখ বুজে কাজ করে যেতে হবে। এস-এন রায়ের মত লোক যখন তোমাকে ভাল বলেছে, তুমি খারাপ লোক হতে পার না। লোকটা মরদ বটে। ভেবে দেখ, আমাদের মধ্যে ঐ একমাত্র লোক যে প্রতি রাতে একজন মন্ত্রীর সঙ্গে শোয়; হাঃ হাঃ।' শ্রীমতী রেণুকা রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করতেন।

সাউথ ব্লকের (তখন গৃহমন্ত্রক ছিল সাউথ ব্লকে) বুক চাপা আবহাওয়ায় ভিশির কাছে আমি স্বস্তি পেলুম। অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন, প্রায় শৈলেনদার মত, যেমন সংস্কৃতে দক্ষ, তেমনি ইতিহাসে ও অঙ্কে। অন্যদিকে স্নেহাংশু আচার্যের মত অশ্লীল গল্প ও ঠাট্টায় ছিলেন ওস্তাদ।

গৃহমন্ত্রকের তথ্য ও সংবাদ অফিসার ছিলেন কুলদীপ নায়ার। আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে এলেন, খুব ভাব হয়ে গেল। আমাকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন, পন্থজী কখনও সময় রাখেন না। যে সময় দেবেন, কমপক্ষে অন্তত একঘণ্টা অপেক্ষা করার জন্য যেন তৈরি থাকি। পন্থজী সাক্ষাতের সময় দিলেন বিকাল পাঁচটার সময়ে। আমি পৌনে পাঁচটায় ওঁর বাড়িতে হাজির। আশ্চর্য হয়ে গেলুম, কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় ডাক পড়ল। শুনেছিলুম পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা পছন্দ করেন। মহারাষ্ট্র থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ কুমায়ুন পর্বতে আহুত হয়ে সেখানেই তাঁর পুরোহিত বংশ বৃদ্ধি করেন। বাবার ছেলে হয়ে যাকে-তাকে প্রণাম করায় আমার আপত্তি, বিশেষত মনিবকে। একবার বাবার সমুখে আভা জয়ন্তীকে কোন এক ভদ্রলোককে প্রণাম করতে বলে। জয়ন্তী গোঁ ধরে প্রণাম করেনি। বাবা সেই থেকে আভাকে আদেশ দেন জয়ন্তীকে যেন কারোকে প্রণাম করতে বলা না হয়। সাধারণত নমস্কার করবে, যদি কখনো নিজে থেকে ইচ্ছে হয় প্রণাম করবে। আমি আমার স্বভাবমত সমুখ দিকে ঝুঁকে মাথা নিচু করে দু'হাতে নমস্কার করলুম। মনে হল পন্থজী কিছু মনে করলেন না, পাশের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বসতে বললেন। চেলাপতি রাও লিখেছেন তিনি অসহযোগের সময়ে পুলিশের হাতে লাঠির ভীষণ ঘা খেয়েছিলেন, তারপর থেকে তাঁর মাথা ও হাতদুটিতে সর্বক্ষণ নড়া রোগ হয়ে গেল, এক ধরনের পক্ষাঘাতে যেমন হয়। উদার পিতৃতুল্য ব্যবহার, বললেন, এখনও যথেষ্ট সময় আছে, আমি যেন প্রস্তুতির জন্য এখন ধীরেসুস্থে ইচ্ছামত পড়াশোনা করি। তাতে আগামী সেন্সাসের খসড়া-প্রস্তাব তৈরি করতে সুবিধা হবে। সেন্সাস সম্বন্ধে তাঁর পড়াশোনা দেখলুম খুব ভাল। আশ্চর্য হয়ে গেলুম যুক্তপ্রদেশের ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের সেন্সাস থেকে

লম্বা লম্বা অংশ মুখস্থ করা আবৃত্তির মত বলে গেলেন।

তারপর থেকে যতদিন বেঁচে ছিলেন, পাঁচ ছয় সপ্তাহ অন্তর একবার করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতুম। প্রতিবারই ভিতরের বাগানের দিকের দরজাওলা একটি ঘরে ডাক পড়ত। বাগানের দিকে খোলা দরজার পাশে সেকালের বড় আরামকেদারার মত চেয়ারে, যার হাতা লম্বায় বাড়ানো যায়, সেই লম্বা করা হাতার উপর পা তুলে দুদিকে ছড়িয়ে প্রায় আধশোয়া অবস্থায় থাকতেন। চোখের উপর ঝাঁকড়া ঘন ভুরু, সিংহঘোটকের মত গোঁফ। মনে হত একটি বিরাট পাথর কেটে দেহটি তৈরি। কতকটা ম্যাক্সিম গোর্কির মত দেখতে। বাঁ-পাশের কাছের চেয়ারে হাত দেখিয়ে বসতে বলতেন। যে কেউ আসত, নমস্কার না করে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। প্রণাম করবে জেনে বা আন্দাজ করে তিনি খালি পা দুটি চেয়ারের হাতলের উপর তুলে, ঈষৎ এগিয়ে দিয়ে বুড়ো আঙুল দুটি একটু নাড়তেন, আর আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে একটু যেন চোখ মটকাতেন। পাছে হাসিতে গা নড়ে ওঠে, এই ভয়ে ওঁর চোখ দেখামাত্রই আমি অন্যদিকে তাকাতুম। যখনই দেখতেন বগলে একতাড়া কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকছি, মেঘমন্দ্র ঈষৎ কম্পমান গলায় বলতেন, 'আরো টাকা চাইতে এসেছ মনে হচ্ছে? এবার কোন্ বিষয়ে? কাগজগুলি রেখে যাও, পড়ে দেখব।' বলে, সস্নেহকণ্ঠে কাজ কেমন হচ্ছে জিজ্ঞেস করতেন। পন্থজী একবার অনুমোদন করলে ভিশির কাছে টাকা পাওয়া সহজ হত। মাত্র কয়েক হাজারের বেশী টাকা কখনও প্রথমে চাইতুম না। শুরু করার জন্য বড়জোর পঁচিশ ত্রিশ হাজার। একবার মঞ্জুর হয়ে কাজ চালু হলে সেই পঁচিশ ত্রিশ হাজারের ছুঁচ দশ পনেরো লাখের ফাল হয়ে বেরনো খুব মুস্কিলের ব্যাপার হত না। এই ছিল সরকারি কাজে মজা, সেজই কুকুরকে নাচায়। ভিশি এই ধরনের প্রস্তাব দেখলেই বকাধমকার সুরে বলতেন, তুমিই সরকারকে ফাঁসাবে! আমার বিশেষ সৌভাগ্য এমন মন্ত্রী ও সেক্রেটারি পেয়েছিলুম। পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস করে কি করে নানা-ধরনের অনুসন্ধান ফেঁদে কাজ বাড়াতে হয়, সে বিষয়ে কিছু ধ্যানধারণা হয়েছিল। পন্থজী আর ভিশি সেগুলি সমর্থন করতে ছিলেন সদাই প্রস্তুত।

আগে থেকে প্রতি রাজ্যের চীফ সেক্রেটারিকে চিঠি লিখতুম, রাজ্যের জন্য একটি ভাল অফিসার যাচ্ঞা করে। চীফ সেক্রেটারি সম্ভাব্য ব্যক্তিদের একটি তালিকা করে রাখতেন। রাজ্যের রাজধানীতে নিজে গিয়ে চীফ সেক্রেটারি ও সুযোগ হলে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মনের মত প্রাদেশিক অধিকর্তাকে বেছে

নিতুম। সবথেকে মজা হয়েছিল পাঞ্জাবে। চণ্ডীগড়ে গেছি। তখন পাঞ্জাব অবিভক্ত ছিল, অর্থাৎ হরিয়ানা ভাগ হয়ে যায়নি। চীফ সেক্রেটারি ছিলেন ই-এন মঙ্গৎরায়। কয়েকটি নাম আমার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি বরং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর, উনিই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী তখন প্রতাপসিং কায়রোঁ। পশ্চিমবঙ্গে বিধানচন্দ্র রায়ের যেরকম সুনাম ছিল, পাঞ্জাবে সেই ধরনের নাম ছিল প্রতাপসিং কায়রোঁর। তবে এও সুনাম ছিল যে কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি সবকিছু করতে পারেন। আমাকে কায়রোঁর কথা বলেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে বললেন আমাকে পাঠাচ্ছেন। দরজার সমুখে পিওনকে কার্ড দেবামাত্র, ভিতরে ডাক পড়ল। প্রকাণ্ড লম্বা ঘর, ঝকঝক তকতক করছে। শেষপ্রান্তে একটি মাঝারি সাইজের টেবিল, তার পিছনে প্রতাপসিং কায়রোঁ বসে। পশ্চিমবঙ্গে থাকতে প্ল্যানিং কমিশনের মিটিং-এ দিল্লীতে তাঁকে দেখেছি। ঢোকামাত্রই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে আমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ঘরের মাঝখানের সোফায় বসিয়ে পাশে বসলেন। সম্ভাষণ বিনিময়ের পর, আমার আসার কারণ বলে মঙ্গৎরায়ের কাছে পাওয়া তালিকার প্রথম নামটি পড়লুম। নাম শুনেই হাঁ হাঁ করে উঠে বললেন, 'ওকে আমি ছাড়তে পারব না, ও খুব ভাল অফিসার।' আরেকটি নাম পড়ে বললুম, 'ওকে নিতে পারি ?' 'না না, ওকে আমি হালে একটা খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছি। তার থেকে তুমি অমুককে নাও না ?' 'কেমন লোক হবে ?' 'বেশ চোর আছে, জানো ; তবে তোমার কাজে তো চুরির অবকাশ নেই, নাও না, ওকে নাও।' 'আচ্ছা, ও লোকটি কেমন হবে ?' (আরেকটি নাম পড়লুম)। 'হাঁ, ওকে নিতে পারো, ভীষণ কুঁড়ে, বোকাও আছে, কাজ করতে চায় না, তবে তুমি ওকে কাজ করাতে পারবে !' হাসব কি কাঁদব ভাবছি, এমন সময়ে নিজেই বললেন, 'রোশনলাল আনন্দকে নাও, ও স্ট্যাটিস্টিক্স্ করে, ম্যালকম ডার্লিং-এর কাছে কাজ শিখেছে, বুদ্ধি কম, তবে ভূতের মত খাটতে পারে, ও তোমার পক্ষে ভাল হবে।' রোশন আনন্দ কয়েক বছরের মধ্যে আমার অন্যতম উৎকৃষ্ট সহকর্মী হলেন।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর নিজ নিজ রাজ্যে ইষ্টদেবতার সুনাম ছিল। এঁদের মধ্যে আবার তিনটি ভাগ করা যেত। যাঁরা খুব বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও বিশেষ সৎ লোক : যেমন ওড়িষ্যায় নবকৃষ্ণ চৌধুরী, বিহারের শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, কর্ণাটকের (তখন মহীশূর) বি-ডি-জাটি। দ্বিতীয় দলে ছিলেন ডাঃ বি-সি রায়, মোরারজি দেশাই (পরে ওয়াই-বি চ্যবন), তামিলনাড়ুর কে কামরাজ ; এঁরা

ছিলেন যেমন দেশপ্রেমিক তেমনি ব্যক্তিগত সততার জন্য বিখ্যাত। তৃতীয় একটি দল ছিল, যাঁদের ন্যায়-অন্যায় বিচার বিষয়ে বিশেষ সুনাম ছিল না, অথচ নিজ নিজ রাজ্যকে সব বিষয়ে বড় করার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন: তাঁরা ছিলেন রাজস্থানের সুখাড়িয়া, পাঞ্জাবের কায়রোঁ, পরে হরিয়ানার বংশীলাল। এঁদের মধ্যে একজনের মুখ ও কথা আমার চোখে ও কানে এখনও ভাসে: তিনি তামিলনাড়ুর কে কামরাজ। পর্বতের মত চেহারা, স্মিত মুখ, কথা খুব কম, কিন্তু যখন বলতেন মনে হত আপন জন। ব্যক্তিত্বে মহৎ।

এই ভাবে প্রতিরাজ্যে গিয়ে নিজে দেখে বেছে যে সহকর্মীর দল তৈরি করলুম, এবং পরে তাঁরা যে-বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার দেশবাসীর জন্য রেখে গেলেন, তার তুলনায় তাঁদের বৃটিশ পূর্বসূরীদের কাজ বেশ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তাতেই মনে হয় যথোপযুক্ত উৎসাহ পেলে আমাদের শ্রেষ্ঠ আই-এ-এসরা পূর্বসূরী আই-সি-এসদের থেকে কোন অংশে নিকৃষ্ট ন'ন। যথাস্থানে বিশদভাবে আমার সহকর্মিদের বিষয়ে লেখার ইচ্ছা আছে। এখানে শুধু ১৯৬১ সালের সেন্সাসের শেষে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে ছাব্বিশটি খাতে বারোশ' পঞ্চাশের বেশী বই যা আমার সহকর্মিদের উদ্যমে প্রকাশিত হয় তার বিষয় তালিকা দিলুম। ১৯৭৪ সালে ১৯৬১ সেন্সাসের মোট পুস্তক প্রকাশের তালিকা ১৪০০-র উপর হয়। নিচে ছাব্বিশটি বিভিন্ন অনুসন্ধানের তালিকা দিলুম। প্রতিটি অনুসন্ধানের বিশদ টীকা দিয়ে ১৯৬৫ সালে একটি 'গাইড টু দি 1961 সেন্সাস পাব্লিকেশনস্' লিখি। সেটিও ছাপা ও বিলি হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট অভ কালচার (গোলপার্ক, কলকাতা) লাইব্রেরিতে এই গাইড ও অনেকগুলি প্রকাশিত বই রক্ষিত আছে।

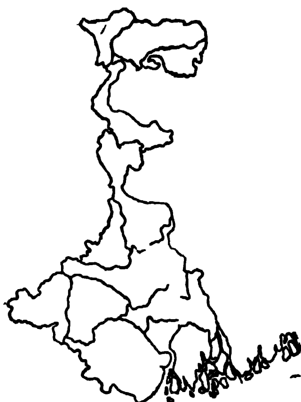
১. ১৯৬১ সালের জনগণনার রিপোর্ট ও সারণি, ২. ১৯৬১ সালের গৃহ-সেন্সাসের রিপোর্ট ও সারণি, ৩. ১৯৬১ সেন্সাসের শিল্পসংস্থার রিপোর্ট ও সারণি, ৪. ১৯৬১ সেন্সাসে চাষজমির পরিমাণ, ভূমিস্বত্ব ও গৃহশিল্পের রিপোর্ট ও সারণি, ৫. দশ লক্ষের অধিক লোকসংখ্যার নগরগুলির উপর বিশ্লেষণাত্মক রিপোর্ট, ৬. অন্যান্য শ্রেণীর নগরের উপর রিপোর্ট, ৭. ১৯৬১ সেন্সাসে তপশীলী জাতি ও উপজাতি সম্বন্ধে গৃহীত তথ্যের সারণি ও রিপোর্ট, ৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জন্ম-হারের ভবিষ্যৎ, বয়স ও আয়ুসারণি-সম্বলিত রিপোর্ট, ৯. জেলা সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক ও গেজেটিয়ার ১৯৬১, ১০. ১৯৬১ সেন্সাস মানচিত্রাবলী, ১১. বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের কৃত বিশ্লেষণী গ্রন্থ, ১২. মাতৃভাষা বিশ্লেষণ ও বিন্যাস,

তৎসহিত সংবিধানস্বীকৃত ভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক ব্যাকরণ, ১৩. ১৮৬০-১৯৫১ পর্যন্ত সেন্সাসে প্রকাশনার সঠিক বিবরণ, ১৪. ১৮৭০ সালের আগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণনার পুনরুদ্ধার, ১৫. ১৯৬১ সেন্সাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরত কর্মিদের আদমসুমারী, ১৬. কয়েকটি বিশেষ সরকারি শিল্পসংস্থার কর্মিদের বিবরণ, ১৭. ফৌজে কর্মপ্রার্থীদের স্বাস্থ্য-ফলাফলের বিশ্লেষণ, ১৮. ভারতময় স্থানে স্থানে বাছাই করা গ্রামের বিবরণ, ১৯. বহুল প্রচলিত কুটিরশিল্পগুলির উপর রিপোর্ট, ২০. পূজা, পার্বণ, পরব ও মেলা এবং ঐতিহাসিক স্থাপত্যের বিবরণ, ২১. বিশেষ বিশেষ তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ২২. স্বগোত্রে বা নিকট সম্বন্ধের মধ্যে বিবাহের ফলাফলের বিবরণ, ২৩. রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বাসস্থান ও গ্রামের গঠনের বিবরণ, ২৪. ভারতের নৃতত্ত্ব যাদুঘরগুলিতে রক্ষিত উপজাতিদের গার্হস্থ্য উপকরণ ও সাজসজ্জা অলঙ্কারাদির বিবরণ, ২৫. বিশেষ বিশেষ উৎসব সম্বন্ধে উৎসন্ধান ও রিপোর্ট, ২৬. ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্পের সঠীক তালিকা।

কালক্রমিকতা ডিঙিয়ে অনেকখানি চলে এসেছি। এখন ১৯৫০-৫২ সালে ফেরা যাক।

পরিকল্পনার প্রথম যুগ : গ্রাম সমাজ উন্নয়ন ১৯৫২-৫৪

ভূমিকা



১৯৫০-এর প্রায় সারা বছর ধরেই দুই বাংলায় নানা দুর্যোগ ঘটে। সারা বছর পূর্ববঙ্গে নানান অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি, চুক্তিমতে দুই বঙ্গে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অবস্থান ও তাঁদের সর্বত্র ঘোরাফেরা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত চলে আসা অব্যাহত থাকে। ১৯৫০-এর ৩০ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কেন্দ্রীয় সংসদে এক বক্তৃতায় ঘটনাবলীর উল্লেখ করে সরকারকে বিশেষভাবে সতর্ক হতে বলেন। এই দুর্দান্ত ব্যাধির তিনটি চরম ব্যবস্থা তিনি দেন। প্রস্তাব করেন, হয় দুই বাংলাকে এক করা হোক, না হয় দুই পক্ষে পাকা ব্যবস্থা করে দুই বঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের লোক বিনিময় করা হোক। তৃতীয় প্রস্তাব হল : দ্বিতীয় ব্যবস্থা সিদ্ধ করার জন্য পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে যাতে স্থানাভাব না হয় তার জন্য পাকিস্তান পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কিছু জমি ভারতকে ছেড়ে দিক। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টে তাঁর ৯ অগাস্টের বক্তৃতার উত্তর হিসাবে বলেন, তিনটি প্রস্তাবের কোনটাই বাস্তবে সম্ভব নয়।

খাদ্যদ্রব্য নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। ডাঃ রায়ের সম্পূর্ণ সমর্থনে এবং নিজের দৃঢ় সংকল্প ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, রাজ্যের খাদ্যসংকট মোচন সম্ভব করেন। ডাঃ রায়ের প্রতি যে বিরোধিতা দেখা গিয়েছিল সেটি ক্রমে দানা বাঁধে। অবশেষে ডাঃ পি-সি ঘোষ, সুরেশ ব্যানার্জি ও প্রায় একশ' বিরুদ্ধপন্থী কংগ্রেসের সভ্য নতুন এক রাজনৈতিক দল গড়েন, নাম হয় কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টি। বছরের শেষে ভারতের দুই মহান সন্তান দেহত্যাগ করেন : ৬ ডিসেম্বর মারা যান শ্রীঅরবিন্দ, ১৫ ডিসেম্বর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

অন্তদিকে, বছরটি কিছু কিছু ব্যাপারে বেশ শুভভাবেই শুরু হয়। সারা ভারতময় দেশীয় করদরাজ্যগুলিকে ভারত সরকারের অধীনে সামিল করা হয়। সব অঞ্চলেই একই সংবিধানগত গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে কাশ্মীর ভারতের আনুগত্য গ্রহণ করে, পাকিস্তানকে হঠানো হয়। দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদ পুরোপুরি ভারতের সামিল হয়। ভারতের তিন শ্রেণীর রাজ্য—এ, বি, সি (ক, খ, গ)—একসঙ্গে একসুরে এক শাসনাধীন হয়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত হল ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ও স্বাধীনতার ধ্রুবতারার সামিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থান হল খুব উচ্চে, নেহরু হলেন জগৎসভায় ভারতের সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রতীক। সোভিয়েট ইউনিয়নে, ইংরোপে, ও দুই আমেরিকায় তাঁর ও ভারতের নাম একাত্মক হল। ভারত হল পূর্ব-জগতের আলো ও উদ্যমের প্রতীক, যে-কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বা সংস্থায় ভারতের স্থান হল বিশেষ সম্মানের, ভারতের বাণী শোনার জন্য সকলেই যেন আগ্রহী ও সম্ভ্রমশীল। ১৯৫০-এর ১১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত নেহরুর যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় সফর; যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার, তার থেকেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ৫ নভেম্বর প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে নেহরুর আলাপ, এগুলি হয় যুগান্তকারী ঘটনা। নেহরুর নিজের কথায়, 'এই সফরে শেষ হয় এ বিশ্বের দরবারে এবং এশিয়ার পরাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে ইওরোপ ও আমেরিকার আধিপত্যের অবসান। আমাদের কালে এই স্বীকৃতি হল যুগবদলের অমোঘ চিহ্ন।'

১৯৫০-এর ৯ জানুয়ারি, দেশের দ্বারে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে শুরু হল কমনওয়েল্থ্ সম্মেলন। সূচিত হল কলম্বো প্ল্যান; যার প্রসঙ্গে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক আর্থিক ও সামাজিক উন্নতিকল্পে সহযোগিতার কার্যসূচি নেয়া হল। ১৯৫০-এর ২৩ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে ইংলণ্ডে ক্লেমেণ্ট অ্যাট্‌লির লেবার পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে গেল। ২৫ জুন উত্তর কোরিয়ার সৈন্য দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে। সেপ্টেম্বরের শেষে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যদল সোল (Seoul) পুনর্দখল করে। ১ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ান সৈন্য ৩৮তম সমান্তরাল অক্ষ পার হয়। কিন্তু ২৮ ডিসেম্বর উত্তর-পশ্চিম থেকে চীনা সৈন্যদল ৩৮ সমান্তরাল অক্ষ অতিক্রম করে দক্ষিণে সাউথ কোরিয়ায় অগ্রসর হওয়ার ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্য হঠতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে চীনা সৈন্য ২১ অক্টোবর তিব্বত অধিকার করে। আমি তার কিছু পরে সিকিমের নাথু-লা গিরিবর্ত্মে

গিয়ে দূরে চুম্বি উপত্যকায় তিব্বতের জমিতে চীনা সৈন্যদের ছাউনি দেখি। কিছুদিন পরে ঐ পথে দালাই লামা আসেন।

দীর্ঘ দশবছর জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে অবশেষে যখন কলকাতায় পুনরায় এসে কলকাতার মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন হল, তখন বিশ্বমঞ্চে ভারতের নতুন মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠায় গর্ব হল। এদিকে স্বদেশে যা-কিছু ঘটছিল, তাও কম উত্তেজনার নয়। ছেলেবেলায় সোভিয়েট পরিকল্পনা সম্বন্ধে ইলিয়া ইলিনের 'মানুষ ও পর্বত' নামের বইটি যখন পড়ি তখন বিস্মিত হই। এখন মনে হল আমার চারদিকেও মানুষ ও পর্বতের মধ্যে বোঝাপড়া শুরু হয়েছে, বিরাট কিছু কিছু ঘটছে। সেগুলির বিষয়ে এখনি আসছি। এখন বাড়ির কথা কিছু বলি।

জয়ন্তীর স্কুল

১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে জয়ন্তীকে স্কুলে পাঠানোর কথা লিখেছি। ঐ সময়ে বহরমপুর থেকে এসে কলকাতার হোয়াইটএয়োয়েতে তার স্কুলের জামাকাপড় করানর সময়ে তার কি ধরনের মোটাসোটা চেহারা ছিল বলেছি। ১৯৪৯-এর ডিসেম্বরের গোড়ায় লোরেটো কনভেণ্টের পার্টি নিয়ে যখন শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং মেল এসে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছল, মেয়ের খোঁজে আমরা ট্রেনের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত বার দুয়েক ছোটাছুটি করে যখন দেখতে না পেয়ে শঙ্কিত হচ্ছি, তখন আভার এক বন্ধু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'নিজের মেয়ে চিনতে পারছ না? ঐ তো তোমার মেয়ে কামরার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দেখছ না?' মা-বাবা তাকে চিনতে পারছে না, এই দুঃখে, ক্ষোভে বেচারির মুখ চুণ। আমরা খুঁজছি মোটাসোটা, দার্জিলিং থেকে আসা ফর্সা মেয়ে, না এসেছে কালো শীর্ণ হয়ে। চিনতে পারিনি বলে নিজেদের দোষ দিতে পারি না। প্রথম বছরই গ্রীষ্মের সময়ে ওর হাম হয়েছিল, এবং আভা বা আমি কেউ দেখতে যাইনি তা আগেই লিখেছি। বেশ বোঝা গেল খাওয়া-দাওয়া ভাল হত না। এত রোগা হয়ে গেছল যে জামাকাপড় ঢিলে হয়ে গা থেকে যেন খুলে পড়ছে, দোকানের ভদ্রমহিলা যা ভেবেছিলেন তার ঠিক উল্টো।

লাগেজ ভ্যান থেকে জয়ন্তীর বাক্স সংগ্রহ করতে গেছি, ইতিমধ্যে আভা জয়ন্তীকে নিয়ে স্টেশনস্থিত সোরাবজির রেস্তরাঁয় তাকে একটু খাওয়াতে গেল।

যে মেয়ের কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ লোরেটোতে যাবার আগে প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল, নলদময়ন্তীর উপাখ্যান মুখস্থ বলে তার দাদুভাইয়ের চোখে একদা জল এনেছিল, সে মেয়ে বাংলা বলতে, পড়তে বা লিখতে একেবারে ভুলে গেছে। লোরেটোতে যাবার পর প্রথম কয়েক মাস মাদার সুপিরিয়র নিয়মিত দু-এক লাইন করে লিখে জয়তীর খবর দিতেন। অগাস্ট মাস থেকে তার চিঠির বয়ান ছিল 'ডিয়ার মামি অ্যাণ্ড ড্যাডি, হাউ আর ইউ? আই অ্যাম ওয়েল অ্যাণ্ড হ্যাপি।' শেষের তিনমাস চিঠিতে ইংরেজি ভাষায় ছোটখাট খবর যোগ করত। মার কাছে ভীষণ লজ্জা, বাংলা বলাও ভুলে গেছে। চুপি চুপি কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সে-কথা স্বীকার করে, মাকে জিজ্ঞেস করল, দাদুভাই, দিদিমা কি ভাববেন! তার মা বললেন, ভেবো না, দুদিনের মধ্যে আবার সব বলতে পারবে। সোরাবজিতে খেতে বসে মাকে তার প্রথম প্রশ্ন, মা, আমি কি ক্যাথলিক হতে পারি? প্রশ্নে থতমত খেয়ে আভা নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে জয়তীকে আশ্বস্ত করে বলল, সে-কথা ভেবে দেখার তো অনেক সময় আছে, জয়তী তো তার দাদুভাইয়ের কাছে ছেলেবেলা থেকেই জানে, যে সব ধর্মই একই স্রষ্টার কাছে নিয়ে যায়। ধর্মান্তরগ্রহণের চিন্তা ক্রমে ক্রমে কেটে গেল, এমন-কি ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে দার্জিলিং লোরেটো ও কলকাতার লোরেটো হাউসে পড়ে, ১৯৫৬ সালে হোলির পরদিন, গায়ে হোলি খেলার রং থাকার দরুণ মাদার ক্লাসে তাকে ভর্ৎসনা করলেন, তখন জয়তী প্রতি ধর্মের উৎসবের গুণাগুণের সার্থকতা নিয়ে তাঁকে 'ভাষণ' দিতে যায় আর কি! তা সত্ত্বেও ক্যাথলিক জপমালা বা 'রোজারি'র প্রতি তার নিষ্ঠা রয়েই গেল। প্রতি রাত্রে সে নিজের রোজারি বালিশের তলায় গুঁজে শুত। ১৯৬৭ সালে যখন নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেল, সঙ্গে পুরনো রোজারি নিয়ে গেল। এখন ঠিক কি করে বলতে পারি না। আমার থেকে দপ্‌ করে চটে ওঠা মেজাজ কিছুটা পেয়েছে, তবে আমার থেকে অনেক তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সম্ভবত রোজারির কৃপায়!

১৯৫০-এর জানুয়ারিতে কলকাতায় বদলি হওয়া সত্ত্বেও জয়তীকে আমরা কলকাতায় আনার কথা চিন্তা করলুম না। সর্বক্ষণই তো বদলির গুজব। সে আমাদের ছেড়ে দার্জিলিঙে পড়তে লাগল। ১৯৫০-এর জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে যথারীতি বর্ষা শুরু হল। ১১ জুন দার্জিলিঙে অকস্মাৎ আকাশ ভেঙে পড়ল, ফলে শিলিগুড়ি-দার্জিলিঙের হিলকার্ট রোডের বহু অংশ ধ্বসে পড়ে। দার্জিলিং

লোরেটো কনভেন্টের মাদার সুপিরিয়র কাগজে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মা-বাবাদের এই জানিয়ে আশ্বস্ত করেন যে, যদিও নানা ধরনের অসুবিধা যাচ্ছে, তবুও চিন্তার কারণ নেই। তা সত্বেও আমাদের খুব উদ্বেগ হল, বিশেষত আগের বছর জয়তী যখন অত রোগা হয়ে গেছল। ফোর্ট উইলিয়ামের জেনরল এস-বি-এস রায় অনুগ্রহ করে দার্জিলিঙের জলাপাহাড় সেনাবাসে একটি বেতার বার্তা পাঠালেন, জয়তীকে ফিরিয়ে আনার সময়ে আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে যেন তখনি দেয়া হয়। ১৬ জুন দার্জিলিং লোরেটো কনভেণ্টে গিয়ে জয়তীকে দেখি। মাদার সুপিরিয়র ও জয়তীদের শ্রেণীর ভারপ্রাপ্তা মাদার, বার্নাডিন, দুজনেই আমাদের মনের অবস্থা বুঝলেন, এবং সম্ভবত একটু আশ্বস্তবোধ করলেন, যে অন্তত একজনের ভার কমে গেল। কন্‌ভেন্টের সমুখের বাগানের জমি ফুঁড়ে হঠাৎ একটি জলের ফোয়ারা ওঠে। তার কৃপায় ধোয়ামোছা, স্নান ও খাবার জলের সমস্যা মিটল। নিশ্চয় সকলের আকুল প্রার্থনার ফল। ফিরতিপথে জলাপাহাড়ের সেনাবাসের কর্তৃপক্ষ ও কার্সিয়াঙে ডাঃ অমিয় গুহ ও তাঁর স্ত্রী আমাদের খুব যত্ন করেন। পাহাড়ের উপরের শিরদাঁড়া বেয়ে পুরনো হিলকার্ট রোড ধরে জলাপাহাড় থেকে ডাউহিল ও কার্সিয়ঙ পর্যন্ত আমরা হেঁটে ফিরি। মাঝে মাঝে জয়তী এক মোটবাহকের পিঠে চড়ে নামে।

জুন মাস থেকে কয়েকমাস ভাগ্যক্রমে লা মার্টিনিয়ার স্কুলে জয়তী পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মন তার পড়ে থাকত লোরেটো কনভেণ্টে। পুজোর ছুটিতে তাকে দার্জিলিঙে ফেরত নিয়ে গেলুম। জয়তীকে ফেরত পেয়ে মাদার বার্নার্ডিন মনে খুশি চেপে রাখার কোন চেষ্টা করলেন না। তারপর ১৯৫৩ পর্যন্ত আমি তিন চার মাস অন্তর দার্জিলিঙে গিয়ে জয়তীকে দেখে আসতুম। মৈমনসিংহের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জ্যোৎস্না (বড়কু) সেন আর তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যাদি তখন দার্জিলিঙে। তাঁদের বাড়িতে থাকতুম। জয়তী আম খেতে ভালবাসত। একবার জয়তীকে না বুঝে এত ল্যাংড়া আম একসঙ্গে খাইয়েছিলুম যে তার পেট খারাপ হয়ে গেছল।

১৯৩৯ সালে যুদ্ধের সময়ে বিলেত যাবার মুখে জাহাজ যখন জিব্রাল্টারে থামে, তখন জিব্রাল্টার শহরে পথেঘাটে যে-সব স্পানিশ তরুণী দেখি, মাদার বার্নাডিনকে দেখে মনে হত, অল্প বয়সে সম্ভবত তিনি তাদের মত ছিলেন, অর্থাৎ যুবকরা তাঁকে দেখলে উত্তেজিত বোধ না করে পারত না। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে অত্যন্ত ভাল ছিলেন। ইতিহাস থেকে শুরু করে ইংরেজি সাহিত্য, অঙ্ক, ভূগোল

সবেতেই। শৈশব থেকেই তিনি ছাত্রীদের শেখাতেন কি করে প্রত্যেকটি জিনিস নির্দিষ্ট স্থানে সোজা ও পরিপাটি করে রাখতে হয়, কোনদিন একটুও এদিক ওদিক হবে না। যদি কোন জিনিস সামান্য একচুল এদিক ওদিক বা টেরাবেঁকা হয়—সে দেয়ালে টাঙানো ছবিই হোক, টেবিলের উপর গাদা করা বই, বিছানার চাদর কোঁচকানো, যাই হোক—তাঁর ভাষায় হত 'কি অপূর্ব সুন্দর টেরা-ব্যাঁকা'। তৎক্ষণাৎ ঠিক করতে হবে। পাঠ্যবিষয়গুলি ছাড়াও তিনি দিতেন নীতি শিক্ষা। ছাত্রীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন সম্ভ্রান্ত মহিলাসুলভ সুরুচিপূর্ণ ভব্যতা সভ্যতা। তার মধ্যে অবশ্য থাকত মধ্যে-মধ্যে প্রচ্ছন্ন কৌতুক বা রসিকতার ইঙ্গিত, নিঃসন্দেহে তরুণ বয়সে শেখা। সর্বদা সুসভ্য যথাযথ ব্যবহারে কোন ব্যতিক্রম হবে না। একটা উদাহরণ দিই।

শৈশব থেকে যখনই জয়তীর কাছে চুমু চাইতুম—চুমুর নাম ছিল মুক্কি—জয়তী একগালে জিভ ঠুসে গালটি ফুলিয়ে সেটি আমার দিকে ফেরাতো। একে আমরা বলতুম 'মুক্কি খাওয়া'। ১৯৫০-এর ডিসেম্বর মাসে যখন স্কুলের দলের সঙ্গে জয়তী প্লেনে করে ফিরে এল—সে-বছরের প্রথমভাগে দাঙ্গার ফলে দুই বাংলার মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়—তখন ব্যারাকপুর বিমানঘাঁটিতে নেমে জয়তী দুজনকে মুক্কি ঠিকই দিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে অফিস যাবার সময়ে যখন আমি মুক্কি চাইলুম, সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'অন্তরঙ্গতায় ইতরতা আসে, ইতরতা থেকে আসে পাপ।' এই ভর্ৎসনায় আমি তো হতবাক, কেউ ফুঁ দিলে আমি হয়তো পড়ে যেতুম। জয়তী ঈষৎ চোখ টিপে, একগালে জিভ ঠুসে আমার দিকে গাল ফিরিয়ে দাঁড়ালো। ভাবখানা 'দেখছ তো, আমার শিক্ষার জন্য যে টাকা খরচ করেছো, লোরেটো কনভেন্টে পুরোদস্তুর নীতিশিক্ষা করে আমি তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করেছি কিনা।'

শিক্ষার কথা যখন উঠল, তখন বলি। শিশুর কোন কৌতূহলেই বিরক্ত হওয়া উচিত নয়, এই নীতি আমরা মেনে চলি। বাড়িতে সমস্ত বইই খোলা তাকে থাকত, বড় বড় 'বিশ্বকোষ' থেকে 'কামসূত্র' 'লেডী চ্যাটার্লি' পর্যন্ত। ভাবতুম, যদি কোন শিশু অসভ্য কথা, খিস্তিই শেখে, যা কিছুতেই রোধ করা সম্ভব নয়, তাহলে সে খিস্তি মা-বাবা বা তাঁদের বন্ধুদের মুখে শুনলে যত ক্ষতি হয়, তার থেকে অনেক ক্ষতি হয় বন্ধুদের মুখে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে শুনলে, কারণ সমবয়সীদের কথায় অনভিজ্ঞতার দরুণ নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি অহেতুক উৎসাহ থাকে। সৌভাগ্যক্রমে বাড়িতে আমাদের এমন সব বন্ধুর অভাব কোনদিন হয়নি, যাঁরা এই বিভাগে

অয়তীর শিক্ষায় আমাদের সাহায্য করতে অপারগ হতেন, যেমন স্নেহাংশু আচার্য। এর ফলে পনেরো বছর বয়স হতে না হতেই বাবার ও তাঁর বন্ধুদের কাছে সে এমন তালিম পেল, তার মনে খিস্তির প্রতি এমন বিতৃষ্ণা এল, যে আমার ভয় হল সে আমাকে নিচুস্তরের জীব মনে করে কিনা! এই বিতৃষ্ণা ঠিক এমন বয়সে এল যে-বয়সে ছেলেমেয়েদের এ-বিষয়ে তৃষ্ণা বাড়ে।

গ্রামসমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সূচি

অ্যালবার্ট মেয়ার ছিলেন আমেরিকান স্থপতি, পেশায় নগর পরিকল্পনাকার। আসলে ছিলেন অভিনব পথপ্রবর্তক। সর্বদা নানান ধ্যানধারণা, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহী। ভারতবর্ষকে ভালবাসলেন এবং তদ্গতমনে কাজের জোরে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ সরকারের অবৈতনিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় এলাহাবাদের উপকণ্ঠে নৈনী গ্রামে কৃষি গবেষণা-কেন্দ্র ও সমাজ উন্নয়নকেন্দ্র স্থাপিত হয়। আমার নৈনীকেন্দ্র দেখার সৌভাগ্য হয়। আমার সবথেকে ভাল লেগেছিল তাঁর ফাঁপা দেয়াল ও ফাঁপা ছাদ করার পদ্ধতি, যার ফলে দেয়ালের দুই পাশাপাশি ইটের গাঁথুনির মধ্যে ও ছাদে দুটি পাতলা ইটের আস্তরের মধ্যে ফাঁকা জায়গা রেখে, সেই ফাঁকা জায়গার হাওয়া শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ রোধে সহায়তা করে। দুঃখের বিষয়, সব ভাল নতুন রীতির মত এই রীতিটিরও ভারতে যতখানি সমাদর পাওয়া উচিত ছিল তা মেলেনি। অ্যালবার্ট মেয়ারের সবথেকে স্মরণীয় অবদান ছিল নগর পরিকল্পনা ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য শীঘ্রই কয়েকজন দিকপাল এসে—যথা কর্বুসিয়ের, জীন্-রে, ফ্রাই, লুই কান—তাঁর কীর্তি কিছুটা ম্লান করেন। সমাজ উন্নয়ন ক্ষেত্রেই তাঁর অনেক মৌলিক অবদান আছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের আনুকূল্যে তিনি ১৯৪৮-এর ১৫ সেপ্টেম্বর এটাওয়া শহরের আশি কিলোমিটার দূরে মাহেওয়া গ্রামে এটাওয়া প্রোজেক্টের উদ্বোধন করেন। এটির দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল: প্রথমত, কৃষির ফলনবৃদ্ধি, তার সঙ্গে গ্রামীণ শিল্প ও সমবায়ের উন্নতি করে গ্রামসমাজের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন। দ্বিতীয়ত, মানব সম্পদের উন্নতিসাধন। এর মূলে ছিল শিক্ষা ও নৈতিক মানের উন্নতি। গ্রামে স্বায়ত্তশাসন দৃঢ় করে তার মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিদ্যা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর প্রতীতি ছিল দুই উদ্দেশ্যেই যদি দুই কর্মসূচি যুগপৎ নিয়োজিত হয় এবং সমানতালে বৃদ্ধি

পায়, তাহলে এই দুই সমান্তরাল ধারার পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে চক্রবৃদ্ধি হারে গ্রামীণ উন্নতি হবে, দুটি বিভিন্ন ধারার উন্নতির সমষ্টিমাত্র থাকবে না। এই প্রথম আমার খেয়াল হল ও বোধ স্পষ্ট হল, যে ভারতের গ্রামদেশে জনসংখ্যার তুলনায় প্রতি দশ হাজার নাগরিকপিছু শিক্ষিত, গ্রামে-কাজ-করা সরকারি কর্মচারির সংখ্যা কত নগণ্য, এমন-কি আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার খাতেও। কারণ, সব উন্নতির মূলে থাকে আইনের প্রয়োগ, এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগেই আসে সমতাবোধ ও সমভাবে বণ্টনের তাগিদে। অন্যদিকে, যদি গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস, তথ্য ও শিক্ষাবিকীরণের কথা ভাবি, তার তো কথাই নেই—সেইসব ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য বা লোকবল পূর্বে কোন-কালে আদৌ ছিল না বললেই হয়।

অবশেষে ১৯৪৯ সালের ২ জুলাই এল সেই স্মরণীয় দিন যখন সব মুখ্যমন্ত্রী-দেরকে প্রধানমন্ত্রী, তাঁর নিয়মিত মাসের ১ তারিখের বড় চিঠির পরদিনই আরেকটি ছোট বিশেষ চিঠি লিখলেন। সেই ২ জুলাইয়ের চিঠিতে উনি অ্যালবার্ট মেয়ার, ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি ডাঃ ডগলাস ই এনস্মিঙ্গার এবং সুরেন্দ্রকুমার দে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। সুরেন্দ্রকুমার দে সমাজ উন্নয়ন উদ্যোগের অধিকর্তা হিসাবে শুরু করে পরে সেই বিভাগের মন্ত্রী হন। এঁদের প্রত্যেকেই নিজের দৃষ্টিতে প্রামাণিকভাবে কম্যুনিটি ডেভেলাপ-মেণ্টের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্বন্ধে লিখেছেন। সে-সব ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তি এখানে করতে চাই না। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উদ্যোগ ১৯৫২ সালের ২ অক্টোবর—গান্ধীজির জন্মদিবসে—শুরু হলেও, আসল সি-ডি-পি কর্মসূচির শুরু হয় তার আরো অনেক আগে। অর্থাৎ, ১৯৫২ সালের ২ অক্টোবরের অনেক আগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচির অবলম্বনে কাজ শুরু হয়, এবং সরকারি কর্মচারিরা মোতায়েন হন।

এখনও আমার মনে বিশেষ দুঃখ আছে যে কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট কর্ম-সূচিকে সাফল্যের পথে এগোবার জন্য যথেষ্ট সময় ও উদ্যম তখন দেয়া হয়নি। অন্যপক্ষে, প্ল্যানিং কমিশন ও সুরেন্দ্রকুমার দে উভয়েই, আদি পরিকল্পনার কাঠামোকে পোক্ত হবার সময় না দিয়ে, তাকে জোলো করে, দুর্বল ও নড়বড়ে করে দেবার পথে নেমে গেলেন। প্রথম বছরে সি-ডি-পির যে সংস্করণ চালু হল, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দ্রুত প্রসারণের তাগিদে সেটিকে আর্থ ও লোকবলে, উপরন্তু সংখ্যাধিক্যে জোলো করে, নতুন প্রকল্প হল এন-ই-এস বা ন্যাশনাল

এক্সটেনশন সার্ভিস। সেটিকেও সুরেন্দ্রকুমার দে ঝটিতি আরো জোলো করে দিলেন। তাঁর প্রস্তাবিত গঠনমূলক উন্নতির ধ্রুবতারা, পঞ্চায়েতী রাজ দ্রুত প্রতিষ্ঠার উদ্যমে তিনি পড়িমরি করে ছুটলেন। সে প্রতিষ্ঠা করার আগে তাঁর ভিত্তিটি কিরকম হওয়া উচিত, তার সম্বন্ধে কোন বিচার সুব্ধ করলেন না। গ্রামবাসীর ক্ষমতার লড়াইয়ে, নিঃস্ব ও ধনীর বিরোধে, সরকারি ও বেসরকারি কর্মিদের একসঙ্গে কাজ করার নীতিতে, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ বা অপচয় করার ব্যাপারে, সরকারি অর্থব্যয়ের হিসাবনিকাশ কিভাবে রাখতে হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে, অবশেষে পরিদর্শনের কাঠামো কি ধরনের হবে, সে বিষয়ে যথাযথ ধ্যান ও নির্দেশের অভাবে পঞ্চায়েতী রাজ যে দৌরাত্ম্যের জন্ম দিল, তার আসল রূপ আমরা ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে আজ দেখছি। আমার প্রায়ই মনে হয়, আমাদের এক বিশেষ ধরনের জাতীয় প্রতিভা আছে—ইদানীং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতাগুলিতে আমাদের কীর্তিকর্মে পাই যার জলন্ত প্রমাণ; নিশ্চিত জয়ের মুখ থেকে আমরা পরাজয়ের গ্রাস কিভাবে অনায়াসে কেড়ে আনতে পারি! আমাদের সরকারকে দেখে আমার সেই বাবুর্চির কথা মনে পড়ে যায়, যে, কোন কিছু রান্না চিন্তা করার আগেই ডজনখানেক ডিম একের পর এক ভেঙে ফ্রাইং প্যানে ঢেলে সেগুলি একের পর এক ফেলে দিয়ে তবে কি রান্না হবে তারই আয়োজনে প্রবৃত্ত হত। ১৯৪৭ সাল থেকে যে-কোন ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা, নতুন পদ্ধতি, নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার বিষয়ে আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই। মজার কথা হচ্ছে যে কোন ক্ষেত্রে, অধিকাংশ পরীক্ষাতেই দেশের উন্নতির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে যথেষ্ট। কিভাবে ও উপায়ে উন্নতিসাধন হবে তার উপযুক্ত কাঠামো ও কর্মিও গড়ে তোলা হয়েছে, সাফল্যও এসেছে প্রচুর। কিন্তু প্রতিটি পরীক্ষাতেই সাফল্যের শিখরে পৌঁছনোর পরে সেটির দেশব্যাপী সঞ্চার বা চালু করার ধৈর্য বা জেদ আমাদের কখনও থাকেনি। পুরনো খেলনার মত সেগুলি দূরে ছুঁড়ে ফেলে আমরা নতুন এক পরীক্ষার পিছনে ছুটি। অথচ আমাদের পরিত্যক্ত খেলনাগুলিরই এক-আধটি তুলে নিয়ে, সামান্য ঝেড়ে পুঁছে, আশ-পাশের অনেক দেশ ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিজেদের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছে ও করে। ফলে, তাঁরা গেছেন অনেকদূর এগিয়ে, আর আমরা পড়ে আছি, বড়লোকের অমিতব্যয়ী আদুরে ছেলের মত, যে তিমিরে সেই তিমিরে, নিজেদের আত্মঘাতী প্রতিভায় নিজেরাই মোহিত হয়ে। কম্যুনিটি ডেভেলাপমেন্ট কার্যসূচি সম্বন্ধে এখন জনসাধারণের, এমন-কি বিশেষজ্ঞদের স্মৃতি প্রায় লুপ্ত।

পাঠকের স্মরণার্থে আমি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করছি।

সমাজসংস্কারের সব সার্থক নীতির মতই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল দর্শনটি ছিল যেমন ছোট্ট, তেমনি সরল। এই মূল নীতি থেকে তিনটি নিতান্ত সহজসাধ্য কর্মপদ্ধতি ও সংগঠনের হদিশ মেলে। প্রথমত আসে মৌলিক সমাজ উন্নয়ন প্রোজেক্টগুলি (সি-ডি-পি)। নীতি হল এদের প্রত্যেকটির কার্যক্ষেত্র হবে গড়ে ৩০০টি গ্রাম, জনসংখ্যা ২ লাখ। প্রথম উদ্দেশ্য হবে চাষের ফসলের সংখ্যা ও ফলন বাড়ানো। তার সঙ্গে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও গ্রামের ভিতরের ও পারিপার্শ্বিকের পরিচ্ছন্নতা ও আবর্জনা বিনাশ বা দূরীকরণের ব্যবস্থা ও রাস্তা নির্মাণ। এই উদ্দেশ্যের পরস্পরাশ্রয়ী দুটি অঙ্গ ছিল: একটি চাষের উন্নতি মাধ্যমে স্বাচ্ছল্য ও অর্থের উন্নতি ও বিকাশ। তার জন্য প্রয়োজন উন্নত চাষের উপকরণগুলির ক্রমবর্ধমান পরিমাণে সরবরাহব্যবস্থা: যেমন, বীজ, সার, সেচ, চাষের যন্ত্র, ফসল ভাল অবস্থায় গুদামজাত করে রাখার ব্যবস্থা, যার কল্যাণে সারা বছর ফসলের উপযুক্ত দাম পাওয়া যায়। এসব উন্নতি কামনার জন্য প্রয়োজন মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মনের প্রসার, নতুন নতুন শিক্ষা, শিল্প-কৌশল, প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও দখল। সেই সঙ্গে গ্রামের উন্নতি: রাস্তাঘাট, জলনিকাশ, সরকারি দপ্তর ও ব্যাংক, ডাকঘর, বিজলি, ডাক-তার ব্যবস্থা, দেশের মধ্যস্থানের সঙ্গে সুগম্য যোগাযোগ, উন্নত প্রকারের বাজার, হাট, ক্রয়বিক্রয় ব্যবস্থা, সরকারের নীতি ও তথ্যবিকীরণের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত হল একাধিক উদ্দেশ্যময় প্রোজেক্ট বা ব্লক, যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল শুধু কৃষি বা গ্রামের উন্নতি নয়, নিকটস্থ শহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ, যার সংস্পর্শে ও মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি দ্রুত সাধিত হবে। এই দ্বিতীয় ধরনের ব্লকের উদ্দেশ্য হবে দ্বিমুখী: চাষের উন্নতির সঙ্গে তার সহায় হবে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নতি। এই দোরোখা উদ্দেশ্যের মূলে থাকবে শিল্প। সে শিল্পে চিরাচরিত প্রযুক্তি ও হাতের দক্ষতা বাড়াবার জন্য হবে যন্ত্র বা উন্নত ধরনের প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তির আমদানি ও ব্যবহার। বিজলি বা অন্য শক্তিচালিত কলের সাহায্যে, অথচ ব্যাত কায়িক শ্রমে, নতুন নতুন ব্যবহার্য জিনিস তৈরি, সেগুলি চালুর জন্য বাজার তরি করে হল নীলোখেরি বা ফরিদাবাদে আবাসাশ্রয়ী নতুন শিল্পের শহর পত্তনের ব্যবস্থা।

তৃতীয় আরেক ধরনের প্রোজেক্ট হয়। এগুলিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়। সমাজসংস্কার শিক্ষা ও গ্রামসেবিকার প্রশিক্ষণ, তার সঙ্গে কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদন

বিষয়ে গ্রামসেবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। গ্রামসেবিকা ও গ্রামসেবকই হবে নতুন সংস্কারের উদ্দীপক ও উপদেষ্টা। হাতেকলমে কাজ শেখাবার পক্ষে প্রশস্ত ব্যবস্থা যে-সব গ্রামে থাকবে সেইসব গ্রামে এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এই দর্শনের মূল নীতি হল এমন কয়েকটি নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে যার পথে দ্রুত পরিবর্তন আসবে। প্রতি গ্রামে কয়েকটি নতুন সুবিধার সৃষ্টি অতি অবশ্য কর্তব্য ছিল : (১) পরিস্রুত, নিরাপদ পানীয় জলের জন্য দুটি পাতকুয়া বা নলকূপ ; (২) জমিসেচের জন্য হয় নলকূপ, নয় পুষ্করিণী, না-হয় সেচের পারস্য-চাকার জন্য কুয়া ; লক্ষ্য হল আগামী তিন বছরে প্রতি গ্রামে চাষজমির অন্তত অর্ধেক জমিতে উন্নত ধরনের সেচ হবে ; (৩) যেখানে সম্ভব, পতিত জমি চাষে আনতে হবে ; (৪) মানুষের পায়খানা ও অন্যান্য দূষিত মল নিকাশের জন্য গ্রামে স্যানিটারি পায়খানা ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করতে হবে ; (৫) প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে প্রয়োজনমত নতুন রাস্তা তৈরি করে আশপাশের গ্রাম ও শহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে ; (৬) শিশুদের ও বয়স্কদের জন্য প্রাথমিক ও প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বাপেক্ষা প্রধান ও জরুরী লক্ষ্য হল, সরকারি খাতে খরচ করে, গ্রামে-গ্রামে শিক্ষিত কর্মি নিযুক্ত করে তাদের দিয়ে উপরোক্ত প্রসারকার্যগুলি কার্যকরী করে তুলতে হবে। এই ধরনের শিক্ষিত সরকারী কর্মি আগে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে আদৌ ছিল না। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, অবিভক্ত বাংলায় এইচ-এস-এম ঈশাক, আই-সি-এস, তাঁর অধীনস্থ পাটনিয়ন্ত্রণ কর্মিদের ১৯৪৬ সালে এই ধরনের নতুন কাজ দেবার সিদ্ধান্ত করেন, এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা স্থাপনের কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু সে সময়ে দেশভাগ আসায় তাঁর কাজে বাধা পড়ল।

প্রতি প্রজেক্টের একটি মূল নীতি হল, প্রজেক্ট এলাকায় প্রতি পনেরো থেকে কুড়িটি গ্রামপিছু তাদের কেন্দ্রস্থলে একটি নতুন মণ্ডি, বা কৃষিজাত পণ্যের বাজার প্রতিষ্ঠা করা। উপরন্তু গড়ে একশ'টি গ্রাম নিয়ে তাদের কেন্দ্রস্থলে আরেকটি বৃহত্তর মণ্ডি স্থাপনা করা। সেই অঞ্চলের কৃষিজাত পণ্য কেনাবেচা ছাড়া, সেই মণ্ডিগুলিতে থাকবে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরকারি দপ্তরের শাখা, যথা সমাজ-উন্নয়ন দপ্তর, চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাক-তারঘর, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাকেন্দ্র। তার সঙ্গে থাকবে চাষের ট্র্যাক্টর ও পরিবহন মেরামতির ঘাঁটি, নানারি ধরনের

নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার, মাল ও কৃষিপণ্যের গুদাম, চাষের প্রয়োজনীয় নতুন যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ইত্যাদির দোকান এবং একটি পশু চিকিৎসালয়। প্রাথমিক পরীক্ষাবলীর পর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন, এইসব ব্যবস্থা চার বছর চললে প্রতি সি-ডি-পি ব্লকে চাষের ফলন অন্তত দেড়গুণ হবে। উপরন্তু চাষের বাড়তি খরচখরচা বাদে গ্রামপিছু নগদ আয়ের বৃদ্ধি হবে শতকরা পঁয়ত্রিশ শতাংশ। সম্পদ বৃদ্ধির কথা ছেড়ে দিলেও, এ বৃদ্ধির দরুণ গ্রামবাসীর মনের ও দৃষ্টিভঙ্গীর এমন পরিবর্তন হবে যার ফলে গ্রামের যাবতীয় অর্থকরী ও মানবসম্পদ-বৃদ্ধিকারী উদ্যমের স্ফুরণ হবে, এবং কায়িক মেহনতের মজুরীও বেড়ে যাবে। আগে যেখানে কোন গ্রামে বছরে ১২০ থেকে ১৩৫ দিন কাজ জুটত, তার স্থলে প্রায় দু'শ' দিন কাজ মিলবে। দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস শুধু নয়, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাচ্ছল্যের উপযোগী জিনিসেরও ব্যবহার বাড়বে। ফলে জীবন-ধারণ মানের উন্নতি হবে। এ-সবের মূলে আরেকটি প্রত্যাশা ছিল: উন্নতির ফলে বন্ধকী শ্রম বা বেগার খাটানো, নিম্নতম কৃষিস্বত্ব, ভাগচাষ ইত্যাদির পরিমাণ কমবে। সাধারণপক্ষে প্রতিটি প্রজেক্ট তিন বছরে শেষ হবে। এই তিন বছরের পাঁচটি পরপর ভাগ থাকবে। প্রথম তিনমাস লাগবে সবকিছু ব্যবস্থার প্রচলন শুরু করতে; পরের ছয়মাস লাগবে নানাবিধ কার্যবিধি চালু করতে; পুরোদমে কাজ চলবে এর পরের আঠারো মাস; তার পরের ছয়মাস লাগবে সবকিছু উদ্যোগ পরস্পরের সঙ্গে একযোগে সংহত করতে। শেষ তিনমাস লাগবে উদ্যোগটি একে একে সম্পূর্ণ গুটিয়ে দিতে। চতুর্থ বছর থেকে সবকিছু উদ্যোগ আপন উদ্যমে প্রকৃষ্টভাবে ফলপ্রসূ হবে।

পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ যুক্ত উন্নয়ন ব্লক বেছে নেয়। ব্লকগুলি ভৌগোলিক অবস্থানানুযায়ী একলপ্তে নেয়া হল না। পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে নেয়া হল। ১৯৫২-র অক্টোবরে পাঁচটি ব্লকে কাজ শুরু হয়: নদীয়ার ফুলিয়া, বর্ধমানের শক্তিগড় ও গুস্‌করা, বীরভূমের নলহাটি ও মহম্মদবাজার। ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে আরও তিনটি যোগ হয়ে মোট আটটি ব্লকে কাজ শুরু হয়। এগুলির প্রত্যেকটিতে বছরে খরচ হত ৮ লাখ টাকা। এই বাকি তিনটি ব্লক হল: ২৪-পরগণার হাবড়া, বাঁকুড়ার সোনামুখী, কুচবিহারের দিনহাটা। শেষের তিনটির প্রত্যেকটির পাঁচ বছরের মেয়াদে মোট পঁচিশ লাখ টাকা বরাদ্দ হল, অর্থাৎ বছরে পাঁচ লাখ টাকা।

১৯৫৪ সালে আমি যখন উন্নয়ন বিভাগের কাজ ছেড়ে যাই, তখন নতুন কোন

সি-ডি-পি ব্লকের আর উদ্বোধন হয়নি। তার বদলে অন্য এক শ্রেণীর ব্লক হয়, তার নাম হয় ন্যাশনাল এক্সটেন্‌শন্‌ সার্ভিস অথবা জাতীয় সম্প্রসারণ উদ্যোগ। এগুলিতে কার্যসূচির বৈচিত্র্য অনেক কম, তার সঙ্গে অর্থের বরাদ্দও হয় অনেক কম। আমাদের আপত্তি মানা হল না, কারণ সি-ডি-পি ব্লকের বরাদ্দ বড় বেশী হয়ে গেছল। প্রথম বছরে যেখানে সি-ডি-পি ব্লকপিছু বছরে আট লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল, তার স্থলে এন-ই-এস ব্লকের তিন বছর পিছু বরাদ্দ হল সাড়ে আট থেকে নয় লাখ টাকা। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলুম না, এত কম টাকা এত বেশী ভৌগোলিক আয়তনে ছড়ানোর ব্যবস্থা কেন হল। ফলে, যে ব্লকগুলি টাকা পেল, তাতে যতটুকু কাজ সম্পূর্ণ হলে সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তন ও উন্নতির বুনিয়াদ পাকা হতে পারত, ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় ও স্বাবলম্বী হতে পারত, ভবিষ্যতে আর সাহায্যের প্রয়োজন হত না, সেখানে টাকার অভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা রইল না, পুনরায় পঙ্গুত্বের সম্ভাবনা থেকে গেল, কিছুটা অর্ধসমাপ্ত বাড়ির মত। আগে যে টাকা একবছরে খরচ হত, সে টাকা তিন বছরের উপর ছড়িয়ে দিলে, কর্মচারিদের মাহিনা ও দপ্তরের খরচ জোগাতেই খরচ হয়ে, উন্নতিমূলক কাজের জন্য যে বিশেষ কিছুই থাকবে না, এই সরল সত্যটিও যেন কারোর মাথায় ঢুকল না। আমি উন্নয়ন বিভাগ ত্যাগের আগে ১৯৫৪ সালের ২ অক্টোবর যে পাঁচটি নতুন নীতির ব্লক সূচিত হয় সেগুলি হল: বীরভূমের বোলপুর, দার্জিলিঙের পুলবাজার, মুর্শিদাবাদের কাঁদি, বারোঞা ও ভরতপুর।

এত কথা লিখলুম পাঠককে শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে যে এই কার্যসূচিতে লেগে থাকলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের যুগে দেশে হয়তো অনেক মঙ্গলময় পরিবর্তন হতে পারত, যার প্রসাদে গ্রাম, অঞ্চল ও জেলার উদ্যম ও যোজনা রীতিমত দীর্ঘস্থায়ী সুফলে পরিণত হত, দেশে অসাম্য, অসম উপার্জন কমত, উন্নতিমুখী মনোভাব বাড়ত, নিরক্ষরতা, অনিয়ন্ত্রিত জন্ম ও মৃত্যুহার কমত। একটি ভাল অভ্যন্তরীণ উন্নতির ব্যবস্থা পাকা হত। এরই কোন কোন অঙ্গ বারে বারে নতুন নামে, নতুন সাজে, কুমিরের ছানার মত সরকার একটি করে আনেন; বোঝাতে চান এখন যা প্রস্তাব করছেন তা আনকোরা নতুন, আগে এর বিন্দুমাত্র ছিল না, এমন-কি চিন্তাটুকুও নয়। সবই বর্তমান নেতাদের মাথা থেকে আশ্চর্য প্রতিভার নিদর্শন হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। তাতে শুধু এইটুকুই প্রমাণ হয়: হয় নেতারা নিজেদের ও দেশবাসীকে প্রতারণা করায় অদ্বিতীয়, না-হয় তাঁদের এবং দেশবাসীর স্মৃতিশক্তি নিতান্ত ক্ষীণ। অতীতকে অস্বীকার করা চিন্তাহীনতারই

গ্রামান্তর, অন্তপক্ষে স্বীয় প্রতিভার মৌলিকতা দাবির পক্ষে এ পন্থা নিতান্তই হাস্যকর।

গ্রামোন্নয়ন উদ্যোগের প্রথম কয়েকটি ধাপ

১৯৫১ সালের শেষের দিকে সেন্সাস রিপোর্ট লেখার প্রস্তুতির সময়ে আমার মনে হল প্ল্যানিং কমিশন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিকল্পে যে-সব সূত্র ও নীতি উত্থাপিত করেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যের বর্তমান অবস্থা নির্ণয় করার চেষ্টা করা উচিত হবে। প্রায় ভুলেই গেছলুম যে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি হবার পর সুভাষচন্দ্র বসু একটি জাতীয় প্ল্যানিং কমিটি নিযুক্ত করেন, যার সভাপতি হন জওহরলাল নেহরু এবং সম্পাদক কে-টি শাহ। ১৯৪০-৪৫ এই কয় বছরে কমিটির অনেক সভ্য পর পর জেলে যাবার ফলে এই কমিটির কাজ ব্যাহত হয়। তা সত্ত্বেও কমিটি বেশ কিছু অন্তর্বর্তী রিপোর্ট ও প্রস্তাব প্রকাশ করতে সমর্থ হন, যা-নাকি মফঃস্বলে কাজ করার সময়ে আমি পড়ার সুযোগ পাইনি। চল্লিশ দশকের শুরুতে যে বম্বে প্ল্যানটি হয় সেটি যথেষ্ট পরিমাণে প্রচার পায়নি, যদিও প্ল্যানটি অনেক লোকের মনে আশা ও স্বপ্নের খোরাক জোগায়।

এক হিসাবে আমাদের ভাগ্য ভাল, যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে যতজন ইওরোপীয় পণ্ডিত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও উন্নতি পরিকল্পনা বিষয়ে যতখানি চিন্তিত ও অবহিত ছিলেন, তাঁদের সব মিলিয়ে যত সংখ্যা হয় তার থেকে অনেক বেশীসংখ্যক আমেরিকান গবেষক ও পণ্ডিত আমাদের দেশ সম্বন্ধে আগ্রহী ও ওয়াকিবহাল ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেক পড়াশোনাজানা সংবেদনশীল আমেরিকান সাংবাদিকও ছিলেন। আমার এটি মনে হবার কারণ আছে। চল্লিশের দশকের শেষে, পঞ্চাশের দশকের প্রথমে যে-সব প্রখ্যাত অথবা তত-প্রখ্যাত-নন এমন আমেরিকান পণ্ডিতদের সঙ্গে আমার আলাপের সুযোগ হয়, তাঁদের অনেকেই যৌবনে দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছিলেন, উপরন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকার নিউ ডীল কার্যসূচিতে হয় নিজেরা কাজ করেছেন, না হয় তার থেকে সুফলের অধিকারী হন। তার ফলে দারিদ্র্য ও অভাবের স্বরূপ তাঁরা জানতেন, এবং তাঁদের অনেকেই মনে মনে দেশের পুনর্নির্মাণ ও পুনঃসংস্কারের সময়ে কি কি সমস্যা উঠতে পারে, তাদের নিরাকরণ বা সুরাহা কি কি ভাবে হয়, তাদের প্রকৃষ্ট উত্তর বা কর্মসূচি কি হতে পারে সে-

বিষয়ে হাতেকলমে কাজ করার হেতু তাঁদের ভালরকম ধারণা ছিল। কি করে উৎপাদন শক্তি বাড়াতে হয় তাও জানতেন, এবং সে জ্ঞান তাঁদের এসেছিল কঠিন শ্রম ও মানবিক দরদের মধ্যে দিয়ে। চল্লিশের দশকে আরেকটি কারণে আমার ভাগ্য ভাল ছিল। যে-সব আমেরিকানদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তাঁরা ছিলেন উচ্চপদহীন সাধারণ সৈনিক। অন্যদিকে ইওরোপ বা ইংল্যাণ্ড থেকে যাঁরা আসতেন, তাঁদের অধিকাংশই ভুলতে পারতেন না তাঁরা ছিলেন একদা রাজার জাত, তাঁদের আগ্রহের মধ্যে থাকত প্রচ্ছন্ন রাজার জাতের অনুকম্পা ও দয়ামিশ্রিত দূরত্ব। পঞ্চাশের দশকের প্রথমে যে-সব প্রখ্যাত আমেরিকানদের সঙ্গে আমার পরিচয় বা কাজ করার সুযোগ ঘটে—যথা অ্যালবার্ট মেয়ার, পল অ্যাপ্‌ল্‌বি, ডগলাস এন্‌স্‌মিঙ্গার, এস-এ ট্রোন, সাইমন কুজনেট্‌স্‌, ক্রিস্টোফার লাঙ্গে, অস্কার লাঙ্গে, হেন্‌রি হার্ট, মাইরন ভীনার—তাঁরাও ছিলেন যেমন পণ্ডিত, তেমন সংবেদনশীল, তেমনি দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচিত। ১৯৫৩ সালে 'ইকনমিক উইকলির' সম্পাদক শচীন চৌধুরীর মাধ্যমে আলাপ হয় ড্যানিয়েল ও অ্যালিস থর্নারের সঙ্গে; তাঁদের কাছে আমি জ্ঞানচর্চার জগতে বিশেষ ঋণী। সম্প্রতি ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ৭৫তম জন্মতিথি উৎসবে অ্যালিস থর্নার এসে যোগ ও সারাদিন উৎসবের আলোচনাসভায় ভাগ নিয়ে আমাকে বিশেষ হর্ষিত করেন। থর্নারদের সঙ্গে পরিচয়ের পরে আমার আরেক দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয়—মাইরন ভীনার ও তাঁর স্ত্রী। তিনি এখনও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক সত্য অথচ সংবেদনশীল রচনা প্রকাশ করে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁদেরকে রেণেসাঁস ব্যক্তি বলে অভিহিত করা যায়, বিদ্যা ও উৎসাহে তাঁদের এতই ছিল আসক্তি: যেমন ছিল বোধশক্তি, তেমন সহানুভূতি, গভীর মানবিকতা, পাণ্ডিত্য, সাম্য ও ন্যায়প্রতিষ্ঠিত পুরুষকারের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আসক্তি। এর মধ্যে প্রায় সকলেই ম্যাকার্থির আক্রমণাত্মক কাজের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার আমেরিকান কন্‌সালেটের এক মহিলা, আইলিন এডারটন। এক এক সময়ে আক্ষেপ হয়, এঁদের থেকে ঈষৎ বেশী বয়সের মরিস হিণ্ডাস, লুইস ফিশার অথবা এডগার স্নো'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপের সৌভাগ্য হয়নি। সেইসঙ্গে অধ্যাপক মহলানবিশের অনুগ্রহে আমার অনেক মহান ইংরেজের সঙ্গে আলাপও হয়, যেমন জে-বি-এস হলডেন, রোনাল্ড ফিশার, পি-এম-এস ব্ল্যাকেট। তাঁদের সান্নিধ্যে আমি ইওরোপীয় মনের পরিচয় পেতুম। তবে আমেরিকানদের সান্নিধ্যে

আমি যেন পেতুম নিউইয়র্কসুলভ ভবিষ্যতের স্বাদ। ইংরেজদের কাছে পেতুম লণ্ডন, প্যারিস বা রোমসুলভ অতীতের স্বাদ।

পরিকল্পনা যুগের শুরু

আমাদের হামবড়াভাব যেমন দীর্ঘ, সাধারণগম্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে স্মৃতিশক্তিও তেমনি হ্রস্ব। তার সঙ্গে যোগ করুন আমেরিকান পণ্ডিতরা স্বাধীনতার পর ভারতের উন্নতি প্রচেষ্টাকল্পে যে কর্মসূচির প্রস্তাবনা করতেন সে-বিষয়ে তাঁদের দেশাভিমান, অথবা স্ব-স্ব সংস্থার প্রতি আনুগত্য। এই দুইয়ের প্রকোপে আমাদের স্মৃতিশক্তি আরো খাটো হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই স্মরণ আছে যে সরকারিভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত ও কাজ শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার অনেক আগে, এবং শুরু করেন ভারতের পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিরাই। একদিকে ছিলেন এই ব্যক্তিরা, অন্যদিকে ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি। উভয়ের পারস্পরিক সহযোগে সমাজ উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রামের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার প্রয়াস অনেক আগেই শুরু হয়। আমি মনে করি, একদিকে অ্যালবার্ট মেয়ার, অন্যদিকে গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রতিভা একজোটে মিলিত হয়ে কাজ করা, বা নেহরু ও অন্যান্য নেতারা এ-বিষয়ে চিন্তা করার অনেক আগে। এইটুকু বলার অর্থ এই যে তাঁদের ঈপ্সিত কাজের প্রস্তুতি হিসাবে সরেজমিনে যেটুকু সুযোগ, সুবিধা, প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, এবং সে পথে অগ্রদূতরা বেশ অগ্রসর হয়েছিলেন।

আমেরিকান প্রকাশনের প্লাবনে ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের অনেকেরই এখন বিশেষ স্মরণ নেই যে ১৯৪৪-এর আগে থেকেই একটি বলিষ্ঠ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্যসূচি গৃহীত হয়ে কাজ শুরু হয়। ১৯৪৪-৪৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্ল্যানিং ও ডেভেলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট স্থাপনা করেন। অনেক দিকে কাজ শুরু হয়। যথা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর নানা বিভাগ, প্রধান প্রধান খাতে উন্নয়ন ব্যবস্থা কি ভাবে, কি উপায়ে, পর পর অগ্রসর হতে পারে সে-বিষয়ে কতগুলি খসড়া তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, অনেক প্রজেক্টে হাতেকলমে কাজ শুরু করা হয়, যেমন ওড়িশার হীরাকুদে বা পাঞ্জাবের ভাকড়া-নাঙ্গলে। মেঘনাদ সাহা বা এম বিশ্বেশ্বরায়ার মত বৈজ্ঞানিকেরা তার দশবারো বছর আগে থেকে সরকারকে এ-বিষয়ে তথ্যের পর তথ্য, প্রস্তাবের পর প্রস্তাব পেশ করে ক্রমাগত

তাগিদ দিতে শুরু করেন। বহুমুখী সেচ পরিকল্পনার প্রবর্তক ও সমর্থক হিসাবে নাম করতে হয় এম বিশ্বেশ্বরায়া, এস-সি মজুমদার, কে-এল রাও, কে-এল পাঞ্জাবী প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিত ও এঞ্জিনিয়ারদের। তারও বহু আগে থেকে এইসব প্রচেষ্টার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, আর-এইচ উইলকক্স, সি-এ বেণ্টলি, এস-সি মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিত ও প্রশাসকরা। এই তিনজন উচ্চকণ্ঠে দিনের পর দিন সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন, যে বাংলার মত প্রদেশেও, যেখানে পঞ্চাশ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টিপাত হয়, সেখানেও সেচের খাল খনন করা এবং ভূগর্ভে জল মজুত রাখা প্রয়োজন, যার কল্যাণে অভাবের সময়ে জমিতে জল ছাড়া যায় এবং একাধিক ফসল ফলানো সম্ভব হয়। ওদিকে বিশ দশকের মধ্যভাগে মাদ্রাজে চাষের জন্য টিউবওয়েলে বা খালের থেকে জল তোলার বিজলি পাম্প নিজের গাড়িতে উঠিয়ে একজন ইংরেজ চীফ এঞ্জিনিয়ার দিনের পর দিন মাঠে ঘুরে চাষীদের দেখাতেন। ফলে, বিজলিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভস্থিত জল উঠিয়ে আখের ক্ষেতে সেচ দেবার ব্যাপারে মাদ্রাজের কইম্বাটোর এবং আশেপাশের জেলাগুলি অগ্রণী হল।

আগেই বলেছি দেশভাগের আগে নিয়াজ মহম্মদ খাঁ অবিভক্ত বাংলায় কৃষি উন্নতিকল্পে কি কি নতুন শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে এইচ-এস-এম ঈশাক কীভাবে পাটনিয়ন্ত্রণ কর্মিদের গ্রামসেবকের ব্রতে ব্রতী করতে চেয়েছিলেন। ওদিকে পাঞ্জাবে ম্যালকম ডার্লিং সমবায় নীতির প্রসারে মনপ্রাণ ঢালেন। পাঞ্জাব প্রদেশেই এফ-এল ব্রেন তাঁর 'সক্রাটিস ইন অ্যান ইণ্ডিয়ান ভিলেজ' বইয়ে গ্রামের চৌপালে আলোচনা, বাদানুবাদের মধ্যে দিয়ে গ্রামোন্নয়নের নতুন রীতিনীতি-ভাবধারার প্রবর্তন কিভাবে করা যায় তার ভিত দৃঢ় করেন। মহারাষ্ট্রে সমবায়ের কাজ শুরু করেন ডি-আর গ্যাডগিল ও ডি-সি কার্ভে।

গভর্নর জেনরলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের আব্দুল হালিম গজনভী ও নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁদের কার্যকালে 'আরো ফসল ফলাও' অভিযানে সর্বান্তঃকরণে জোর দেন। ১৯৪৩-৪৬ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভার যাবতীয় কার্যবিবরণীতে বেশী খাদ্য ফলানোর রীতিনীতি, পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে ঘন ঘন উল্লেখ দেখা যায়। ভবিষ্যতে যেসব রীতিনীতি ও কার্যপ্রণালী গৃহীত হয় তার বহু উল্লেখ আমরা এই সময়ে গজনভীর বক্তৃতাতে পাই। বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপাদনের গবেষণার উদ্দেশ্যে ভারতের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারগুলি,

—যেমন, কইম্বাটোরে আখচাষের গবেষণাগার, কটকে ধানচাষের, গুজরাটে ও পাঞ্জাবে তুলার, বাংলায় পাটচাষের, আসামে চায়ের—ছাড়া, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকরা নিজের নিজের গবেষণাগারে মৌলিক ও ফলিত গবেষণার পিছনে সারাজীবন কাজ করে যান : যেমন, নীলরতন ধর, জ্ঞান মুখার্জি, বি-সি গুহ, ডি-রামাইয়া, এল-এ রামদাস। ভারতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে অনেকগুণ বর্ধিত আকারে পুসা থেকে এনে নতুন দিল্লীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয় : ফসল প্রজনন বিজ্ঞান, মিশ্রফসলের প্রজনন ও উন্নতি, চাষীর ক্ষেতে ফলন বাড়ানোর প্রচেষ্টা সমানে চলতে থাকে। পশুপালন, পশুপ্রজনন ও পশুর আহার বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে গভর্নর জেনরল লিনলিথগো'র নিজস্ব দান ও উদ্যমের কথা না উল্লেখ করলে অন্যায় হবে। এইসব ক্ষেত্রে নতুন প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী, আদর্শ ও নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়, যাঁদের শীর্ষে সর্দার দাতার সিং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি অভিযান শুরু হল। নতুন নতুন জেলায় কৃষিফার্মের প্রতিষ্ঠা, এবং তাদের সম্মুখে নতুন নতুন সিদ্ধির আদর্শ তুলে ধরা হল। এইসব উন্নতি-মূলক প্রশাসনে অতি উঁচুদরের নেতারও আবির্ভাব হল, যেমন সার মির্জা ইসমাইল এবং ভি-টি কৃষ্ণমাচারী।

বীরবল সাহানি, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, নীলরতন ধর, সি-কে লক্ষ্মণন, আর বিশ্বনাথন, পি-ভি বেঞ্জামিন, সি-জি পণ্ডিত, পি-সি মহলানবিশ—জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে তাঁরা আবির্ভূত হয়ে গবেষণা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রশাসনে নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন।

অর্থনীতিতে এলেন পি-জে গ্রেগরি, জে-জে আঞ্জারিয়া, জে-সি কয়াজি, জে-সি সিংহ, রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখার্জি, ডি-আর গাডগিল, বি শিবরাও, ভি-কে-আর-ভি রাও, সি-এন ভকিল, এম-এল দাঁতওলা, ডি-টি লাকডাওলা, বি-এন গাঙ্গুলী, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত। এঁদের বক্তব্য সরকারের প্রশাসন শ্রদ্ধার সঙ্গে অবহিত হত। তাঁদের নিচে সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন নতুন বিশ্লেষণী ও সংশোধনীনীতিতে পারদর্শী তরুণ অর্থনীতিবিদের দল; যথা আর-কে হাজারি, টি-এন শ্রীনিবাসন, কে-এন রাজ, আই-জি প্যাটেল, পীতাম্বর পন্থ। নতুন সমাজবিজ্ঞানীরা এলেন, যথা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি, দ্বিজেন্দ্রনাথ মজুমদার, এম-এন শ্রীনিবাস। ইতিমধ্যে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সংখ্যাতত্ত্বকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে, প্রতি শাস্ত্রে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মর্ম ও উপকারিতা সম্বন্ধে বোধ প্রসারিত করলেন। সংখ্যাতত্ত্ব হল বিশ্লেষণের, সংশ্লেষণের,

ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির পক্ষে একাধারে অমূল্য অস্ত্র। সি-ভি রমণ ও সত্যেন বসু হলেন ভারতের বিজ্ঞান জগতে যুগ্ম ধ্রুবতারা, সকল বিজ্ঞানীর আরাধ্য গুরু। বিজ্ঞানের যে-কোন ক্ষেত্র, যে-কোন শাখা নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোয় উদ্ভাসিত করতেন। যে-কোন ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণায় তাঁরা হাত লাগাতে দ্বিধা করতেন না।

১৯৪৬ সালে ভারতীয় নেতাদের অন্তর্বর্তী সরকারে কৃষিমন্ত্রণাগার একটি পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তার মূল লক্ষ্য ছিল খাদ্যশস্য ও তন্তুচাষের ফলন বাড়ানো। দামোদর উপত্যকা প্রোজেক্ট উপলক্ষ্যে মেঘনাদ সাহার অবদানের উল্লেখ করেছি। স্বাধীনতার প্রত্যূষে বিভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে অন্তত একশ' ষাটটি বহতা নদীর বুকে সেচ পরিকল্পনা-প্রারম্ভিক অথবা প্রস্তুতির নানা স্তরে চালু ছিল: হয় অনুসন্ধান চলছে, না-হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, না-হয় নির্মাণ। বড় বড় অনেকগুলি পরিকল্পনার কাজ ইতিমধ্যেই অনেকখানি এগিয়েছে, যেমন পাঞ্জাবে ভাকড়া-নাঙ্গল, বিহার-পশ্চিমবঙ্গে দামোদর উপত্যকা, ওড়িশ্যায় হীরাকুদ, হায়দ্রাবাদ-মাদ্রাজে তুঙ্গভদ্রা, বোম্বাইতে গঙ্গাপুর ও কাকড়াপুর, হায়দ্রাবাদে গোদাবরী, মাদ্রাজে নিম্নভবানী, পশ্চিমবঙ্গে ময়ূরাক্ষী।

বেশ কয়েকটি শিল্প-পরিকল্পনাও শুরু হয়, বিশেষত সার উৎপাদন কারখানা, রেলওয়ে এঞ্জিন তৈরি, সংবাদপত্রের কাগজ মিল। অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, যথা ইস্পাত, ভারি ও বড় কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি তৈরি, টেলিফোন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারত নানাবিধ নতুন শিল্প ও যুদ্ধোপযোগী নানাবিধ সামগ্রী ও রসদ প্রস্তুত ও রপ্তানি বা বিক্রি করে বহুল পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা রোজগার করে, তার ভাণ্ডার ১৯৪৮ সালে ফুলে ওঠে। দুঃখের বিষয়, ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরে আমেরিকান ডলারের তুলনায় বৃটিশ পাউণ্ডের মূল্য কমে যায়, তার ফলে ভারতের পাউণ্ডের ভাণ্ডারেরও মূল্য পড়ে যায়।

১৯৪৮-এর ৭ এপ্রিল স্বাধীন ভারতের সরকার তাঁর শিল্পনীতির প্রথম প্রস্তাব ঘোষণা করেন। এই নীতির পিছনে কি প্রস্তুতি ছিল সংক্ষেপে বলেছি। ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। সে-কাজ যুদ্ধের দরুণ ব্যাহত হয়। তারপর আসে ১৯৪৪ সালে 'বম্বে প্ল্যান' আলোচনা। এই দুই আলোচনাই ছিল ১৯৪৮-এর প্রথম নীতি ঘোষণার মূলে। ঘোষণায় বলা হয় শিল্পজাগরণের কতগুলি মূল ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হবে সর্বপ্রধান এবং সব-

থেকে গুরুত্বপূর্ণ: রীতি, নীতি, গতি, পদ্ধতি ও উৎপাদন, পরিমাণ ও মাল, সব ব্যাপারে। ঘোষণায় আরো বলা হয় জাতীয় সম্পদ দ্রুত না বাড়ালে শুধু যেটুকু আছে সেটুকু পুনর্বণ্টন মাত্র করলে, জাতির দারিদ্র্যই বণ্টন করা হবে, সম্পদ নয়। এই সংকল্পে সরকারি ও বেসরকারি অর্থ ও শিল্পে বিনিয়োগক্ষেত্র দুটি আলাদা করে সবিস্তারে নির্ণিত হয়। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রধান শিল্পগুলি জাতীয়করণ করা হবে, কীভাবে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রসার হবে, শিল্পাধীন মজুরের স্বার্থ কীভাবে রক্ষিত হবে, সামাজিক ন্যায়বিধান ও বিদেশী লগ্নি ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে, এসব বিষয়ে নীতি ঘোষিত হয়। তবে ১৯৪৮ সালের ঘোষণায় যখন বলা হয় যে জাতীয়করণের কর্মসূচি আপাতত দশ বছরের জন্য স্থগিত থাকবে, তখনই সারা দেশে জোর সমালোচনা হয় সরকার ব্যবসায়ীদের কাছে নতিস্বীকার করে মিশ্র অর্থনীতির শরণাগত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেই হয়। ১৯৩৮ সালে যাঁরা জাতীয় প্ল্যানিং কমিটির কাজ শুরু করেন, এবং পরে যাঁরা সেই কাজ চালু রাখেন, তাঁদের সকলেরই একান্ত বিশ্বাস ছিল যে তাঁদের সব প্রচেষ্টার মূলে আছে একটি শর্ত: রাজনৈতিক স্বাধীনতা, যার প্রধান বাণী হল, নিজের ঘরে নিজে মালিক না হলে কিছু সম্ভব নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সবকিছুর উৎস, তার জোরেই দেশের যা কিছু সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব, এবং সেই পরিবর্তনের ফলেই গণতন্ত্র কায়েম হবে। বিনা স্বাধীনতায় যা কিছু উন্নতি, তার অধিকাংশই হবে বড়জোর পূর্বের অবস্থারই একটু কমবেশী, তার ফলে দিক পরিবর্তন বা নতুন জীবন আসা সম্ভব নয়। অতীতেরই পারম্পর্য রক্ষা হবে, নতুন জোয়ার আসবে না। সুতরাং অতীত ঐতিহ্যের উজানে কাজ শুরু করা একান্ত আবশ্যক। আমার মনেও এই উপলব্ধি কিভাবে এল এবং তার পরিণতি বা ফলাফল কি হল তাই এই অধ্যায়ের বাকি অংশে বলব।

যোজনা কমিশন ও প্রথম পাঁচসালা যোজনা

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতা স্মরণ করলে এইটুকু মনে হয়, উদ্যোক্তারা সবকিছু বিষয়ে আগে থেকে বিশদ বিচারের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ ও উচিত জোর দেন। ১৯৪৬ সালে যে উপদেষ্টা প্ল্যানিং বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বোর্ডও বিভিন্ন পরিকল্পনার পরস্পরের উপর প্রভাব, সংঘাত, পারম্পর্য

ও ক্রমান্বয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব করার জন্য একটি স্বাধীন সংস্থার প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। তাঁরা সুপারিশ করেন, একটিমাত্র সংহত সংস্থা থাকবে যা হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে দায়ী। সেই সংস্থাটি সবগুলি উন্নতিমূলক পরিকল্পনার প্রতি অঙ্গের অগ্রগতির উপর ক্রমান্বয়ে নজর রাখবে। ১৯৪৮-এ কংগ্রেসের ইকনমিক প্রোগ্রাম কমিটি এই ধরনের তদারকির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। প্ল্যানিং কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সাহায্যার্থে একটি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির সৃষ্টি করেন। অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হলেন ডাঃ জ্ঞানচাঁদ, পরিসংখ্যান উপদেষ্টা পি-সি মহলানবিশ। তাঁদের সাহায্য করেন একটি অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্ববিদদের কমিটি। অবশেষে ১৯৫০-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি প্ল্যানিং কমিশন গঠিত ও ঘোষিত হল। নেহরু হলেন সভাপতি, গুলজারিলাল নন্দ উপসভাপতি, অর্থমন্ত্রী সি-ডি দেশমুখ, গগনবিহারীলাল মেহতা, ও আর-কে পাতিল হলেন সভ্য। এই সময়ে আমি সেন্সাস কনফারেন্স উপলক্ষ্যে দিল্লীতে ছিলুম। এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার মনে কি উল্লাস এসেছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিত্তি হল আগামী পাঁচ বছরে কত মূলধন লগ্নির জন্য জমে ওঠা সম্ভব তার অনুমিত হিসাবের উপর। হিসাবটি তৈরি হয় সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হ্যারড ও ডোমারের সূত্রের উপর ভিত্তি করে। সেই সূত্রের আবার ভিত্তি হল, পাঁচ বছরের প্রথম বছরে সঞ্চয়ের যে হার অনুমান করা হয়েছে তার সঙ্গে প্রতি বছরের শেষে তার আই-সি-ও-আর (ইংরেজিতে ইনক্রিমেণ্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও অর্থাৎ ভগ্নাংশ) দিয়ে গুণ করলে— অর্থাৎ প্রতিবছর মূলধন আর তার কৃতফলের মধ্যে যে হারাহার, সেই হারাহার বছরের পর বছর কি হারে বৃদ্ধি পাবে, প্রতিবছরের শেষে সেই বর্ধিত ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে প্রতিবছরের লগ্নির উপযুক্ত সঞ্চয় কত বাড়তে পারে তার নির্ণয় হবে। অর্থনীতিবিদরা যাকে আসল বৃদ্ধির হার বলেন এটি তা নয়। হ্যারড-ডোমার সূত্র ধরে প্রতিবছরের শেষে যে অর্থপ্রাপ্তির হিসাব হত সেই অর্থ সরকার নানা বিভাগে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধিমত ভাগ করে দিতেন।

১৯৫১-এর ৯ জুলাইয়ের রিপোর্টে ১৯৫২-৫৭ এই পাঁচ বছরে মোট কত অর্থ উন্নতি খাতে বিলির জন্য পাওয়া যেতে পারে তার হিসাব দেয়া হল: মোট ১৪৯৩ কোটি টাকা। বিদেশী সাহায্য কত পাওয়া যেতে পারে তারও আলাদা হিসাব হল: মোট ৩০০ কোটি টাকা। দুই খাত মিলিয়ে ১৭৯৩ কোটি টাকা। কেন্দ্রের খাতে পড়ল ৭৩৪ কোটি টাকা, আর রাজ্যের খাতে ৭৫৯ কোটি টাকা।

সুতরাং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা মূলত হল অনুমিত সরকারি লগ্নিসমূহের যোগফল, যার অধিকাংশই যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন প্রোগ্রামের বলে আগে থেকেই শুরু করা হয়েছিল।

সামাজিক সমতা রক্ষার্থে জনপিছু ভোগ্যবস্তুর সীমা এইভাবে নির্ধারিত হল : আহার্য (চাল, গম, বাজরা ইত্যাদি), দৈনিক ১৪·৫ আউন্স (৪১১ গ্রাম); সারা বছরের কাপড়, ১৫ গজ (১৩·৭ মিটার), চিনি ৮·৩ পাউণ্ড (৩ কেজি, ৬৬৯ গ্রাম), পাঁচসালা যোজনার শেষে খাদ্যদ্রব্য, পাট, তুলো, তেলবীজ ও চিনির ফলন কত বৃদ্ধি পাবে তার হিসাব দেয়া হল। বেসরকারি অর্থ-উদ্যোগে কত অর্থবৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে তারও হিসাব দেয়া হল।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিভাগে যোগদান

হাতেকলমে কাজ না করলে অনেক কিছু পরিসংখ্যানের তাৎপর্য বা সার্থকতা বোঝা যায় না। এমন-কি যখন সেন্সাসের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট লিখছি, তখনও উন্নয়ন কাজে সেন্সাসের তথ্য কতভাবে ব্যবহার করা যায় তাও আমার মাথায় সম্পূর্ণ ঢোকেনি। ১৯৫২-র ১৫ জুলাই আমি যখন অবৈতনিকভাবে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য উন্নয়ন বিভাগে কাজ করার জন্য ভর্তি হলুম তখন জানলুম কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সি-ডি দেশমুখ সারা পাঁচসালার টাকা ১৭৯৩ কোটিকে বাড়িয়ে ২৩০০ কোটি টাকা করেছেন। ফলে সরকারি ও বেসরকারি লগ্নি মিলিয়ে অঙ্কটি দাঁড়ায় প্রায় ৪৮০০ কোটিতে, তবে ১৯৫২-র ৩১ মার্চ তিনি বলেন কলম্বো প্ল্যানের সঙ্গে সাযুজ্য আনার জন্য তিনি পাঁচসালা পরিকল্পনার আয়ু আরো একবছর বাড়িয়ে ছয়সালা করে দিলেন।

পশ্চাদ্‌দৃষ্টির কল্যাণে পঞ্চাশ দশকের এ-সব হিসাব ও লক্ষ্যের মধ্যে অনেক কিছু ছিদ্র ধরা যায়। তবে আগেই বলেছি, পশ্চাদ্‌দৃষ্টির বলে বিজ্ঞপ্রাজ্ঞ সাজার ইচ্ছা আমার এখন নেই। সেইকালে আমার যা মনে হত তাই বলি। আমার কাছে নতুন পাঁচসালা প্ল্যান নিয়ে এল আশা ও উৎসাহের যুগ যা ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আমাকে উদ্দীপিত রাখে। এই আবেগ ও বিশ্বাস পঞ্চাশের দশকে আমাকে প্রভূত উদ্দীপনা যোগায়; এমন-কি ১৯৫৬ সালে কমার্স অ্যাণ্ড কোঅপারেটিভ, মৎস্যচাষ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বড়-মাঝারি আধুনিক ও কুটিরশিল্প এবং তৎসংলগ্ন পাঁচটি বিশেষ বোর্ডের (নারকোল ছোবড়া, তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প,

রেশম, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প) কাজ করার সময়ে মাঝে মাঝে দমে যাবার মত নিরাশা এলেও, সে মনোভাব দমন করতুম। বিশ্বাস ও আস্থা ছিল আমার অবলম্বন। আমাদের দেশে একটি প্ল্যান আছে, প্ল্যান তৈরির সংস্থা আছে, প্ল্যানমাফিক ধাপে ধাপে কাজ হচ্ছে ও হবে, এক প্ল্যানের পর আরেক প্ল্যান আসবে এই বিশ্বাস ও আশাই আমার মনে মাদকতার কাজ করত।

১৯৫২-র শুরু থেকে সেন্সাস অফিসে যদি কোন দপ্তর, এমন-কি ব্যক্তিও পরিসংখ্যান চাইতেন তখনই সারণিগুলি থেকে নকল করার জন্য অনুমতি দেয়া হত। বেশী অনুরোধ আসত কৃষি ও উন্নয়ন বিভাগ থেকে। সে বিভাগের সেক্রেটারি তখন সুশীলকুমার দে। কৃষ্ণনগরে ১৯৪০-৪১ সালে আমার প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার হয়ে এলেন। রাজভবনের একতলার উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটি হল তাঁর দপ্তর।

ডেভেলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের পরিসংখ্যান অফিসার, রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (এখন কলকাতায় রিজেণ্ট এস্টেটে থাকেন), কমিউনিটি প্রজেক্ট এলাকাগুলির তথ্য সংগ্রহ করতে আমার কাছে আসতেন। সুশীল দে সেন্সাস দপ্তরের তথ্য-প্রাচুর্যে চমৎকৃত হন। বিভাগের খুঁটিনাটি কাজের উপর ঠিকমত নজর রাখতে পারে এমন একজন অফিসার খুঁজছিলেন, সেই উদ্দেশ্যে একাধিকবার আমাকে ডেকে পাঠিয়ে অনুরোধ করেন আমি যদি তাঁর বিভাগে যোগ দিই। তখন আমি আমার রিপোর্টের অর্ধপথে, প্রতিবারই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না বলি। উপরন্তু সে-সময়ে আমি চোদ্দ খণ্ড গেজেটিয়ার ও অন্যান্য বইয়ের ছক ফাঁদতে ব্যস্ত, তাতে অন্তত আরো দু'বছর সময় লাগবে। স্বীয় বৈশিষ্ট্যমত, সুশীল দে একদিন স্বয়ং আমার ঘরে এসে হাজির। তিনি বসতেন রাজভবনে, আমি বসতুম প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের অফিসে। প্রতিদিন অন্তত অর্ধেক সময় তাঁর দপ্তরে কাজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, বললেন, তিনি আমার আসল সেন্সাসের কাজে কোন বাধার সৃষ্টি করবেন না। জয়তীকে দূরে দার্জিলিঙে রেখে আভার মনের এককোণ সর্বদাই হুহু করত। আমাকে বলল, এত করে পীড়াপীড়ি করছেন, তুমি কাজটা নাও, তাহলে বুগুকে (জয়তীকে) এখানের স্কুলে ভর্তি করে কাছে রাখতে পারা যাবে। নিজের আত্মপ্রসাদেও সুড়সুড়ি লাগল, সেই সঙ্গে লোভও হল। দুই কারণ। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন দপ্তরে যদি কাজ পাই তা হলে হয়তো সেন্সাসের পরও কলকাতায় কয়েক বছর থাকতে পাব, তার

কল্যাণে জয়ন্তীকে দার্জিলিং থেকে এনে কলকাতার লোরেটো হাউসে ভর্তি করে দিতে পারব, আমাদের কাছে থাকবে। দ্বিতীয়ত, জয়েণ্ট কমিশনার হিসাবে আমি সি-ডি-পির সদ্য আমদানি-করা নতুন আমেরিকান জীপে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গেজেটিয়ার লেখার জন্য মালমশলা সংগ্রহ করতে পারব। সেই সঙ্গে পদাধিকার-বলে সব দপ্তরের নথিতে ও অফিসারের কাছে আমার অবারিত গতি হবে: গেজেটিয়ার লেখার পক্ষে যা আমার বিশেষ কাম্য ও প্রয়োজন।

আর-এ গোপালস্বামী দে'র দপ্তরে, আমার সেন্সাস কাজের অধিকন্তু হিসাবে, যোগ দেবার অনুমতি দিলেন। তখনও তিনি আমার লেখা সেন্সাস রিপোর্টের খসড়া দেখেননি, এবং ভর্ৎসনা করেননি। ১৫ জুলাই ১৯৫২ থেকে আমি অবৈতনিক জয়েণ্ট ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনার পদে পশ্চিমবঙ্গের গেজেটে ঘোষিত হলুম। তার আগে থেকেই অবশ্য আমি উন্নয়ন বিভাগে কাজ শুরু করেছি। রাজভবনের উত্তর-পূর্বাংশের একতলায় একটি বড় ঘরের কিছু অংশ পার্টিশন করে আমার জন্য একটি কামরা তৈরি হল। ১৯৫২ সালের শেষ পর্যন্ত রাজভবনের প্যান্ট্রি থেকে আমাদের জন্য বিনামূল্যে সকালে কফি ও বিকালে চা আসত। রাজভবনের বিরাট দরজা ভেদ করে দিনে দুবার যখন সাদা ধোপদুরস্ত ইস্ত্রি করা উর্দির উপর লাটভবনের লাল তকমা সাঁটা, কোমরে লাল পেটি বাঁধা, ও মাথায় কুল্লাওলা পাগড়ি পরে আবদাররা রুপো ও চীনেমাটির ঝকঝকে বাসনপত্র সাজিয়ে কফি বা চায়ের ট্রে নিয়ে আসত, তখন খুব ভাল কফি ও চায়ের গন্ধে সারা বিভাগ আমোদিত হয়ে উঠত। বুঝিবা কোন অনুষ্ঠান ঘটতে চলেছে। মনে পড়ত দ্বিজুরায়ের 'এসো দাড়ি নাড়ি কলিমুদ্দি মিঞা'।

দে সাহেবের ব্যবহারে যেমন সহৃদয়তা ছিল, তেমনি সকলের সঙ্গে সমান-ভাবে একই গলার স্বরে কথা বলতে পারতেন। ফলে তিনি ভাল ভাল অফিসার জড়ো করেছিলেন। প্রথমেই নাম করি সুখময় রায়ের: যেমন নেতৃত্বে তেমনি কার্যহাসিলে পটু। শিল্পক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত মুকুল গুপ্ত ছিলেন বিশেষ অভিজ্ঞ, তার সঙ্গে ছোট ছেলেদের মত মাথায় দুষ্টুমি ঘুরত, রসিয়ে গল্প বলায় ছিলেন ওস্তাদ। অজিত গুপ্ত ছিলেন জনসম্পর্ক-ভারপ্রাপ্ত: দুর্ধর্ষ গোখরো সাপকেও বশ করতে পারতেন। সুকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন অল্পবয়স্ক, যথেষ্ট অবহিত কৃষিবিদ্, মাঠঘাটের কাজে সুপটু। পঙ্কজ চ্যাটার্জি ছিলেন সদ্য শিবপুর থেকে পাস করা স্বাস্থ্যবিষয়ক এঞ্জিনিয়ার। রবীন সেনগুপ্তের কথা আগে বলেছি। দপ্তরে কার কি পদমর্যাদা সে বিষয়ে পঙ্কজ অনেক সময়ে বুঝেসুঝে কথা বলতেন না, ফলে ব্যবহারে বেশ

একটি টাটকা সতেজ ভাব থাকত। বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত জ্যোতি বোসের (বসু নয়) ব্যবহার ছিল যেমন সুন্দর, তেমনি ছিল আত্মনিয়োগ ও মজা করার ইচ্ছা। তাছাড়া ছিলেন একজন আমেরিকান কৃষিবিদ্, নাম জ্যাক গ্রে: 'অতি নিখুঁত ভদ্র' টেক্সাস সন্তান। উপরন্তু তাঁর স্ত্রীর সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে সকলে মুগ্ধ হত। জ্যাক গ্রে'র ভারতীয় সহকর্মী ছিলেন একটি অল্পবয়স্ক সুদক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ কৃষিবিদ্, প্রশান্ত মজুমদার।

দে সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের দপ্তরের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য ছিল যা দিল্লী বা কলকাতার অন্য কোন দপ্তরেই ছিল না, এমন-কি ইতিমধ্যে চার দশক অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, এখনও কোন সরকারি অথবা বেসরকারি দপ্তরে নেই। বেশ কয়েকজন অল্পবয়স্ক, সুশ্রী, সুন্দরী, মহিলা নিজ নিজ কর্তব্যে ও বিদ্যায় পারদর্শী, ব্যস্তসমস্তভাবে সারা দপ্তরটি সরগরম করে রাখতেন। তাঁদের একজন ছিলেন দে'র ব্যক্তিগত সেক্রেটারি, অন্যরা বিশ্লেষণ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণে লিপ্ত। প্রত্যেকেই ছিলেন আত্মমর্যাদাপূর্ণ, সকলেই তাঁদের প্রতি সম্মানসূচক অথচ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করতেন, স্ত্রীলোক বলে অবজ্ঞা বা কোনরকম হেয়, জব্দ করা, বা অস্বস্তিতে ফেলা তো নয়ই। তাঁদের উপস্থিতিতে দপ্তরের শোভা বর্ধন তো হতই, কাজেও আগ্রহ আসত। প্রত্যেকেই নিজ কাজে সুদক্ষ ছিলেন। দে'র নিজস্ব সেক্রেটারি, অণিমা বসাক, যদি কারোর ঘরে ঢুকতেন, তাঁর সৌন্দর্যে ও স্বভাবে কঠোর স্ত্রীবিদ্বেষীও বিগলিত হতেন, তাঁর প্রয়োজনের কাগজপত্র বা ফাইল তাঁকে দেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। গবেষক, মায়া দে সরকারও তাঁর উপস্থিতিতে ও খুঁটিনাটির দখলে সকলকে মুগ্ধ করতেন। ঊষা মুখার্জির ছিল দিল্লী স্কুল অভ হোম সায়েন্সের ডিগ্রি। সমাজশিক্ষা সংগঠকদের প্রধান শান্তি চক্রবর্তী ছিলেন এবং এখনও আছেন নিজ কাজে, চিন্তায় ও বিবেচনায় দুর্ধর্ষ, মেয়েদের সমাজশিক্ষার যে-কোন ক্ষেত্রে শেষ কথা বললেই হয়। তাঁদের উপস্থিতির সৌষ্ঠব ও মাধুর্য সত্ত্বেও তাঁদের ব্যবহারে কিছুমাত্র ন্যাকামি থাকত না। ন্যাকামি তাঁরা পছন্দও করতেন না। এঁদের দৌলতে আমাদের দপ্তরের কোন মিটিং-এ অন্য দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট অফিসার জড়ো করতে আমাদের কোন অসুবিধাই হত না। সবাই আসার জন্য পা বাড়িয়ে থাকতেন, এমন-কি স্বভাবসিদ্ধ অভব্য উন্নাসিক অর্থমন্ত্রকের কর্মীরাও। এই ধরনের নরনারীর সমাবেশ যে সময়ে সময়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হত না তা নয়। যথা, আমার বন্ধু সনতের বোন গীতার সঙ্গে যুবক পঙ্কজ চ্যাটার্জির পরিণয় হল।

রাজভবনে আমরা পরস্পরের সাহচর্যে কি আনন্দে কাটিয়েছি, আশা করি পাঠক বুঝতে পারছেন। দে সাহেব 'সবে মিলি করি কাজ' মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, এমন-কি মফস্বলে মিটিং ফেঁদে সেখানে সারি সারি মোটরে করে সকলে মিলে আমরা যাব, সে বিষয়েও তিনি বিধান দিতেন। এই ধরনের সফরে মাঝে মধ্যে মিসেস দে'ও আমাদের সঙ্গে যেতেন, তখন সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি পেত। এইসব মিটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে আমি প্রায়ই একা একা যেতুম গেজেটিয়ারের তথ্য আহরণ করতে, অথবা বাউড়ি বা সাঁওতালদের গ্রামে তাদের কাছে দু'একদিন থেকে তাদের জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করতে। পরে জানলুম, দে সাহেব আমার এই ধরনের ঘোরাফেরার খবর স্থানীয় প্রোজেক্ট অফিসারদের কাছে পেতেন।

প্রথম কয়মাস আনন্দে ও হৈ-হল্লায় কাটল। যদি সেন্সাসের কাজের চিন্তা না থাকত তাহলে হয়তো আরো আনন্দ পেতুম। ১৯৫২ সাল শেষ হবার আগেই আমি প্রতি প্রজেক্টের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে ও সারা অঞ্চলে প্রথম দফা পরিদর্শন শেষ করি। ১৯৫৩-র প্রথমে যখন দ্বিতীয় দফা টহল শুরু করলুম, তখন দেখি গত ছয়মাসে কথাবার্তা ও মিটিং ছাড়া সরেজমিনে হাতেকলমে, অর্থাৎ জমিতে চোখে পড়ার মত তেমন বিশেষ পরিবর্তন, পুনর্গঠন বা উন্নতি হয়নি। না হয়েছে উৎপাদনে, না হয়েছে নতুন পন্থা, প্রযুক্তি বা পদ্ধতি অবলম্বনে। মাঠে, ঘাটে রাস্তা বা সেচের নালি কাটার কাজ প্রায় শুরুই হয়নি। জ্যাক গ্রে ও প্রশান্ত মজুমদার এবং তাঁদের কর্মিদের উদ্যমে চাষের কিছু উন্নতি হয়, কিন্তু গ্রামসেবক ও সেবিকার কাজের উপর যথেষ্ট তদারকের অভাবে, উপরন্তু তাদের ঔদাসীন্যের দরুণ, যন্ত্রপাতি বা ক্ষুদ্রসেচব্যবস্থা প্রসারের অভাবে উন্নতির পথ যথেষ্ট সুগম হয়নি। প্রথম প্রথম গ্রামবাসীরা যখন তখন শহর থেকে মোটরগাড়ির সারি আসা দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। কিন্তু যখন দেখল বক্তৃতা ছাড়া, হাতে-কলমে পরিবর্তন বা উন্নতি হচ্ছে না, পরিবর্তে শুধু মোটরের ধুলো খাওয়াই সার, তখন বিরূপতা শুরু হল। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে নতুন কল, চাষবাসের যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদি বা শিক্ষার উন্নতির সুফল গ্রামে বিশেষ দেখা গেল না। গ্রামসেবক এবং অন্যান্য কর্মীরা নিজের হাতে কাজ করে কিভাবে উন্নতির পথে এগোতে হয় দেখানোর আগ্রহ দেখালেন না।

অন্যপ্রদেশের কাজকর্ম : ওড়িষ্যা : ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের গোড়ায় ওড়িষ্যার ভদ্রক ও কটক জেলায় কয়েকটি স্থানে ঘুরে বুঝতে পারলুম পশ্চিমবঙ্গে সমাজ উন্নয়নের কাজ কত পিছিয়ে আছে। ওড়িষ্যার জয়েণ্ট ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনার, পি-এস মহাপাত্র, ও তাঁর অল্পবয়স্ক ডেপুটি, অমৃত নায়ার আমাকে বালেশ্বর জেলার ভদ্রক ব্লকে বেশ ভাল করে ঘুরিয়ে দেখালেন। আভাও আমার সঙ্গে যায়। গ্রামবাসীদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা পড়ে গেল, কে আমাদের কত বেশী দেখাবে ও বোঝাবে, উন্নতির জন্য কে কত বেশী চেষ্টা করছে, নতুন কী করছে, কী কী যন্ত্র এনেছে, সেগুলি দিয়ে কি করছে, যেটুকু কাজ পূর্ণ করবে ভেবেছিল তার থেকে কত বেশী সম্পূর্ণ করেছে : যথা জমির ফলনের উন্নতি, সেচের নতুন ব্যবস্থা ; ধাত্রীদের বাড়ি বাড়ি যাবার প্রথা ; স্কুলে ও সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির ও শিক্ষার উন্নতি বা সুব্যবস্থা। যে আসে সেই উৎসাহের সঙ্গে গলগল করে একগাদা বলে, বলার ধরন ও আগ্রহ দেখেই বোঝা যায় তারা নিজের কাজের জন্য গর্ববোধ করছে। জমিতে ডেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখায় নতুন যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, সেচের পাম্প। মহাপাত্র বা নায়ার কথা বলার বিশেষ সুযোগই পেলেন না, গ্রামবাসীরাই হল মুখর। সব থেকে চমৎকৃত হলুম লজ্জা বা আড়ষ্টতা কাটিয়ে গ্রামের মহিলাদের কলবল করে কথা বলা, নতুন বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে উৎসাহ দেখে।

একটি ব্যাপারে আমি আর আভা হতবাক : এমন যে সম্ভব আগে ভাবিনি। গ্রামের মেয়েরা তাদের সমাজবিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। সেখানে ঘণ্টাখানেক থেকে গেলুম মেয়েদেরই একটি ক্ষুদ্রশিল্প উৎপাদন কেন্দ্রে। দুই স্থানেই মহিলারা নিজেরা সবকিছু যন্ত্রপাতি চালিয়ে দেখালেন, বোঝালেন, তাঁদের হাতের কাজের প্রদর্শনীও দেখলুম। সকাল ৮টা নাগাদ ডাকবাংলা থেকে বেরিয়েছিলুম, ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই-তিন ঘণ্টা কেটে গেছে। মহিলারা তখন আমাদের একটি খড়ের চালের মাটির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ঘরটি বেশ বড়, খোলামেলা। চারদিকে দেয়াল ঘেঁষে মাটির উপর ছোট ছোট পাটির আসন পাতা, অতিথিরা বসবেন। প্রতি আসনের সমুখে ধোয়ামোছা, চকচকে দুটি কলাপাতা ডবল করে পাতা। সকলে বসলুম। আট নয়জন প্রৌঢ়া মহিলা হাতে বড় বড় পিতলের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। প্রতিটি থালায় পনেরো থেকে কুড়িটি ঝকঝকে ছোট কাঁসার পদ্মকাটা বাটি, প্রতিটিতে এক হাতা করে টাটকা

ছানা। তারপর এলেন আরেক দল মহিলা, হাতে একই সাইজের বড় থালা। তার উপর সার সার শালপাতার তৈরি দোনা, প্রতিটির মধ্যে কিছু কল-বেরুনো ভিজে ছোলা আর স্থানীয় ময়রার তৈরি ছোট দুটি মিষ্টি। মহিলাদের দেয়া-থোয়া, ঘোরাফেরা সবকিছুতেই স্বভাবসিদ্ধ স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মসম্ভ্রম, আত্মীয়সুলভ ব্যবহার, কোন আড়ষ্টতা নেই। তাঁদের পরিবেশনে এতই আপন ও আত্মস্বভাব, মনে হল এর থেকে ভাল আপ্যায়ন হতে পারে না। এরকম সুষ্ঠু, সরল, শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ ও ব্যবহার শুধু সাঁওতাল বাড়িতেই দেখেছি। আভা আর আমি অবাক।

এই যাত্রায় আমরা প্রথম কোণারক দেখলুম। মুন্সীগঞ্জে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে, পরে ১৯৫০-এর হাওড়ার দাঙ্গায় আমার যে-ধরনের চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি হয়েছিল, কোণারক দেখেও অনুরূপ গভীর উপলব্ধিতে আমার হৃদয় উত্তাল হয়। তবে মুন্সীগঞ্জে ও হাওড়ায় হয় মানুষের চরম দুর্গতি ও হিংস্রধ্বংসাত্মক মূর্তি দেখে, আর কোণারকে হয় সম্পূর্ণ বিপরীত অভিজ্ঞতার: মানুষের আত্মা ও সৃষ্টিশীল হাত, চিত্তের গভীরতা ও বিশ্বের স্বর্গীয় সৌন্দর্য ও শারীর-অনুভূতি, শুদ্ধতা ও বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার কোন পর্যায়ে তুলতে পারে তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখে।

ওড়িষ্যা থেকে ফিরে এসে শুনলুম, ১৯৫১ সালের আসামের সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, আর-বি ভাগাইওলা, যিনি তখন দিল্লীর সুরেন্দ্রকুমার দের অধস্তন অফিসার, তিনি আমার অবর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এসে, কয়েকটি সি-ডি-ব্লক ঘুরে ঘুরে দেখে সুশীল দে'কে বলে গেছেন, কয়েকটি ব্লকের প্রোজেক্ট অফিসার কর্তব্যে বিশেষ অবহেলা করেছেন, তাদের সরিয়ে দিলেই ভাল হয়। উনি নাকি বলেছেন, দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির থেকে আত্মার আলোড়নই বেশী চলছে, দেহ ও আত্মা একসঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করছে না।

একেবারে গ্রামের স্তরে যারা কাজ করে তাদের চলাফেরার উপর সদ্য আমদানি করা জীপগুলির বিষবৎ প্রভাব দেখে আমার বিশেষ উদ্বেগ হল। এস-ডি-ও, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করার সময়ে আমি সাইকেল চড়ায় অভ্যস্ত ছিলুম, ফলে ধারণা বদ্ধমূল হয় যে হাঁটা বা সাইকেল করা ছাড়া গ্রামবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ বা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব নয়। আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম যখন মহম্মদবাজারের প্রোজেক্ট অফিসার আমার সঙ্গে সাইকেল করে সামান্য কয়েকমাইল যেতে রাজি না হয়ে জীপে চড়ে আমার পিছন পিছন এলেন আর আমি সাইকেল চালিয়ে তাঁর আগে আগে গেলুম। তার থেকেও

বেশী স্তম্ভিত হলুম যখন কয়েকজন গ্রামসেবক বলল জীপ ছিল না বলে তারা পার্শ্ববর্তী গ্রামে কাজ দেখতে যেতে পারেনি। গ্রামসেবকরা এরকম অলস ও কর্তব্যবিমুখ হবে ভাবিনি। অন্যদিকে জীপের অপব্যবহার দেখেও খারাপ লাগল। নতুন জীপের সৌভাগ্য যে-সব বিভাগের বা অন্যান্য উঁচু অফিসারদের হয়নি তাঁদেরও আমাদের বিভাগের বিরুদ্ধে বিরূপতা বাড়ল। দে সাহেব ভাবলেন সাইকেল চড়া বা হাঁটার উপর জোর দিয়ে আমি অযথা সনাতনী গোঁড়ামি দেখাচ্ছি, নতুন যুগের সঙ্গে পা মেলাচ্ছি না। বুঝতে পারলেন না সনাতনী অনড় সমাজে সচলতার একটা সীমা আছে।

অন্যভাবে দেখলে স্বীকার করতে হয় দে সাহেব মানুষের স্বভাবজাত দায়িত্ব-বোধের উপর বিশ্বাস রাখতেন এবং সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাদের স্বাধীনতা দিতেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং বা কনফারেন্সে নিজে না গিয়ে তিনি তাঁর অধস্তন কর্মচারিদের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাতেন। তাঁর অধস্তন কর্মচারিদের অবশ্য খুঁটিনাটির উপর দখল বেশী থাকত। তা সত্ত্বেও উপরওলাদের পক্ষে অধস্তনদের উপর এই বিশ্বাস সচরাচর থাকে না।

উটকামণ্ড কনফারেন্স ও মহীশূর : ১৯৫৩

উটকামণ্ডে প্রথম সর্বভারতীয় সি-ডি-পি কনফারেন্স হয়। দে নিজে না গিয়ে সুখময় রায়, মুকুল গুপ্ত ও আমাকে পাঠানো স্থির করলেন। এটি হল ১৯৫৩-র বসন্তকালের শেষ ভাগ। মাদ্রাজ, কইম্বাটোর ও উটকামণ্ডে আমার প্রথম সফর। উটকামণ্ডের চারিদিকে বিলেতের উইলটশিয়ারের মত 'ডাউন্‌স' অর্থাৎ মসৃণ উঁচুনিচু ঢেউখেলানো ঘাসে ঢাকা পাহাড় দেখে মনে রোমাঞ্চ এল।

উটকামণ্ডেই উত্তরপ্রদেশের কমিশনার আদিত্যনাথ ঝা, বিহারের রমণ, মধ্য-প্রদেশের রেইনবোথ ও পাঞ্জাবের মঙ্গৎরায়ের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। আদিত্য-নাথ হুইস্কির ভক্ত ছিলেন। প্রবাদ আছে গোবিন্দবল্লভ পন্থ তাঁকে খুব ভাল-বাসতেন; টেরাই অঞ্চলে তাঁকে উন্নয়ন কমিশনার করে যখন পাঠান তখন নাকি তাঁকে বলেন: 'ওখানে তোমার একটি বিশেষ মাসিক ভাতা থাকবে, সেই দিয়ে তোমার অনাবশ্যক খরচগুলি মেটাতে পারবে।' মাদ্রাজে বিনা পারমিটে হুইস্কি ছিল নিষিদ্ধ। দোকানে হুইস্কি কিনতে গেলে সরকারি অনুমোদনপত্র দাখিল করতে হত, সে পত্রে যিনি কিনবেন তাঁর নাম লেখা ও সই থাকত। ঝা'র নিচে

একজন ডেপুটি ছিলেন, তিনি ঝায়ের নামে পন্থের কানে নাকি চুকলি করতেন। যেদিন কনফারেন্স বসল, সেদিন সন্ধ্যায় ঝা কয়েকজনকে তাঁর ঘরে হুইস্কি খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। শুরু করার আগে, দেখি তিনি মনিব্যাগ থেকে একটি ছাপা কাগজ বার করে, সেটির পাট খুলে তাঁর ডেপুটির নাকের ডগায় নেড়ে বলছেন, ঐ পারমিটটি তার নামে নেয়া হয়েছে। যদি সে ভালমানুষ সেজে হুইস্কি খেতে না চায় আর ফিরে গিয়ে পন্থজীকে লাগায়, তবে পন্থজীকে তিনি পারমিটটি দেখাবেন। পারমিটটি অবশ্য ঐ ডেপুটির নামে আদিত্য নিয়েছিলেন। হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। আদিত্যের আরেকজন ডেপুটি ছিলেন, নাম কীথ স্টিভ্‌নসন্‌। পরে, ষাট দশকের মাঝামাঝি কীথ আমার সঙ্গে প্ল্যানিং কমিশনে কাজ করে, ভারি চমৎকার লোক ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা মাত্র তিনজন ছিলুম। আমাদের মধ্যে কেউই আগে দাক্ষিণাত্যে যাইনি বলে আমরা কলকাতা ছাড়ার আগে দে'র কাছে কনফারেন্সের পর কয়েকদিন ছুটি চেয়ে নিয়েছিলুম। করদরাজ্যদের মধ্যমণি, মহীশূরে, যত অল্পদিনের জন্যই হোক একটু ঘুরেফিরে দেখার ইচ্ছা ছিল। তাছাড়া আমার খুব ইচ্ছা ছিল সার এম বিশ্বেশ্বরায়াকে চাক্ষুষ দেখে প্রণাম জানানো, তার সঙ্গে রাজনীতিবিদ প্রশাসনিক নেতা সার মির্জা ইস্‌মাইল এবং সম্ভব হলে বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ্‌ সি-ভি রমণকে।

উটকামণ্ডে একটি মহীশূরগামী যাত্রীবাসে উঠে আমরা প্রায় সারাটি দিনই উটকামণ্ড পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে মহীশূরের অন্তর্গত নীলগিরি পেরিয়ে বন্দী-পুরের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাননের মধ্যে দিয়ে গেলুম। রাত্রি প্রায় ন'টার সময়ে মহীশূর রেলস্টেশনের বাসস্ট্যাণ্ডে গাড়ি গিয়ে থামল। পকেটে বেশী পয়সা নেই, সুতরাং সে রাত্রি এবং পরের দু' রাত্রি মহীশূর রেলস্টেশনের বিশ্রামাগারে তিনজনে ডেরা বাঁধলুম। মাস্টারমশায় বিদেশী দেখে অনুমতি দিলেন। পরের দিন সকালে মহীশূর শহর ভাল করে ঘুরে দেখলুম, দেখলুম রাজপ্রাসাদ ও চিত্র-শালা। বেঙ্গল স্কুলের বহু ছবি রক্ষিত আছে। গেলুম এম-এন শ্রীনিবাসের দাদার বাড়ি, দেখলুম মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়। রাতে গেলুম আলোকসজ্জিত বৃন্দাবন নন্দন কাননে। সবকিছুই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেন দ্বিতীয় যুদ্ধের আগের লণ্ডন শহরে ঘুরছি। দ্বিতীয় দিন আমরা ট্রেনে করে গেলুম বেলুড় ও হালেবিদের হয়শল স্থাপত্যভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দিরগুলি দেখতে। কিন্তু তার কিছুদিন আগে ভুবনেশ্বর ও কোণারক দেখেছি বলে হয়শল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আমার চোখে

অনাবশুক জমকালোভাবে অলঙ্কৃত, ফলে অপেক্ষাকৃত প্রাণহীন মনে হল।

হালেবিদ থেকে ফিরতিপথে পথবর্তী রেলওয়ে প্লাটফর্মে কফি বিক্রি ও পরিবেশনের রীতি দেখে অবাক লাগল। আগে কখনও এরকম দেখিনি। একদিকে আগে থেকে নির্যাস করা তরল কফি—যাকে দক্ষিণীরা ডিকক্‌শন বলে—একটি লম্বা স্বচ্ছ কাঁচের বোয়েমে ভরা, বোয়েমের নিচে একটি কল লাগানো, কলের মুখের তলায় একটি পাত্র। অন্যদিকে উনুনের উপর নরম আঁচে বসানো একটি বড় ডেকচি, মাথায় ঢাকনা, তার পাশে জলভরা একটি জামবাটি, জলের মধ্যে একটি হাতা ডোবানো, তার পাশে মুখে প্যাঁচ-আটা চিনির বোতল, ঢাকনায় একটি ফুটো, উপুড় করলে সেটি দিয়ে চিনি পড়ে। এইসবের চার্জে একজন পরিবেশক। কেউ কফি চাইলে কফির পাত্র থেকে মাপ মত কফি কাপে ঢালা হবে, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে জল থেকে হাতাটি তুলে বাঁ হাতে দুধের ডেকচির ঢাকনি সরিয়ে, এক হাতা দুধ তুলে কাপে ঢেলে, বাঁ হাত দিয়ে ঢাকনা ঠেলে ডেকচি বন্ধ করে, হাতাটি আবার জলের পাত্রে ডোবানো হবে। তারপর চিনির বোতলটি উপুড় করে মাপমত চিনি কাপে ঢেলে, চামচ দিয়ে নেড়ে ক্রেতাকে দেবে। সমস্ত কিছু করতে মিনিট খানেকের বেশী সময় লাগে না। কফি, দুধ বা চিনি চলকানো নেই, সারা চত্বরে কোন মাছি নেই। সবটুকুই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত। কাপপ্লেটগুলিও ঝকঝক করছে। খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র সেগুলি জলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে, পরে পোঁছা হচ্ছে। স্থির করলুম, বুড়ো হলে, একলা থাকতে হলে এখানেই এসে বসবাস করতে হবে। অন্তত কলেরা বা টাইফয়েডে মরব না। ভাগ্যক্রমে এখনও একলা হইনি।

তৃতীয় দিনে আমরা বাঙ্গালোর অভিমুখে রওনা হয়ে প্রথমে মাঝপথে শ্রীরঙ্গপট্টমে দুর্গ দেখার জন্য থামলুম। দুর্গটি ভাল করে দেখে আবার যখন বাঙ্গালোর-মুখী আরেকটি বাসে উঠলুম, তখন দেখি কলকাতার মত বাস যাত্রীতে উপছিয়ে পড়ছে। আমরা তিনজন, প্রত্যেকের একটি করে স্যুটকেস। বিদেশী লোক বুঝে কণ্ডাক্টার স্থানীয় যাত্রীদেব বুঝিয়ে পিছনের লম্বা বেঞ্চিতে কোনমতে আমাদের জায়গা করে দিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল, শীঘ্রই আরো ভাল জায়গা করে দেবে। টিকিট দেবার সময়ে জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথাকার লোক। পশ্চিমবঙ্গ শুনে একগাল হেসে উত্তেজিত গলায় বলল, 'ও, বাংলা, অতি সুন্দর, মহৎ দেশ। আচ্ছা, বলুন তো, যা শুনি, ওখানকার বাস কণ্ডাক্টাররা সবাই কি এম-এ বি-এ ?' ঠোঁটে তাকে নিরস্ত করার মত হাসির রেখা টেনে বললুম, 'সবাই নয়, তবে এক-

আধজন আছে।' তারপরই তার প্রশ্ন, 'আচ্ছা, ওখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কেমন? শুনেছি খুব জোরালো!'

ইতিমধ্যে কিছু লোক নেমে গিয়ে বাস একটু খালি হল। আমাদের তিনজনকে সমুখে এগিয়ে নিয়ে জোড়া সীটগুলিতে বসিয়ে দিল। আমি বসলুম একজন লম্বা চওড়া শক্ত চেহারার ওক্কলিগ'র পাশে। (ওক্কলিগরা পশ্চিমবঙ্গের উগ্রক্ষত্রিয়দের মত ভাল চাষী)। তাঁর সঙ্গে বড় বড় চারবস্তা আলু। বাড়িতে বিয়ে, নামার সময়ে ঝুলোঝুলি আমাদের তিনজনকে নেমে রাত্রে তাঁর বাড়িতে বিয়ে দেখতেই হবে। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন নেমে গেল। কণ্ডাক্টার আমাদের আরো এগিয়ে নিয়ে বসালেন। এবার যাঁর পাশে বসলুম, দেখে মনে হল, কোন অফিসার হবেন। একটু ভারিক্কি। কথা শুরুর অভিপ্রায়ে বললুম, মহীশূরে যদি না আসতুম কখনও বিশ্বাস করতুম না, আমাদের দেশে এত সুন্দর, সজ্জিত ও বর্ধিষ্ণু রাজ্য থাকতে পারে। প্রশ্ন করলেন, আমি কোথাকার লোক। বললুম, পরপর চার দান তিনি আন্দাজ করতে পারেন। প্রথমে বললেন, সিংহল। দ্বিতীয়বার আমার প্রাচ্য মাথার গড়ন ও মুখ দেখে বললেন, বর্মা। তারপর নেপাল। তারপর জাপান। মাথায় রঙ্গ করা চেপে গেল। বললুম, আমার অতিবৃদ্ধা প্রপিতামহী হয়তো জাপান গিয়ে থাকবেন, কিন্তু আমি জাপানী নই, ভারতীয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভদ্রলোক চুপ হয়ে গেলেন, অতিবৃদ্ধা প্রপিতামহীর নামে কিনা এই ধরনের কলঙ্ক! মন ভেজাবার জন্য বললুম, আমি বাঙ্গালী। 'বাংলা', বিস্ময়ে ভদ্রলোকের গলা চড়ে গেল, 'তোমার দেশ মহীশূরের থেকে নিশ্চয় অনেক সুন্দর। তাছাড়া তোমার দেশ শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীতের রত্নাগার।' বলেই তিনি ডজনখানেক বাঙালী সাহিত্য মহারথীর নাম আউড়ে গেলেন, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে। প্রত্যুত্তরে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে আমি মাত্র চারটি কানাড়ী নাম বললুম, কৃষ্ণরাও, সুব্বারাও, করন্থ ও জাগীরদার। ভদ্রলোক হার মানার পাত্র নন, বললেন, 'তোমাদের ফিল্মের কথাই দেখ না! কত সূক্ষ্ম, সুরুচি ও শিল্পীমনে ভরা। তোমাদের নিউ থিয়েটার্স। বিশ্বশ্রেণীর স্টুডিও! আর আমাদের? জেমিনির ছবি যেমন কুশ্রী, কামোদ্দীপক, তেমনি কুরুচিতে ভরা!'

মহীশূরের গুণকীর্তন করেই চলেছি। তার আশ্চর্য ঢেউখেলানো ভূচিত্র, লাল কাঁকর আর গাঢ় সবুজ ভেলভেটের মত ফসলভরা মাঠ, ছবির মত সাজানো শহর, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, দিকচক্রবালে কাটাকুটি এঁকে যতদূর চোখ যায় সুউচ্চ রাজকীয় স্তম্ভের উপর টান করে লাগানো অজস্র বিজলির তার, দূরে,

আরো দূরে মিলিয়ে গেছে। রাজ্যের বাধ্য, কর্তব্যানুরত, পরিশ্রমী অধিবাসী। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আত্মমগ্ন থেকে বললেন, 'তুমি সত্যিই তাই মনে কর ? হয়তো তুমি যা বলছ, তার কারণেই আমরা কানাডিগারা দেশের বাইরে কাজের খোঁজে যেতে চাই না, বাড়িতেই থাকি। হয়তো সত্যিই আমরা বেশ কাজ করি।' আবার কিছুক্ষণ চুপ, তারপর যেন অনুভূতির চাপে গলা একটু নরম করে বললেন, 'কিন্তু, আওয়ার টা-কিং ক্যাপাসিটি ইজ লো! (আমরা ভাল করে রসিয়ে কথা বলতে পারি না)।' নিজের মুখরতায় এত লজ্জিত হলুম, কী বলব!

আগে থেকেই সার এম-বিশ্বেশ্বরায়া ও সার মির্জা ইসমাইলকে লিখেছিলুম, আমরা অমুকদিন বাঙ্গালোর যাচ্ছি। তাঁদের নিজস্ব সচিবদের কাছে গিয়ে পরের দিন তাঁদের একটু সময় চাইব, শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য। বিশ্বেশ্বরায়ার সচিব পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটায় সময় দিলেন। সার মির্জা ইসমাইল সাড়ে নটায়। বিশ্বেশ্বরায়ার বাড়ির নাম আপল্যাণ্ড্‌স্ হাইগ্রাউণ্ড। পরের দিন সাতটা কুড়ির সময়ে আমরা গিয়ে হাজির। তাঁর সচিব আমাদের তাঁর সাদাসিধে অফিসে বসালেন। ঠিক সাতটা উনত্রিশে ভিতরের একটি দরজা খুলে গেল। ভদ্রলোক ঘরের ভিতর এক পা দিয়ে দাঁড়ালেন। পোশাক দেখেই বুঝলুম ভদ্রলোক কে! আমাদের অতি সুন্দর, নম্রভাবে ঘরে ডেকে নিলেন। নিখুঁত পরিপাটি পোশাক, মাথায় সোনার জরিপাড়ের পাগড়ি, পরনে ঘি-রঙের পুরু মহীশূর সিল্কের তৈরি পরিপাটি করে ইস্ত্রি করা আচকান, প্যাণ্টে ছুরির মত ইস্ত্রির ভাঁজ, পালিশ করা, চকচকে, ফিতে বাঁধা জুতো। আচকানের বুকে ঘড়ির চেন ঝোলানো। ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম বছরে তাঁর জন্ম। সুতরাং বয়স তখন বিরানব্বই। বড় ক্ষোভ হল রবীন্দ্রনাথ কেন বেঁচে থাকলেন না। ছোট্টখাট্টো মানুষ, সমুখদিকে একটু ঝোঁকা, নব্বই বছর বয়সের পক্ষে পরিষ্কার নরম অল্পবয়সী গলা। আমাদের আগে বসিয়ে আমরা কি কাজ করি জিজ্ঞেস করলেন। সি-ডি-পি সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ, বললেন এই প্রকল্প থেকে অনেক কিছু আশা করেন। এর ফলে গ্রামে শহরে যে-সব সুবিধার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বা হবে, সেগুলি কাজে লাগবে, তাদের উপর যে টাকা ব্যয় হয়েছে সার্থক হবে। নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হবে, উৎপাদিকা শক্তি বাড়বে, তার কৃপায় আরো বেশী কাজের সুবিধা ও জীবিকা বাড়বে।

কথার পিঠে এক সময়ে বললুম, শুনেছি তিনি এখনও দিনে আট-নয় ঘণ্টা খাটেন। কথাটিতে মূল্য না দেবার গলায় বললেন, 'লোকে অত্যুক্তি করে,

আসলে তিনি দিনে সাড়ে সাত ঘণ্টার বেশী কাজ করেন না। তাঁর সঙ্গে ফোটো তুলতে চাইলে বললেন, 'আমার মত বুড়োর উপর কেন ফিল্ম নষ্ট করবেন, আরো তো কত সুন্দর লোক, মনে রাখার মত বিষয় আছে।' আলাপের শেষে আমাদের পাশের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে, সাফল্য কামনা করে বিদায় নমস্কার জানালেন।

সার মির্জা ইসমাইল বয়সে অনেক ছোট, মাত্র উনসত্তর, তার স্থলে বিশ্বেশ্বরায়া বিরানব্বই। আমাদের সাদরে আহ্বানের উদ্দেশ্যে তিনিও ঘড়ি ধরে দাঁড়িয়ে। পরনে ধোপদুরস্ত, ইস্ত্রি করা শেরোয়ানি ও প্যাণ্ট। সার এম-বিশ্বেশ্বরায়ার পোশাকের উল্লেখ করে, ঘোরাফেরার দরুণ আমাদের মলিন পোশাকের জন্য মাপ চাইলুম। সার মির্জা বললেন, 'জানো, ওঁর ঐ রীতি! রাত্রি দুটোর সময়ে যদি গাড়ি চালিয়ে তাঁকে মহীশূরে গিয়ে রাজপ্রমুখের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয় তখনও তাঁকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঐ ধরনের নিখুঁত পোশাকে দেখবে।'

সার মির্জা আরেকটু সাগ্রহে নিজের কথা বললেন : মহীশূরে, হায়দ্রাবাদে, মাদ্রাজে, কেরলে, জয়পুরে কি ধরনের কাজ করেছেন। বললুম ১৯৪০ সালে তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন বক্তৃতা দিতে যান, তখন আমরা বিশেষ গর্ববোধ করি। সাদরে নিজে সই করে তাঁর আত্মজীবনী আমাকে উপহার দিলেন।

আমাদের তৃতীয় তীর্থস্থান হল সার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণের গবেষণাগার। পরের দিন সকাল সাড়ে নটার সময়ে আমরা রমণ-গবেষণাগারে গেলুম। প্রকাণ্ড বড় হাতার মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠানগৃহটি মহীশূর স্থাপত্যে তৈরি ছোটখাটো একটি প্রাসাদের মত দেখায়। হাতার সর্বত্র সযত্নে পালিত নানা ফুলের বাগান, হাতার চারদিকের দেয়াল ধরে বড় বড় উঁচু গাছের সার। স্পষ্টই বোঝা গেল এরকম-ভাবে সুন্দর সাজানো বাগান তখনই সম্ভব যখন বাড়ির কর্তা সবকিছু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তদারক করেন। সমুখের প্রকাণ্ড হলঘর দিয়ে যখন ভিতরে ঢুকছি মনে হল এক পবিত্র মন্দিরে ঢুকছি, সবকিছু এত নিখুঁতভাবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। পরিচারক আমাদের সার সি-ভি'র ঘরে নিয়ে গেলেন। গবেষকের উপযুক্ত প্রথাসিদ্ধ ছোট ঘর, আশেপাশের একাধিক টেবিলে স্পেক্ট্রোমিটার ধরনের নানা মাপযন্ত্র। কতগুলি ছোট ছোট ট্রে, তাদের উপর ছোট আকারের নানা জিনিস ; দেখে মনে হয় দামী পাথর বা শামুকের খোলা! তাছাড়া ছিল টেস্ট-টিউবের কতগুলি

র‍্যাক। বললেন, ওগুলির প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা ধরনের ফুলের মধু আছে।

ভদ্রলোক নিজে বেশ লম্বা, বলিষ্ঠ, মোটার দিকে বলা যায়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় জলন্ত কর্মশক্তির আঁটসাঁট একটি স্তম্ভ। মাথায় সার এম বিশ্বেশ্বরায়ার থেকেও জমকালো চওড়া জরিপাড়ের সোনালি পাগড়ি, পরনে লম্বা গলাবন্ধ কোট, কিছুটা আমার ইংরেজির গুরু প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মত। আমাদের এমনভাবে স্বাগত জানালেন, যেন আমরা তাঁর সদ্য আগত ছাত্র। বৃথা সময় নষ্ট না করে, বলতে গেলে আমাদের হাত ধরে, তখন তিনি যে তিন ক্ষেত্রে গবেষণায় লিপ্ত, তার কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, এই তিনটি বিষয়ই তাঁকে সারা জীবন ভাবিয়েছে। একটি হচ্ছে শব্দবিজ্ঞান ও আমাদের দেশের চিরাচরিত বাদ্য-যন্ত্রগুলি, বিশেষত তবলা ও ঘাটবাঁধা তারের বাদ্যযন্ত্রগুলি, যেগুলি আঙুলে তারের মেজরাপ বেঁধে বাজাতে হয়। সংক্ষেপে বললেন, তবলার চামড়ার উপর গোল কালো তাপ্পিগুলি কীভাবে পর্দার পর পর্দা লাগানোর ফলে বিচিত্র স্বর-লহরী ও ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়। তারের বাজনাগুলি সম্বন্ধে বললেন, তারগুলি বাজনার হাঁড়ির উপর উঁচু করে ঘাটের উপর দিয়ে বাঁধা থাকার ফলে তারের থেকেও আঙুলের টানে যৌগিক ও জটিল স্বরলহরী ওঠে। দ্বিতীয় বিষয়, আলোর সম্বন্ধে তিনি বললেন হীরে ও মুক্তো নিয়ে তাঁর বহুদিনের উৎসাহ। নিজের মনে অনেকক্ষণ ধরে বলে গেলেন, স্বাভাবিক মুক্তোর উপর দিনের পর দিন একের পর এক শুক্তির লালার পর্দা পড়ে পড়ে মুক্তোর দ্যুতির চমক বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় বিষয়ে বললেন, পাতা ও ফুলে কিভাবে রং ধরে, জৌলুষ বাড়ে। এ পর্যন্ত ও পরে যে-সব মহান নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের সকলেরই চরিত্রে ও ব্যবহারে একটি বিশেষ গুণ দেখেছি : এমনভাবে কথা বলেন, যেন সমানে সমানে কথা বলছেন, গলা উঁচু করে অনুগ্রহ করে কথা বলছেন বা আপনার বুদ্ধির অনুমান করে সহজ করে জটিল সূত্র বোঝাচ্ছেন, তা মোটেই নয়। উল্টে এমনভাবে বলবেন, যেন তিনি ও আমরা একই সমস্যা বহুবছর ধরে একই সঙ্গে ভাবছি। ঘণ্টা দেড়েক তাঁর কাছে ছিলুম, এমনভাবে কথা বললেন যেন আমরাই তাঁর একমাত্র শ্রোতা, অন্য কোন কাজের তাড়া তাঁর নেই। অথচ ঠিক জানি, আমাদের প্রস্থানমাত্র তিনি নিজের বৈজ্ঞানিক সমস্যায় ডুবে যাবেন।

আঠারো শতকের শেষে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেফার্সন যখন নিজের

বাড়ি শার্লট্‌সভিলে বসে একা একা খেতেন, তখন কি হত জানি না, তাঁর সমসাময়িকরা লিখেছেন তিনি ছিলেন একাই একশ' প্রতিভা। তাঁর বাড়িতে তাঁর আবিষ্কার ইত্যাদি দেখে বিস্মিত হতে হয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পেলে নিশ্চয়ই ধন্যবোধ করতুম। তবে, বাঙ্গালোরে দুইদিনে, পর পর তিনজন পর্বতের মাপের ব্যক্তিকে দেখে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে, মনে হল যেন সাত ফুট লম্বা হয়ে গেছি।

উত্তরপ্রদেশ : ১৯৫৩

কলকাতায় ফিরে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই দে সাহেব আমাকে উত্তরপ্রদেশ ঘুরে আসতে বললেন। যে-সব জেলা প্রবাদক্রমে গরীব ও অনুন্নত বলে বিদিত, বহুকাল ধরে কলকাতা শিল্পাঞ্চলে দলে দলে অশিক্ষিত লোককে জীবিকার আশায় কলকাতা শিল্পাঞ্চলে পাঠায়, সেইসব জেলাগুলি বেছে নিলুম : মির্জাপুর, আজমগড়, বালিয়া। গেলুম সবথেকে অসহ্য গরমকালে, মে মাসে, যখন তাপ ওঠে সাধারণত ৪৫ ডিগ্রিতে। ইচ্ছা ছিল নিজেকে পরখ করে দেখি, মুন্সীগঞ্জে দশবছর আগে শরীর যত শক্ত ছিল তার কতখানি এখনও আছে।

তিনটি জেলাতেই একে একে গেলুম। অনেক কিছু স্থানে স্থায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, যেমন : গ্রামের মধ্যে ও গ্রামান্তরে যাতায়াতের রাস্তা; পানীয় জলের কূয়া; সেচের জন্য চওড়া লম্বা লম্বা খাল; এবং তখনকার কালে যা ছিল একান্ত নতুন প্রচেষ্টা—প্রতি গ্রামের পোড়ো জমিতে গ্রামবাসীর জন্য জ্বালানী কাঠ সরবরাহকল্পে ছোট ছোট এজমালি বন। সেই বনে আবার বেশ কিছু বাবুল বা কিক্কর গাছও বোনা হয়, যাতে, বড় হলে, তার কাঠে গরুরগাড়ির চাকা হবে, উপরন্তু উটদের খাদ্য হিসাবে কাঁটা ও ফল হবে। এই জেলাগুলির অনেক জমি ক্ষারের দাপটে প্রায় চাষের অযোগ্য হত। প্রতিবছর মাটির তলা থেকে জলের সঙ্গে ক্ষার উঠে জমি সাদা হয়ে যেত। আঠারো-উনিশ শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জমি চেঁচে চেঁচে ক্ষার তুলে বারুদ তৈরির জন্য নিজের দেশে ও অন্যত্র চালান দিত। তার সঙ্গে আশেপাশে, বিশেষত মির্জাপুরে, হত বহুল পরিমাণে আফিমের চাষ। সেই আফিম চীনে রপ্তানি করে যুদ্ধ বাধিয়ে ইংরেজরা চীনাদের গলাধঃকরণ করাত। আফিম বিক্রিলব্ধ সোনারুপা, ভারতের পথে ইংলণ্ডে গিয়ে জমা হত। স্থানীয় বাসিন্দারা বললেন বড় বড় খালি জমি

বেড়া দিয়ে ঘিরে দলে দলে ছাগল-ভেড়া পুরে রাখলে তাদের বিষ্ঠা জমে ক্ষা, জমি উর্বর হয়। যে-সব জমিতে ক্ষার লবণ উঠে রোদে চকচক করত, সেগুলি ছাগল-ভেড়ার বিষ্ঠার সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জমির উর্বরতা আসত।

এইসব জেলা ঘুরে বক্সী-কা-তালাও গেলুম। এটি ছিল উত্তরপ্রদেশের পদস্থ কর্মচারিদের প্রধান সি-ডি-পি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। অবশেষে গেলুম লক্ষ্ণৌ, সেখানে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে প্রথম দেখলুম। লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লীর পথে তেরাইতে দেখলুম কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসন হাত মিলিয়ে কি অসাধ্যসাধন করেছে। উত্তরপ্রদেশের প্রকল্পগুলি সত্যিই খুব বিস্ময়কর, বিশেষত পূর্ত কাজগুলি। প্রতি প্রকল্পের কাজ ছিল চিরস্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলা। গর্ত খুঁড়ে সেটি বুজিয়ে টাকা খরচ করা নয়। মনে হল, স্বহস্তে কাজ করে, সে কাজ দেখিয়ে কর্মিরা আনন্দ পান। জীপগাড়ি কমই দেখলুম, সাইকেলই বেশী। কারোরই যেন প্রচণ্ড রোদকে তোয়াক্কা নেই। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার আগ্রহে আমিও ঐ নিদারুণ গ্রীষ্মে ঘুরে-ফিরে বেড়াবার উৎসাহ পেলুম।

দিল্লী : ১৯৫৩

দে সাহেব আমাকে দিল্লীতেও কিছু কাজ দিয়েছিলেন। সেখানে দিন দুয়েক ছিলুম। ১৯৪৪ সালে কার্সিয়ঙে যখন ছিলুম, গ্ল্যান ডেভিস ও তাঁর স্ত্রী সুজাতা মাসাধিককাল আমাদের অতিথি ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তাঁরা তুঘলক রোডে থাকতেন, গ্ল্যান ইউ-নি-সেফ-এ কাজ পেয়েছিলেন। সুজাতা তখন সমাজসেবার কাজে মগ্ন। পৌঁছনোর পরের দিন সকালে ওঁদের বাড়িতে ব্রেকফাস্ট খেতে বলেন। ওঁর বাড়িতে যখন গেলুম, বললেন অল্পক্ষণের জন্য জরুরি কাজে যাচ্ছেন, এখনই ফিরে আসবেন। কোন এক মিসেস সেনকেও ব্রেকফাস্টে বলেছেন, তিনিও আসবেন। তিনি এলে পরে গল্প করে একটু আটকিয়ে রাখতে, যতক্ষণ না সুজাতা ফেরেন। সাতদিনের বেশী দিনরাত ধুলোকাদায় মফঃস্বলে ঘুরে আমার জামাকাপড়ের অবস্থা ভদ্রসমাজে দেখাবার মত ছিল না। সুতরাং আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি, যখন মিসেস সেন এসে আমাকে সুজাতার দপ্তরের নগণ্য কেরানি বলে ধরে নিলেন। গলার স্বরেও তাঁর অনুরূপ দূরত্ব প্রকাশ পেল। কয়েক মিনিট লাগল জিজ্ঞেস করতে আমি কোথায় থাকি। কলকাতায় বলাতে, মুখটি বিষণ্ণ হয়ে গেল, বললেন, কি দুঃখের কথা, কলকাতা যেন দিনে দিনে আরো

গরীব হয়ে যাচ্ছে। বললেন, দু'পক্ষেরই চেনা কোন লোককে যদি কখনও জিজ্ঞেস করেছেন থিয়েটার রোডের অমুক নম্বর বাড়ির তাঁরা কেমন আছেন, খুব সম্ভবত উত্তর পাবেন, তাঁরা সেখানকার বাড়ি বিক্রি করে হয় টালিগঞ্জ না হয় বেলেঘাটায় চলে গেছেন। বুঝলুম এ-সব অঞ্চল তাঁর ভূগোলে স্থান পাবার মত নয়। 'আপনি কলকাতার কোথায় থাকেন?' মুখ থেকে, চিন্তা করার আগেই, তাঁর কথার সূত্রে বেরিয়ে গেল, 'বেলেঘাটা'। ফলে, তাঁর গলার স্বরে দূরত্ব বাড়ল। আবার কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর চুপচাপের পর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় কাজ করেন?' জানতুম, পরে সুজাতার কাছে জানতে পারবেন, অথচ একটা মিথ্যা কথার পর আরেকটা আপনিই আসে; নিজেকে সামলিয়ে বললুম, 'পশ্চিমবঙ্গের ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনারের অফিসে।' 'ওঃ, আপনি মিস্টার দে'র আণ্ডারে কাজ করেন? আমাদের বিশেষ বন্ধু। আপনি তাঁকে কী রকম জানেন?' আমি আরো একটু সম্ভ্রম দেখিয়ে বললুম, 'তিনি আমাদের বড় সাহেব, সব থেকে উপরে, মাঝে মধ্যে দূর থেকে তাঁকে দেখি, এই পর্যন্ত।' শুনে মনে হল, মনে মনে উনি আমাকে যা ভেবেছিলেন আমি তাই, ফলে তাঁকে একটু খুশী দেখাল। আমি একাধারে আমার সামাজিক স্থানটি কিছুটা উঁচুতে তোলার চেষ্টায়, কিছুটা কলকাতার সপক্ষে বলার জন্য, বললুম, এখনও কিন্তু কলকাতার খাবার জায়গাগুলি, চা-কফির জায়গাগুলিও বেশ উঁচু মান রেখেছে বলা যায়। 'এখনও ফ্লুরীতে আপনি সত্যিকারের ভাল এক পট কফি, তার সঙ্গে ছোট এক জগ আসল ঘন ক্রীম, এবং আরেক মগ দুধ পাবেন। চিনি তো যথেষ্ট পাবেনই। আমরা তো যখনই যাই, অর্ধেকটা ক্রীম প্লেটে ঢেলে চিনি মিশিয়ে প্রথমে খেয়ে নিই, তারপর যা ক্রীম থাকে সেটি দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পুরো দু'কাপ কফি সুন্দর হয়। তাতে পুরো খাওয়া হয়ে যায় বলতে পারেন। আর ভেবে দেখুন, সব মিলিয়ে দাম মাত্র এক টাকা। তার উপরে যদি দু'আনা বকশিষ দেন তাহলে তো কথাই নেই।' ভাবলুম, এক টাকার উপর দু'আনা বকশিষ শুনে সমাজে আমার স্থান সম্বন্ধে ওঁর ভাল ধারণা হবে। ও মা, উল্টে সেই যে মুখে তালা দিলেন, আর খুললেন না। ওঠার জন্য নড়ে বসে শূন্যে কথাটা ছুঁড়ে বললেন, 'সুজাতার দেখছি আসতে দেরি হবে, আমি আর থাকতে পারব না', বলে, আমার দিকে না তাকিয়ে, নমস্কারও না করে, চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুজাতা এসে দেরির জন্য বারবার মাপ চেয়ে মিসেস সেনের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললুম মিসেস সেন আর থাকতে পারলেন না। আমাদের

কথাবার্তার কথা আর বলিনি। কয়েকমাস পরে কলকাতায় এসে সুজাতা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে নিয়ে আমি ঐরকম ঠাট্টা করার জন্য আমাকে এই মারেন তো এই মারেন। সুজাতাকে বললুম ১৯৪৪ সালে তাঁর সঙ্গে যখন আলাপ হয় তার থেকে ১৯৫৩ সালে তিনি সমাজে অনেকদূর ভ্রমণ করেছেন স্পষ্ট বোঝা গেল। শুনে আরো ক্ষেপে গেলেন।

কলকাতায় ফিরতিপথে সনৎ আর তার স্ত্রী একই ট্রেনে ফিরলেন। আগেই লিখেছি, ১৯৫১ সালে বিশ্বেশ্বর চ্যাটার্জির প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়। ইতিমধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে যে তাঁকে তাঁর ডাকনাম মেম-সাহেব ধরে ডাকা শুরু করি। নতুন দিল্লীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসের পরীক্ষায় পাস করে, সেই চাকরিতে তিনি সদ্য ঢুকেছেন, ফলে ট্রেনে দেখলুম আত্মবিশ্বাসে ও সাফল্যে উজ্জ্বল ভাব। চাঁদনি চকের খুব ভাল মিষ্টি কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার থেকে আমাকে খেতে দিলেন।

হায়দ্রাবাদ ১৯৫৪

দে সাহেবের অনুগ্রহে ১৯৫৩ সাল ছিল আমার ভারতবর্ষে ঘোরার বছর। ১৯৫৪ সালেও আমার অনুরূপ ভাগ্য হয়। পরে, অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে যখন কলকাতা ছেড়ে বর্ধমানে যাই তখন মনে হয় সম্ভবত দে সাহেব মনে করতেন আমি কলকাতায় যত কম থাকি ততই তাঁর পক্ষে শান্তি। কারণ, আমি দূরে থাকলে তাঁর নানা ধরনের উন্নতিমূলক বৈঠকে বাকবিতণ্ডা কম হত। আমি থাকলেই এইসব বৈঠকে দৃষ্টিভঙ্গী, কার্যপদ্ধতি, আগে, পরে, এবং কাজের হিসাবনিকাশ নিয়ে মতদ্বৈধ হত।

১৯৫৩ শুরু হয় ওড়িষ্যাক্রমণ নিয়ে। তারপর আসে উটকামণ্ড, উত্তরপ্রদেশ। ১৯৫৩-র শেষে ডিসেম্বরে সি-ডি-পির কাজ দেখার সুযোগ হল হায়দ্রাবাদে গিয়ে মহবুবনগর ও ওয়ারাঙ্গল দেখার। দুটিই তেলেঙ্গানা অঞ্চলে। হায়দ্রাবাদের উন্নয়ন কমিশনার জহির আহমদ জীবন শুরু করেন হায়দ্রাবাদে নিজামের অধীনে সিভিল সার্ভিসে। পরে যখন হায়দ্রাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন তাঁকে আই-এ-এসে নেয়া হয়। বয়সে ও কাজে তিনি প্রায় দে সাহেবের সমসাময়িক। হায়দ্রাবাদের সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষাও হয়, অতএব অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও সভ্যলোক, যেমন ভদ্র তেমন উচ্চমনা।

উপলক্ষ্য হল, ১৯৫৩-র ডিসেম্বরে হায়দ্রাবাদে একটি কন্‌ফারেন্সের আয়োজন। ১৯৫৩-র প্রথমে লেডী রামরাও তাঁর স্বামী, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তদানীন্তন গভর্নর, বি-এন রামরাও-এর সঙ্গে কলকাতায় আসেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সি-ডি-পি কর্ম-স্থচিতে পরিবার-পরিকল্পনার ধারা সমাজশিক্ষার অঙ্গ করতে হবে। স্যার বেনেগাল ছিলেন বেঁটেখাটো, গোলগাল নম্রস্বভাব। লেডী রামরাও ছিলেন দীর্ঘকায়া, রানীর মত হাবভাব, চালচলন। আমরা ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতুম, স্ত্রী নিশ্চয় স্বামীর মধ্যে হীনম্মন্যতা ঢুকিয়ে দিতেন।

হায়দ্রাবাদের কেন্দ্রস্থলে বিরাট, স্থদর্শন, হোসেনী সাগরের দক্ষিণপ্রান্তে একটি একানে পাহাড়ের উপর ছিল নীলোফর প্রাসাদ। রাজবধূ নীলোফর ছিলেন নিজামের পুত্রবধূ, ঈরাণ রাজবংশের। ভারত সরকার হায়দ্রাবাদ সামিল করার পর নীলোফর প্রাসাদটি একটি অতিথিশালায় পরিণত হয়। কয়দিন ধরে আমরা হায়দ্রাবাদে নীলোফর প্রাসাদে রাজকীয় ব্যসন ও উৎকৃষ্ট নিজামী রান্না ভোগ করলুম। সারাভারত থেকে অনেক ধনী, রূপসী ও স্বনামধন্যা মহিলা এসেছিলেন। আভা সঙ্গে ছিল, স্থতরাং নজরবন্দী ছিলুম। জহির আহমদ নিবেদিতপ্রাণ অক্লান্ত কর্মী। আশ্চর্য হয়ে গেলুম, অত অল্পসময়ে তিনি অত কাজ কী করে সম্পন্ন করালেন। একটি পুরো দিন আমরা মহবুবনগরে কাটালুম, এবং ওয়ারাঙ্গলে দেড় দিন। রামাপ্পায় ভারতের কাকটীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য পরিণতির শীর্ষে ওঠে। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, যখন দেখলুম রামাপ্পা মন্দিরের নারীভাস্কর্যের গড়ন, রেখা, ছন্দ ও মুখশ্রীর সঙ্গে স্থানীয় মাঠে কাজকরা মেয়েদের আশ্চর্য মিল। তেমনি লম্বা, স্থঠাম, অনিন্দ্যগড়ন, আশ্চর্য মাপের দীঘল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পরনে ঝলমলে সবুজ রঙের শাড়িতে সিঁদুর রঙের পাড়, ধানজমিতে সারি দিয়ে নিড়েন দিচ্ছে। ফলে মনে হয় যেন লাল পপি আর বিলেতী ড্যাফোডিল বা ক্রকাসের সারি মুক্ত মাঠে বাতাসের দোলায় এদিক-ওদিক দুলছে। সারা দৃশ্য যেন নন্দনকানন, অপলকদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

এই সফরেই আমরা অজন্তা ও এলোরা দেখতে গেলুম। প্রাচীরচিত্র ও ভাস্কর্য মিলে যে অপার ঐশ্বর্য দেখলুম, তার থেকেও বেশী বিস্ময় হল পর্বত প্রমাণ একটি আস্ত গ্রাণিট পাথর থেকে কুঁদে, পর্দার পর পর্দা পাথর চেঁচে ফেলে কী করে এই অপূর্ব বিস্ময়কর কৈলাস মন্দিরটি স্থপতি ও ভাস্কর্যের হাতুড়ি-বাটালির ঘায়ে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ ও নিখুঁতভাবে বেরিয়ে এল, প্রতিটি ভাগ, প্রতিটি গুহা, ঘর, ভাস্কর্য। মন্দিরের মহান গৌরব ও সৌকর্য দেখে বাকস্ফুরণ হয় না, শ্বাসরোধ হয়।

পাথর সম্বন্ধে তখনকার দিনের ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের জ্ঞান ও বাস্তুশিল্পীর বিচার-বুদ্ধির কথাও ভেবে স্তম্ভিত হতে হয়। আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে মন্দির খোদাই শুরু করার আগে কত শত শত গর্ত করে বড় বড় তুরপুণ ঢুকিয়ে পাথরের নমুনা বের করে পরীক্ষা করতে হয়েছে, পাথরে কোন ফাটা বা চটান বা আল্‌গা গুঁড়ো-পাথর আছে কিনা, যার দোষে মন্দিরনির্মাণের কাজ অর্ধপথে পরিত্যাগ করতে হয়। এক হিসাবে এলোরা হল হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গুহা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের, তাদের মূর্তিসাধনা ও নন্দনতত্ত্বের সঙ্গম ও তীর্থস্থল। উপরন্তু অতগুলি ধারা মিশেছে পৃথিবীর এক আশ্চর্য, আস্ত স্বাভাবিক পর্বতখণ্ডের উপর মানুষের হাতের কারুকার্যে। আমার মতে এলোরা পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী অষ্টম আশ্চর্য হিসাবে অনায়াসে অভিহিত হতে পারে। কাজ শুরু হবার আগে সবকিছু খুঁটিনাটির আগাম পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিন্তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে তার স্থান মানুষের কীর্তির ইতি-হাসে প্রায় সর্বোচ্চ। নির্মাণ শুরু হবার বহু আগেই নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় কোন্‌খানে কোন্‌ স্থাপত্য, কোন্‌ ভাস্কর্যটি সবথেকে সমন্বয়মণ্ডিত হবে, এবং তিন-ধর্মের সমন্বয়ে ও সহাবস্থানে কিভাবে সাহায্য করবে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলব, সেই বছর, অর্থাৎ ১৯৫৩-র প্রথমে ভুবনেশ্বর ও কোণারক দেখে আমার গভীরে অনুরণনের দোলায় বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় উল্লাস ও এক্‌স্ট্যাসির যে স্বাদ পেয়েছিলুম, কোণারক ও ভুবনেশ্বরে যে নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলার স্বাদ পেয়েছিলুম, অজন্তা ও এলোরার অতুল ঐশ্বর্য সত্ত্বেও সে স্বাদ পাইনি। তবে অজন্তা ও এলোরায় পূজা ও মানুষের ঐশী শক্তির প্রতি সম্ভ্রম নিশ্চয় এসেছিল।

ত্রিপুরা ১৯৫৪

১৯৫৪-র এপ্রিলের শেষে আমি ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে জিরানিয়া সি-ডি-পি ব্লক দেখতে যাই। এই সফরটি আমার মনে এখনও গেঁথে আছে। আর-বি ভাগাইওলা আমাকে ব্লকটি দেখতে যেতে অনুরোধ করেন, বলেন সেখানে গেলে দেখতে পাব শিক্ষায় স্বনির্ভরতা কাকে বলে। দে সাহেব সম্মতি দিলেন। ত্রিপুরার চীফ কমিশনার ভি নানজাপ্পাকে লেখায় তিনি সাদরে আহ্বান করলেন। নানজাপ্পা ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের আই-সি-এস। সেখানে ১৯৫২-৫৩ সালে নির্মম হাতে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ দমন করেন। জিরানিয়ার অল্পবয়স্ক প্রোজেক্ট অফিসারের নাম ছিল আর চক্রবর্তী। তাঁর সমাজশিক্ষা সংগঠকের নাম ছিল শোভা বসু।

দুজন এসে আমাকে আগরতলা থেকে নিয়ে গেলেন। নানজাপ্পার একটু ভয় ছিল পাছে কম্যুনিস্টরা আমাকে অপহরণ করে, তবে শোভা বসুকে দেখে তাঁর ভয় চলে গেল।

জিরানিয়ায় কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীদশরথ দেববর্মণ আমাকে স্বাগত জানালেন। সেদিন দুপুরে খাবার সময়ে চক্রবর্তী ও শোভা বসুর কর্তব্যে আত্মনিবেদন ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে একাত্মভাব দেখে মুগ্ধ হলুম, উপরন্তু প্রতিটি কাজের বর্তমান অবস্থা যেন তাঁদের নখদর্পণে। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব ত্রিপুরার পাহাড়াঞ্চল মাত্রেই ঝুমচাষ হত। অর্থাৎ শীতকালের শেষে পাহাড়ের গায়ের ঢালে শুকনো ঝোপঝাড়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে যে ছাই হত, সেই ছাই হত ক্ষেতের সার। ছাইঢাকা জমি কোদাল দিয়ে কোনরকমে এবড়োখেবড়ো ভাবে কুপিয়ে, বীজ ছিটিয়ে দিত। প্রকৃতির নিয়মে বর্ষাকালে আপনাআপনি যে ফসল হত, সেই হত যথেষ্ট। পাহাড়ের গা সিঁড়ির মত ধাপ ধাপ করে কেটে, প্রতি ধাপে মাটির বাঁধ বেঁধে জল ধরে চাষের নীতি তখনও বিশেষ এগোয়নি। সারা পূর্বভারতে কেবল দার্জিলিঙ জেলার গুর্খারা ও এখনকার নাগাল্যাণ্ড রাজ্যে আঙ্গামী উপজাতিরাই শুধু এভাবে চাষ করত। অন্যত্র চাষের ধারা ঝুমচাষের মত আদিম পর্যায়ে ছিল বলা যায়। সেই অনুপাতে স্বনির্ভরনীতিতে স্কুল তৈরি, পড়াশোনা ও সমাজউন্নয়ন শিক্ষার বহর দেখে আমি আশ্চর্য হলুম। গ্রামবাসীর দান করা একটুকরো জমির উপর গ্রামবাসীরা শ্রমদান ও বাড়ি তৈরির সব উপকরণ, যথা, মাটি, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি দান করে, তার থেকে সব বাড়ি তৈরির জিনিস তৈরি করে একটি বড় স্কুলঘর, তথা সমাজশিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করে। দেয়ালগুলি বাঁশের দরমার, মেঝে হত তিন ফুট উঁচু গাছের গুঁড়ি পুতে ঠিকমত সাজিয়ে, তার উপর তক্তা বিছিয়ে, ঘরের ছাত হত মুলিবাঁশের কাঠামোর উপর পাতা, ঘাস ও খড়ের চাল দিয়ে। মেঝের নিচেটি থাকত ফাঁকা।

প্রতি অপরাহ্নে দেখতুম গ্রামের সমস্ত অধিবাসী বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ হিসাবে চারটি দল বেঁধে সমাজ কেন্দ্রে এসে জড়ো হত। প্রতি দলের নেতার হাতে থাকত একটি লণ্ঠন। প্রত্যেকের হাতে বই আর স্লেট। ঘরে ঢুকে চারদিকের চার কোণে চারটি দলের চারটি ক্লাস বসত। শোভা বসু দুটি শিক্ষিত যুবা ও দুটি শিক্ষিতা যুবতীকে শিখিয়ে পড়িয়ে অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে তৈরি করেছিলেন। তাঁরা পড়া, লেখা ও অঙ্ক এই তিন বিষয়ে মোট দু'ঘণ্টার ক্লাস নিতেন। প্রতি কোণে থাকত একটি ব্ল্যাকবোর্ড।

দু'ঘণ্টা ক্লাসের পর শোভা চারটি দলকে একত্র করে স্থানীয় ভাষায় আধঘণ্টা ধরে লেকচার দিতেন, কী করে শরীর, ঘরবাড়ি ও গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, স্বাস্থ্যের মোটা নিয়মগুলি পালন করতে হয়, শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের কী কী জিনিস কোন সময়ে কীভাবে খাওয়াতে হয়। যে-সব মেয়েদের কোলে স্তন্যপায়ী শিশু তাদের কী কী করা উচিত। বাচ্চাদের সাধারণ অসুখ কিভাবে টোটকা ওষুধ দিয়ে সারাতে হয়। সব শেষে সবাই মিলে হত আধঘণ্টা ধরে গান আর নাচ, তারপরে তারা হৈ হল্লা করতে করতে যেমন এসেছিল তেমনি সুষ্ঠুভাবে দলে দলে যে যার ঘরে ফিরে যেত। তিন দিনে তিনটি দূরে কাছের গ্রামে গিয়ে একই দৃশ্য দেখলুম। মনে খুব দাগ কাটল। এই অভিজ্ঞতাই আমি পরে ১৯৫৫ সালে আসানসোলের একটি ছেলেমেয়ে ও বয়স্থা স্বামীহীন মহিলাদের ক্যাম্পে পুনরাবৃত্তি করে কিছুটা সফল হই। সে বিষয়ে যথাস্থানে বলব।

যে রাজ্যের যেখানেই গেছি, বা দেখেছি বা শুনেছি তার বিশদ বিবরণ লিখে, সেই অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, কেন হচ্ছে না, কিভাবে হতে পারে, কোথায় আমাদের গলদ রয়েছে, কিভাবে তার সংশোধন হতে পারে, কোথায় আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি এবং অন্য রাজ্য যাচ্ছে না, সব লিখে শেষে প্রস্তাব করতুম আমাদের রাজ্যে কি কি অদলবদল বাঞ্ছনীয়, কোন ধারাটির গতি ত্বরান্বিত করা উচিত। নোটগুলি টাইপ ও সাইক্লোস্টাইল করিয়ে, দায়িত্বপদে আসীন সব অফিসারদের পাঠাতুম, তার সঙ্গে প্রতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষদের। তারই সঙ্গে কমিশনারের ঘরোয়া মিটিং-এ প্রসঙ্গগুলি আলোচনার জন্য পেশ করতুম। তখনও আমি নিজের উৎসাহের চোটে বুঝতে পারিনি, দে সাহেব আমার এই ধরনের কাজ তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসাবে কল্পনা করছেন বা মনে মনে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভাবছেন। সুখময়, মুকুল, সুকুমার প্রভৃতিরা পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়ার বিষয়ে বিচলিত বোধ করলে, তাদের বিচলিত ভাব দেখে দে সাহেব ভাবতেন আমি তাদের তাঁর প্রতি আনুগত্য নষ্ট করছি। সব কিছু মিলিয়ে সকলে এক মানসিক সঙ্কটের পথে যাচ্ছিলুম।

ঝড় ঘনিয়ে ওঠা

অন্যদিকে আমার মনে হল, বিধানসভা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন ও ক্ষমতার বিন্যাস কীভাবে নিঃশব্দে দ্রুত বদলে গেছে ও যাচ্ছে তার নিহিতার্থ কে

সাহেব সম্যকভাবে ধরতে পারেননি। যদি কেউ প্রাক্‌-১৯৪৭ মন্ত্রীসভাগুলির গঠন বিশ্লেষণ করেন, এমন-কি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনেও যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তার পরীক্ষা করেন, তাহলে সে-সব নির্বাচনে জমিদারশ্রেণী কত বেশী আসন দখল করতেন লক্ষ্য না করে উপায় থাকে না। এইসব জমিদারদের খেতাব সাধারণত হত মহারাজা, নবাব, রাজা বা রায়বাহাদুর ইত্যাদি। এই অবস্থায় বোঝা শক্ত নয়; নির্বাচন অঞ্চলগুলি এমনভাবে নির্ধারিত হত এবং ভোটাধিকারে এমন সব শর্ত থাকত যার ফলে ভোটদাতাদের উপর জমিদারদের আধিপত্য মোটামুটি অটুট থাকত। ১৯৫০-এর সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষ, সামাজিক অবস্থা নির্বিচারে প্রতি একুশ বা একুশোত্তর বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার হল। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি ও কাঠামো রাতারাতি বদলে গেল। ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে রাজা-মহারাজারা পরাজয়ের ধুলোয় গড়াগড়ি খেলেন। প্রতি রাজ্যের মন্ত্রীসভায় তাঁদের সংখ্যা ঝপ করে পড়ে গেল। দেয়ালে এই লিখনের জোরেই ১৯৫০ সালে সারা দেশময় এল জমিদারী উচ্ছেদ বিল। নতুন পরিবর্তিত অবস্থার যুক্তি বুঝতে ডাঃ রায়ের বিলম্ব হয়নি।

১৯৫০-এর ৭ মে জমিদারী উচ্ছেদকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধানসভায় একটি বিল আনলেন। বিলে ৫৩টি ধারা ছিল। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতি-স্বরূপ যে-সব জমিদারি তখনও চালু ছিল, সেগুলি সরকার অধিগ্রহণ করবেন; (২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে-সব আইনের বলে মধ্যস্বত্বদের নানাবিধ অধিকার স্বীকৃত হয়, সে-সব অধিকারও সরকারে বর্তাবে; (৩) বাকি যে-সকল চাষীস্বত্ব ও নিম্নস্বত্ব থাকবে, তাদের মধ্যে সেইসব জমি বিলি হবে যা নাকি জমিদারদের হাতে নিজের চাষের বাইরে উদ্বৃত্ত ছিল বা অন্যদেবকে বিলি করা ছিল, অথচ উপস্বত্বভোগীরা নিজে চাষ করতেন না। বিলে বলা হয় পূর্ব আইনের বলে জমিদার বা স্বত্বাধিকারীদের, আইনে নির্ধারিত জমির উপরে কোন জমির উপর কোনরূপ অধিকার আর থাকতে পারবে না। অবশ্য সরকার এইসব উদ্বৃত্ত জমির জন্য মালিকদেরকে ক্ষতিপূরণ দেবেন। এই আইনের নিহিত অর্থ অবশ্য ছিল স্পষ্ট। রাজনৈতিক নির্বাচনের খেলায় প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের সংখ্যার তুলনায় জমিদার ও উপস্বত্বভোগীদের মাথাগুণতি সংখ্যা এতই স্বল্প ছিল যে এই শ্রেণীকে উপেক্ষা করলে কোন ক্ষতি হবে না।

যে-সব ধারার অধীনে নির্দিষ্ট এক অঙ্কের জমি আগের জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধি-কারীদের দখলে খাস চাষে রাখতে দেয়া হল, এবং রাজ্যের নথিতে প্রজা বলে

তাদের স্বত্ব সরাসরি স্বীকৃত হল, সেইসব ধারার বলে এক কলমের খোঁচায় রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সর্বত্র প্রসারিত হল। এই গোষ্ঠীর ভিত্তি প্রসারিত হল আরেকটি উপায়ে। নির্দিষ্ট অঙ্কের জমির উপরে যে-টুকু বাড়তি জমি হাতে থেকে গেল, তার অনেকাংশ জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা আপন আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিলি বা পত্তন করে স্ব-স্ব প্রভাব বা কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করলেন। এমন-কি আত্মীয় না পেলেও আপন গরু-ছাগলের বেনামিতে অনেক উদ্বৃত্ত জমি তাঁরা ঝুটো কবলা তৈরি করে অথবা অর্থ বা সম্পত্তির বিনিময়ে নতুন স্বত্বাধিকারিদের হাতে হস্তান্তর করলেন। বিল প্রকাশ ও সেই আইন বলবৎ করার মধ্যে বিস্তর সময় রাখা হল, যার কল্যাণে এইসব ঝুটো বিক্রি বা হস্তান্তরের পথ সুগম হয়। এই নতুন আইনের বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃপায় যত সংখ্যায় মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা ও ব্যাপ্তি সহসা অনেকগুণ বেড়ে গেল। রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে ওঠা এই মধ্যবিত্তশ্রেণী পেল, জমি, গুদামে ফসল সংরক্ষণ ও ভাল দামে বিক্রয়ব্যবস্থা সূত্রে, আরো বেশী রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। এর উপর অপ্রত্যাশিত হারে ক্ষতিপূরণের অর্থে তাদের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

আগেকার জমিদারশ্রেণী ও নতুন মধ্যস্বত্বাধিকারীদের আনুগত্যলাভের আশায় সরকার জমির পরিমাণ ও গুণানুসারে কমবেশী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করলেন। রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তি যথাসম্ভব বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে এই ধাপগুলির মধ্যে মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মধ্যে ক্ষতিপূরণের হারের ব্যবস্থা হল সব থেকে বেশী। তাদের ক্ষতিপূরণের হার হল বাৎসরিক আয়ের পনেরো গুণ ; বড় জমিদারদের ক্ষেত্রে, সে তুলনায়, মাত্র চার গুণ। সরকার চারটি নীতি জারি করলেন : (১) যাবতীয় চাষের জমির মালিক হলেন সরকার ; (২) খাজনা আদায় করা অন্তর্বর্তী ভূমিস্বত্বভোগী বলে কোন শ্রেণী থাকবে না ; (৩) খাজনা দিয়ে খোদ সরকারের অধীনে কিছু কিছু জমি ও কিছু কিছু প্রজা থাকবে ; (৪) শেষোক্ত, অর্থাৎ ৩নং নীতির বলে যে-সব প্রজা হবে তাদের জন্য একটি নতুন বিল হবে ; তার নাম হবে ভূমিসংস্কার বিল ; সেই আইনের বলে যে-সব জমি সরকারের মালিকানায় যাবে তা নির্দিষ্ট হারে ভূমিহীন চাষীমজুরদের মধ্যে বিলি করা যেতে পারবে।

পরম দুঃখের বিষয়, এইভাবে পুষ্ট ও সংখ্যাস্ফীত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী আচমকা এত অর্থের মালিক হয়েও সে অর্থের সদ্ব্যবহার করে উপযুক্ত আয়বৃদ্ধি অথবা নতুন শিল্পোদ্যোগের প্রতি মন দিলেন না। অন্যান্য রাজ্যে, যেমন অন্ধ্রে,

তামিলনাড়ুতে, ওড়িষ্যায় এমন-কি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারেও এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নতুন নতুন শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, এমন-কি উন্নত চাষে তাঁদের সঞ্চলব্ধ ঐশ্বর্য নিয়োগ করলেন।

এই আইনের বলে ১৯৫২ সালে কংগ্রেসের একচেটিয়া প্রতিপত্তি ও আধিপত্য আরো দৃঢ় হল। উপরন্তু আরেকটি সংশ্লিষ্ট আইনের বলে চাষের স্বত্বভোগী ও তাদের নিচে আরেকটি নিম্নস্বত্বভোগী চাষী শ্রেণী সৃষ্টি করে কংগ্রেস আপন ক্ষমতা ও আধিপত্য দৃঢ়তর করার জন্য চেষ্টিত হল। তাঁরা বললেন, চাষস্বত্বভোগীর অধীনে নিম্নতর স্বত্বভোগীর স্বত্ব আইন পরে স্বীকার করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে নতুন স্বত্বগুলি সুদৃঢ় করে, আনুগত্যের পরিধি আরো বিস্তৃত ও সংবদ্ধ করে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার ও শক্তি সুদৃঢ় করা যেতে পারে। মজার কথা হল, এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সরকারপক্ষ দেখলেন, এই নীতি অনুসরণ শুধু যে তাঁদের কংগ্রেস পার্টি তা নয়; বিরোধী কম্যুনিস্ট পার্টির অধিকাংশ সভ্যই যেহেতু এই নতুন বিস্তৃত মধ্য-স্বত্বশ্রেণীভুক্ত, তাঁরাও এই নীতিতে নিষ্ক্রিয় সমর্থন জানালেন।

সমাজ উন্নয়নে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের সমুখে ছিল কয়েকটি তথ্য ও সংখ্যা-তত্ত্বের অকাট্য যুক্তি। নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর জনসংখ্যা পশ্চিমবাংলার সমস্ত গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা বিশ ভাগের বেশী হবে না, অথচ তাঁরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণীর চাষ জমির শতকরা ৮৮ ভাগের মালিক। এই সংখ্যা ও শ্রেণীই হবে এখন মালিক চাষী, তাঁদের অধীনে থাকবে ভাগচাষী ও ভূমিহীন চাষীমজুর। যদি ধরা যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার আরো শতকরা ত্রিশভাগ ক্ষুদ্রশিল্প, গো-পালন, পশুপক্ষী-পালন, খুচরা ব্যবসা, হস্তশিল্প, পরিবহন বা মজুরী কাজে লিপ্ত আছে, তা সত্ত্বেও গ্রামীণ জনসংখ্যার বাকি পঞ্চাশ শতাংশ হবে জমিহীন ভাগচাষী অথবা জমিহীন চাষীমজুর। কংগ্রেসের কর্মসূচিতে মনে হল জমিদারি উচ্ছেদ আইনের বলে ভূমি-স্বত্বভোগী মালিকপিছু ৬৬ একর জমি দিয়ে বাকি যে-জমি উদ্বৃত্ত থাকবে, সে-জমি জমিহীন ভাগচাষী অথবা ভূমিহীন মজুরচাষীদের বিলি করার কোন অভিপ্রায় নেই, বরং সে-সম্ভাবনা রোধ করতে বদ্ধপরিকর।

পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট পার্টিও কংগ্রেসের এই অনীহার বিরুদ্ধে কোন সরব আপত্তি জানাল না। জমিস্বত্ব নথিতে ভাগচাষী খাতে যাতে নথিবদ্ধ হয় তার সপক্ষেও কোন সোচ্চার বা সোৎসাহ আন্দোলন চালাল না। গঙ্গানদীর দক্ষিণে পশ্চিম-বঙ্গের জেলাগুলিতে সি-পি-আই কর্মীদের মধ্যে বহু সভ্য ছিল, যাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, এই ধরনের নথিভুক্তি আন্দোলন হলে, বিশেষ আহত হত। তার কারণ এই

ধরনের নথিভুক্তি করতে গেলেই এই সত্য প্রকাশ পেত, যে তাঁদের মধ্যে অনেকেই সর্বোচ্চ সীমা, অর্থাৎ ৬৬ একর, থেকে বেশী জমি ভোগদখল করছেন। এই নথি-ভুক্তির কাজ অগ্রসর হলে তাঁদের সীমাতিরিক্ত জমি সরকার দখল করত; উপরন্তু আইনভঙ্গের অপরাধ প্রমাণহেতু আদালতে তাঁদের শাস্তি হত। তেলেঙ্গানা ও উত্তরবঙ্গে অবস্থা ভিন্ন ছিল। সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক অবস্থা ভিন্ন ছিল। অতএব সে দুই অঞ্চলে সি-পি-আইয়ের পক্ষে দু'নৌকায় পা দিয়ে চলা সম্ভব ছিল।

সে যাই হোক, সব কিছু নিয়ে দেখা গেল, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চাষজমির মোট শতকরা ছয় শতাংশের বেশী ভূমিহীন চাষী বা চাষীমজুরদের মধ্যে বিলি করার জন্য পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে আবার তার অর্ধেক, অর্থাৎ মোট জমির তিন শতাংশ ছিল যাকে বলা যায় চাষের অযোগ্য : জংলা বা জলা জমি। অতএব পশ্চিমবঙ্গের সারা কৃষক সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের মধ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গের চাষ-যোগ্য জমির মাত্র তিন শতাংশ বিলির প্রস্তাব খুব আশ্বাসজনক প্রস্তাব নয়। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনমত জনমত তাতাবার সম্ভাবনা আছে বলে, এবং দলের জনপ্রিয়তা সঞ্জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে, এবং মজুরচাষীকে আশায় রেখে নিজের দলে বেঁধে রাখার জন্য সি-পি-আই কাগজেকলমে ও মিটিং-এ ভূমিসংস্কার কার্যকরী করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে গেল। কংগ্রেস নাম-কা-ওয়াস্তে সে আন্দোলনও জিইয়ে রাখায় মন দিল না।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিব্যবস্থার অন্তর্নিহিত যুক্তি, তার সঙ্গে পার্টির অনুকূলে ভোট-দাতাদের সমর্থনক্ষেত্রের বিস্তার ঘটানোর উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রন্টের সময়ে অর্থাৎ ষাটের দশকের শেষে ও সত্তরের দশকের প্রথমে হরেকৃষ্ণ কোনার যে ব্যবস্থা নিলেন তার কল্যাণে সত্তরের দশকের শেষে ও পরে সি-পি-এম পার্টির সমর্থন কায়েম হয়ে গেল। তিনি উপরোক্ত ছয় শতাংশ জমির মধ্যে চাষের যোগ্য ও অযোগ্য মিলিয়ে মাত্র তিন লক্ষ একর জমি ভূমিহীন মজুরচাষী ও বন্ধকী মজুরের মধ্যে বিলি করলেন, সেইসঙ্গে সি-পি-এম পার্টি এই আশার উদ্রেক করলো, যে বর্গাচাষীদের স্বত্ব ও অধিকার নথিভুক্ত করা হবে—যাকে বলা হল বর্গা রেজিস্ট্রেশন আইন। তবে জন্ম থেকেই যাতে বর্গা রেজিস্ট্রেশন অর্ধমৃত অবস্থায় থাকে তারও ব্যবস্থা করা হল, যাতে ভাগচাষীরা আশায় আশায় থাকে। উপরে দেখা গেছে ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনে দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে সি-পি-আই পার্টি কোনদিনই তেভাগা বা বর্গা রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে সক্রিয় সমর্থন দেয়নি। এই মতের সমর্থন তদানীন্তন সংবাদপত্রে ও সরকারি নথিতে যথেষ্ট পাওয়া যাবে। উপরন্তু তেভাগা সমর্থনে

শহরের মসীজীবী ও মেহনতী কর্মিদের যে-ভাবে উদ্বুদ্ধ করে সে আন্দোলন জোরদার করা উচিত ছিল, সি-পি-আই এবং পরে সি-পি-এম সে উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রয়াস কোনদিন করেনি। তার একটি বড় কারণ, শহরের মেহনতী ও মসীজীবী কর্মিদের একটি বড় অংশ জমির মালিক হিসাবে গ্রামে তাঁদের জমি ভাগচাষী দিয়ে চাষ করাতেন এবং এখনও করান। ঠিক সেই স্বার্থেই আশির দশকে ১৯৮২-৮৩ সালে অপারেশন বর্গার বিরুদ্ধে জিগির তোলেন, প্রথাটি যদি চালু হয়, তবে গ্রামের ও শহরের বিধবাদের অবস্থা শোচনীয় হবে, তাঁরা মারা পড়বেন—কারণ, তাঁরা ভাগচাষের স্বত্বের উপরই নির্ভর করেন। বিধবাদের নাম করে যে লেপোরা দৈ মারে, তাদের নাম কদাচ উচ্চারিত হয় না। অন্যদিকে অবশ্য কংগ্রেস এ-বিষয়ে প্রথম থেকেই বরাবর এমন অনীহা ও বিরুদ্ধতা প্রকাশ করে—ঝোপ বুঝে ফাঁকা হুঙ্কার পর্যন্ত না করে—যার ফলে ভূমিহীন ভাগচাষী বা ভূমিহীন চাষীমজুরের আনুগত্য হারায়। এমন-কি ১৯৫৩ সালেও লোকদেখানো আস্ফালনটুকুও করেনি, যা বামদলগুলি কিছুটা জাগিয়ে রাখে।

১৯৪৬-৫৫ সালে, বিশেষত ১৯৫২ সালে, কংগ্রেস ও সি-পি-আই প্রভৃতি রাজনৈতিক অবহেলার পিছনে যথেষ্ট অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রচ্ছন্ন ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অতি কৃতিত্বের সঙ্গে পাসকরা একটি ছাত্র, অমর মুখার্জি, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিভাগে কাজে ভর্তি হন। তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন, সেটি আমি 'ইকনমিক উইকৃলি'র সম্পাদক শচীন চৌধুরীকে প্রকাশের জন্য পাঠাই। শচীনদা সেটি ভাল করে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে অমর মুখার্জির প্রতিপাদ্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে, মধ্যশ্রেণীর, বিশেষত বর্ণহিন্দু, মালিক চাষীরা যেহেতু নিজের হাতে হাল ধরে না বা চাষ করে না, জমির যথাযথ খিদমত বা তার ফলন বাড়ানোর কোন চেষ্টা করে না, এমন-কি কোনরকম তদারক পর্যন্ত করে না, এবং ভাগচাষীর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, তার ফলে যে ফসল হয় তাতে লাভ হবার প্রশ্ন তো ওঠেই না, উপরন্তু চাষের খরচ ওঠারও কথা নয়; যদি-না তারা অসম্ভব সস্তা মজুরিতে মজুরচাষীদের নিজেদের অধীনে রেখে, অথবা পার্শ্বস্থ সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আদিবাসীদের আনিয়ে বীজবোনা, নিড়েন, ফসল কাটা, মণ্ডাই ও মরাইতে তোলার ব্যবস্থা না করতেন। এ-সবই তাঁরা করতেন মজুরদের জীবনধারণের পক্ষেও অনুপযুক্ত নামমাত্র মজুরি দিয়ে, যাতে নাকি চাষীমজুরদের ভালরকম পেটও ভরত না, ভরণপোষণ দূরের কথা। এইভাবে, মার্ক্সের ভাষায় মজুরচাষীদের কাছ থেকে তাদের মেহনতের

উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করা হয় বলেই পশ্চিমবঙ্গে চাষবাস এখনও সম্ভব হয়, এবং তার থেকে মালিকের মুনাফা হয়। এই অবস্থায়, যে হাঁস সোনার' ডিম দেয়, তাকে জমির মালিক করে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিয়ে কেউ কি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারার ব্যবস্থা করবে!

এত কথার শেষে, আমার মনে এই প্রশ্ন দাঁড়ালো, সি-ডি-পি প্রকল্প কত শতাংশ লোকের উপকার করছে? উপরন্তু, এই প্রচেষ্টার ফলে, গ্রামীণ সমাজ কীভাবে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবে? এটা স্পষ্ট, যা কিছু উন্নতি হবে, তার অধিকাংশ সুফলই গ্রামের বিশ শতাংশ লোকের পেটে যাবে, যারা গ্রামের ৮৮ শতাংশ জমি ভোগদখল করে। তার ফলে শুধু অন্তর্বিরোধ ও অসন্তোষই বাড়তে থাকবে, গ্রামের অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হবে। তা সত্ত্বেও উপরে ঢালা সুফল, উপরের স্তর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে একেবারে নিচের স্তরে কিছু কিছু অবশ্য পোঁছবে। কিন্তু তার পরিমাণ কতটুকু? ঠিক এই প্রশ্নে সুশীল দে'র আলোচনা-চক্রগুলিতে তাঁর ও আমার মধ্যে বারবার মতদ্বৈধ হত, দে সাহেব আহতবোধ করতেন।

বি-সি রায়ের সঙ্গে আলোচনা

দে সাহেবের আলোচনাচক্রে বাদানুবাদের পর আমি কয়েকবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁকে এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করি। মুখ্য-মন্ত্রী আমাদের মন্ত্রী ছিলেন, উপরন্তু তিনিই বিধানসভায় জমিদারী উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কার বিল দুটি আনেন। বললুম, এই বিষয়গুলি পুনর্বিচার না করলে সি-ডি প্রকল্প শুধু উপরত্বকের সৌন্দর্যপ্রলেপ হয়ে থাকবে, সমাজের সার্বিক স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হবে না। লোকঠকানো ব্যাপারে দাঁড়াবে। দে সাহেব হয়তো ভাবলেন (এবং তা প্রকাশও পেল) আমি মারাত্মকভাবে কম্যুনিস্ট হচ্ছি। মজার কথা হচ্ছে যে কম্যুনিস্টরাও আমার প্রস্তাবের বিরোধী ছিল। আসলে তিনি যদি তলিয়ে দেখতেন তাহলে উল্টো ভাবনাই হয়তো সঙ্গত হত।

যেহেতু ডাঃ রায় নিজে রাজনীতি করেন, মনে হল তিনি আমার বক্তব্যের অন্তর্নিহিত যুক্তিটি বুঝতে পারবেন। সারা জীবন জমিদারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তো তিনি নিজে জমিদারী-উচ্ছেদ-আইন আনলেন? অন্যপক্ষে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক হিসাবে প্রত্যহ বিনা দর্শনীতে বহু রোগীকে চিকিৎসাসূত্রে, তিনি সমাজের নিচু

সম্প্রদায়েরও অবস্থা জানতেন। অবশ্য এটাও জানতুম, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুযোগ হয়তো কোনদিন হয়নি বলে তিনি সমাজের নিম্নতম শ্রেণীদের দুরবস্থা কতদূর হতে পারে তা জানতেন না। তা সত্ত্বেও তাঁর বোধশক্তির উপর আমার যথেষ্ট সম্ভ্রম ও আস্থা ছিল। নিজে তো কোনদিন বড় জমিদার বা উপস্বত্বভোগী ছিলেন না, সুতরাং মনে হত এ-বিষয়ে তাঁর নিজস্ব স্বার্থ তাঁর দৃষ্টিকে আবৃত করবে না, বরং উচ্চশিক্ষিত লোকের নৈর্ব্যক্তিক বিচারবুদ্ধি থাকা বেশী সম্ভব।

আমি আরেকবার ডাঃ রায়ের কাছে যাই, কলকাতার মলনিকাশ, লবণহ্রদ ও ভেড়ি সম্বন্ধে আপত্তি জানাতে। যদি লবণহ্রদে ভেড়ি নষ্ট করে নগর তৈরি হয়, এবং ক্রমাগত তার প্রসার হয়, তাহলে কলকাতার বিশেষ ক্ষতি হবে, এই ছিল, এবং এখনও আছে আমার বিশ্বাস। বর্তমানে যেভাবে কলকাতার পুবে জলাভূমি ও জমিভরাটের গতি চলছে তাতে আমার মনে আতঙ্ক বাড়ছে। সে সময়ে ডাঃ রায় আমার যাবতীয় বক্তব্য ও নিবেদন, এবং বিশেষজ্ঞদের লেখা পেশ করা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র মন দিয়ে দেখেছিলেন, শুনেছিলেন। আমার যুক্তিতর্কের সঙ্গতি উদারচিত্তে স্বীকার করে নিজস্ব পাল্টা রাজনৈতিক যুক্তিগুলি দিয়ে বললেন, তিনি যে নতুন অঞ্চল তৈরি করে নগর বাড়াচ্ছেন তার একটি মূল কারণ, কলকাতার যানবাহন, রাস্তাঘাট, পূর্তকাজ সম্পূর্ণ ভোগে আনার প্রয়োজন বিচারে। বিশেষত দুর্গাপুর, কল্যাণী, ব্যাণ্ডেল থেকে প্রস্তাবিত গ্যাস ও বিজলির যাতে যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয়, সমৃদ্ধি বাড়ে।

সি-ডি প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে ভূমিসংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর দরবারে যাওয়া মনস্থ করলুম। আমাকে যথেষ্ট সময় দিলেন, যুক্তিগুলি মন দিয়ে শুনলেন। আমার স্বপক্ষে যে-সব রাজনৈতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক যুক্তির কথা এখন বললুম তিনি মেনে নিলেন। ১৯৫১ সেন্সাসে যে-সব ভাগচাষ, জনসংখ্যা ও জমির হিসাব আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অনুসন্ধান করিয়েছিলুম সে-সব সারণিগুলি আমার হাত থেকে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে কিছু কিছু অঙ্ক ও তথ্য নিজের খাতায় টুকে রাখলেন। বললেন, এত সব অঙ্ক তো উনি ভূমিরাজস্ব বিভাগ থেকে পাননি। বললুম, পাবার কথা নয়, মালদা ও মুর্শিদাবাদে ঠেকে শিখে সেন্সাস মারফৎ সংগ্রহ করেছি। সেট্‌ল্‌মেণ্ট রেকর্ডের সঙ্গে এত তফাৎ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। শেষে বললেন, আমি যে-সব যুক্তি দিয়েছি, সবগুলি তিনি আগে ভেবে দেখেননি। তাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন, আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করলুম।

আমি দুটি যুক্তি পেশ করলুম। প্রথমত, অত পরিমাণ ভূমিহীন চাষীমজুর,

উন্নতিমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে, ফল থেকে বঞ্চিত হলে, সি-ডি-প্রকল্পই বানচাল হবার আশঙ্কা থাকবে। প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গ থেকে তাদের বিশেষ কিছু লাভ হবে না। তেভাগা বানচাল হয়ে গেছে, এখন চাষের বর্ধিত ফলনের ভাগ একটু বেশী না পেলে তারা সমাজের তলাতেই পড়ে থাকবে। মধ্যস্বত্বভোগীরাও বেশী ফলনের দিকে এগোবে না, পাছে ভাগচাষীদের পক্ষ থেকে বেশী চাপ ও দাবিদাওয়া ওঠে। উল্টোপক্ষে তারা ভূমিসংস্কারের বিরোধিতা করবে পাছে ভাগ-চাষী ও ভূমিহীন মজুরচাষীর দাবিদাওয়ার ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিদ্রোহী হলে অল্প মজুরিতে ভাগচাষ করার মজুর মিলবে না। তাদের আশঙ্কা যে কতবড় ও তাদের পক্ষে সত্য তা বোঝা যায় সেটল্‌মেণ্ট রেকর্ডে স্ব-স্ব বর্গাদার রেকর্ড করানোর বিরোধিতায়, পাছে তারা যে-সব বাড়তি জমি বেআইনি-ভাবে স্বনামে, বেনামে লুকিয়ে রেখেছে সেগুলি ধরা পড়ে। নিবেদন করলুম, এখনও ভূমিসংস্কার বিল আনলে সরকারেরই সুবিধা হবে, কারণ দক্ষিণ রাঢ়ে ও গাঙ্গেয় বঙ্গে সি-পি আইয়ের অধিকাংশ সভ্য জমির উপস্বত্বভোগী, এবং তাদের রক্ষা না করতে পারলে পার্টি হিসাবে সি-পি-আই বিপদে পড়বে। এই যুক্তিগুলির যথার্থতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে আশির দশকে : অপারেশন বর্গা তাকে তোলা হয়েছে। ওদিকে সবুজবিপ্লবের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির ফলনে যে উন্নতি ও প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল, তাতে যথেষ্ট ভাঁটা পড়ে স্তিমিত হয়ে গেছে। অন্যান্য রাজ্যে যেমন ফলন ক্রমশ বেড়েই চলেছে, এ রাজ্যে বৃদ্ধির হার কমেছে, এমন-কি হ্রাস বা নিশ্চল অবস্থা দেখা দিয়েছে।

ডাঃ রায় আমার কাছে মিথ্যা বাগ্‌বিস্তার করলেন না। উল্টে তিনি আমার খাতাপত্র থেকে আরো কিছু হালের পরিসংখ্যান ও হারাহার নতুন করে বইয়ে টুকে রাখলেন। শেষে বললেন, তাঁরও কিছু রাজনৈতিক বাধা আছে। পার্টি থেকে, কি আপত্তি আসতে পারে, অল্পকথায় বললেন। তিনি তো পার্টির অধিকাংশ সভ্যদের স্বার্থ উপেক্ষা করে বেশী এগিয়ে যেতে পারেন না।

এরপর নলহাটিতে বা আমাদের দপ্তরে যে-সব বৈঠক হয়, তাতে আমি আবার দে সাহেবের কাছে আবেদন করলুম। তাতে কোন ফল হল না।

চরম পর্যায়

১৯৫৪-র মে মাসের প্রথম, অথবা দ্বিতীয় রবিবারে—ঠিক মনে নেই—দে সাহেব টেলিফোন করে বললেন আমি তাঁর ৩নং থিয়েটার রোডের বাড়িতে একবার যদি যাই। মিঃ ও মিসেস দে'র সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া আনন্দের কথা। গেলুম। মিসেস দে বেরোলেন না। মনে কোনো উত্তেজনা হলে দে সাহেব বিশেষ চাপতে পারতেন না। এদিন বেশ গম্ভীর ও দূরত্ব রেখে আমাকে এক তাড়া কাগজ পড়তে দিলেন। কাগজগুলি বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বললেন, ওঁর সমুখেই বসে পড়ে কাগজগুলি ফেরৎ দিতে।

পড়া শুরু করে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একপাতা পড়ার পর পাতা উল্টিয়ে পর পর নম্বর করা ছাব্বিশ দফা অভিযোগের মত রচনা দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলুম না। পর পর ছাব্বিশটি অভিযোগের ফর্দে পাতাগুলি ভর্তি, আমার বিরুদ্ধে অবাধ্যতা ও আনুগত্যের অভাবের নালিশ। সত্তরের দশকের শ্রীমতী গান্ধীর সচিব পরমেশ্বর হাকসার প্রবর্তিত 'কমিটেড ব্যুরোক্রেসি' অর্থাৎ বিশেষ নেতা বা নেত্রীর একান্ত অনুরক্ত প্রজা হওয়াই একমাত্র কর্তব্য—এই নীতির রূপদানের ধারা তখন থেকেই শুরু হয়। সব অভিযোগের মূলে আছে আমি কম্যুনিস্ট, সব কিছুতে ভাঙন আনাই আমার ব্রত। এমন-কি আমি সাইকেল করি, হাঁটার উপর জোর দিই, জীপে ঘোরা পছন্দ করি না, সেও অপরাধ। বাউড়ি, সাঁওতাল, ডোম গ্রামে রাত কাটাই তাও। অন্যরাজ্যের কাজের প্রশংসার পিছনেও আমার মতলব তাঁর প্রতি বিরুদ্ধতার সৃষ্টি।

দে সাহেব বললেন তিনি মনে করলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাগজগুলি পাঠাবার আগে আমাকে একবার দেখাবেন। আমি কয়েকটি সাদা কাগজ চাইলুম, কিছু কিছু নোট নেবার জন্য। দে সাহেব আমাকে কাগজ-পেন্সিল দিলেন। ছাব্বিশটি অভিযোগের প্রতিটির থেকে নোট নিলুম, এবং কিছু কিছু ব্যাপারে দে সাহেবের ব্যবহৃত ভাষাও হুবহু টুকলুম।

পরের দিন সত্যেন রায়ের কাছে গিয়ে আগের দিন যা ঘটেছে, সবগুলি বললুম। ছাব্বিশ দফা অভিযোগের প্রতিটি সংক্ষেপে বললুম। সত্যেন রায় আমাকে সদুপদেশ দিলেন, অপূর্ব চন্দ যেমন ১৯৪৩ সালে মুন্সীগঞ্জে দিয়েছিলেন। বললেন, আমি যেন সমস্ত কাগজপত্র জোগাড় করে সমস্ত কিছুর বিশদভাবে উত্তর লিখে প্রতিটি অভিযোগ পূর্ণভাবে খণ্ডন করি, প্রতিটি উত্তরে সংশ্লিষ্ট দলিল থেকে উদ্ধৃতি দিই। এরপর তিনি আরেকটি ভাল উপদেশ দিলেন। প্রত্যুত্তর তৈরি করে আমি

যেন সেটি অন্তত এক সপ্তাহ দেরাজে বন্ধ করে ফেলে রাখি, তারপর সবটি ভালভাবে পড়ে, যেখানে যেখানে ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা মনের উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে, সে অংশগুলি বাদ দিয়ে রচনাটি যথাসম্ভব শান্ত ও নৈর্ব্যক্তিক করি। যা কিছু বলব, পাঠকের যেন ধারণা হয় সবই কমিয়ে বলছি, বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে নয়। অর্থাৎ বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ যথাসম্ভব কম থাকবে, জোনাথান সুইফ্‌টের লেখার মত। একত্রিশ পাতার অভিযোগের উত্তর পঁয়তাল্লিশ পাতায় তৈরি হল। চীফ সেক্রেটারির মারফৎ মুখ্যমন্ত্রীকে পেশ করলুম। এক কপি দে সাহেবকে দিলুম। এসব লেখালেখি ও কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি আমার সেন্সাস দপ্তরে আমার সেন্সাস স্টেনোকে দিয়ে করাই, সুতরাং উন্নয়ন দপ্তরে কেউ জানতে পারেনি।

২০ মে তারিখে আমার নামে শীলমোহর করা একটি চিঠি পেলুম। ঐ তারিখে বিধানবাবু নিজের হাতে নীল পেন্সিলে ছোট্ট একটি নোট আমাকে লিখেছেন, আমি যেন কাজ করে যাই, ঝোঁকের মাথায় কিছু না করি। উনি মাসখানেকের জন্য কাশ্মীর এবং আরো দু'এক স্থানে যাচ্ছেন, ফিরে এসে মীমাংসা করবেন। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুনতে পেলুম দে সাহেব ২১ জুন দু'মাসের সফরে আমেরিকা যাচ্ছেন। তার আগের দিন, অর্থাৎ ২০ তারিখ রবিবার, আমাকে বলা হ'ল দে'র অবর্তমানে আমি তাঁর স্থানে ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনারের কাজ করব।

ছয় সপ্তাহ কাল পার হতে না হতে এটি হল দ্বিতীয় বিস্ময়। প্রথম বিস্ময় হয়েছিল দে সাহেবের অভিযোগ। ২০ জুন রবিবার আমরা গ্রোভ লেনের বাড়িতে সকলে মিলে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেছি। দিদিরাও এসেছিলেন। বেলা চারটে নাগাদ সদর দরজায় টোকা শুনে দরজা খুলে আশ্চর্য হয়ে দেখি মিঃ ও মিসেস দে দাঁড়িয়ে। ওঁদের দেখে আশঙ্কায় আপনা হতেই একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। এই কয় সপ্তাহ মিসেস দে'কে একবারও দেখিনি। চিরকালের মত, মিসেস দে আমাকে দেখেই স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। দুজনকে বসার ঘরে এনে বসিয়ে আভাকে ডাকলুম। দে সাহেব কথাটা পাড়লেন, বললেন পরের দিন সকালে আমাকে ওঁর কাছ থেকে চার্জ নিতে হবে। তিনি এমন সহজ ও খুশিভাবে কথাটা বললেন, তাতে তিনি এ-পর্যন্ত আমার প্রতি যে-সব অবিচার করেছেন বলে মনে দুঃখ পেয়েছিলুম, সব ঘুচে গেল।

তৃতীয় বিস্ময় এল আরো দু'দিন পরে। ২৩ জুন। রাজস্ব বিভাগ থেকে একটি চিঠি পেলুম, লেখা আছে, আমি যতদিন অস্থায়ী কমিশনার থাকব ততদিন কমিশনারের বেতন পাব। হঠাৎ পাওয়া এই বাড়তি টাকা দিয়ে আমরা চটপট

একটি ইলেক্ট্রোলাক্স রেফ্রিজারেটর কিনলুম। আমার চাকরি জীবনে এই হল আমার 'বিড়ালের চতুর্থ জীবনপ্রাপ্তি'। তৃতীয় জীবনপ্রাপ্তি হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলের অনশন ধর্মঘটজনিত ঘটনার অবসানে।

২১ জুন থেকে ২৯ অগাস্ট পর্যন্ত ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনারের কাজ করার সময়ে আমি ডাঃ রায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। এই সময়ে আমি রাজ্যের পাঁচসালা পরিকল্পনার পুরো ধারণা পাই। ডি-ভি-সি ও ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি সেচ প্রকল্পের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে পারি। বিদ্যুৎপ্রসার, রাস্তাঘাট, বম্বে প্ল্যান, পরিবহন, হরিণঘাটা দুগ্ধকেন্দ্র ও পশুপালন প্রকল্প, কল্যাণীর বিস্তার, সমুদ্রে মাছ ধরার প্রকল্প, হলদিয়া বন্দরের পত্তন; লবণহ্রদ শহরের প্রতিষ্ঠা; কলকাতা শহর ঘিরে চক্ররেলের ব্যবস্থা; কলকাতার ভূগর্ভে মেট্রো রেল প্রকল্প ইত্যাদি। ৩০ অগাস্ট দে সাহেব পুনরায় কাজে যোগ দিলেন।

পাঞ্জাব ও পেপসু ১৯৫৪

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস বিশেষ সুখে কাটল না। অক্টোবর মাসে দে সাহেব আমাকে পাঠালেন পাঞ্জাব আর পেপ্‌সু (এখনকার হিমাচল প্রদেশ) দেখে আসতে। সঙ্গে দিলেন সুখময় রায় ও মুকুল গুপ্তকে।

পাঞ্জাবে গিয়ে প্রথমেই যা আমাকে মুগ্ধ করে তা হচ্ছে প্রতি জমি-মালিকের পূর্বের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড জমি একলপ্তে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বড় জমি করে দেয়া। একে ইংরেজিতে বলে কন্‌সলিডেশন অভ হোল্ডিংস। এই ব্যবস্থায়, এক নিমেষে চাষের কত যে উন্নতি ও সুবিধা হল বলার নয়। ফসল তোলার পর জমি নতুন করে তৈরি করা থেকে শুরু করে সেই ফসল তোলা পর্যন্ত। চল্লিশ দশকের শেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চাষের মালিকানা জমি একলপ্তে করাই নতুন কৃষিনীতির ফতোয়া। কিন্তু এই ফতোয়ার জিগির পশ্চিমবঙ্গে আদৌ ওঠেনি।

কিন্তু, যে দৃশ্যের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না, এমন-কি মহীশূরে যাবার পরও, তা হল ভারতবর্ষের মত দেশে পাঞ্জাবের সাধারণ গ্রামে সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি। যতদূর চোখ যায় মাঠেঘাটে ফসলের প্রাচুর্যের তো কথাই নেই, মহীশূরে যেমন দূরের আকাশ ছেয়ে বিদ্যুতের তারের সর্বত্র যাতায়াত, পাঞ্জাবে তেমনি সেচের জন্য জলভরা খাল। ব্যক্তিগত স্বাচ্ছল্য ও শ্রীবৃদ্ধির অভাবিত প্রমাণও পেলুম। পাটিয়ালা ঘোরার সময়ে জীপ থামিয়ে সকালে একজন শিখ কৃষকের সঙ্গে আলাপ

করলুম। মনে হল মাঝারি অবস্থার কৃষক। অন্তত তাঁর ঘরবাড়ি, ছোট ট্র্যাক্টর ও গোশালা দেখে তাই মনে হল। দেড় ঘণ্টা ধরে তিনি আগ্রহভরে আমাদের হাঁটিয়ে তাঁর ক্ষেত খামার দেখিয়ে বেড়ালেন। শেষে খুব ভদ্রতা করে একটু চা খেতে বললেন। আমাদেরও চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল, বেলা এগারোটাও বাজে। তাড়াতাড়ি বাড়ির সমুখে নিমগাছের ছায়ায় একটি বড় টেবিল নিজেই এনে পেতে, তার উপরে সাদা দামাস্ক-করা টেবিলের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর আনলেন ঝকঝকে ধোয়ামোছা চায়ের বাসনপত্র, কাঁটাচামচ। খাবার পরিবেশনের আগে এল সদ্য তৈরি করা বড় গ্লাসভর্তি বাড়ির দইয়ে করা মাখনভর্তি লস্‌সি, সেঁকা টোস্ট, অমলেট, সসেজ, বেক্‌ড্‌ বীন। সঙ্গে বাড়ির তৈরি টাটকা মাখন, ছানা, জ্যাম ও মার্মালেড। তারপর কফি, তাতে মাদ্রাজী কফির মত কফির থেকে দুধই বেশী। যে-ভাবে তিনি ও বাড়ির সকলে সমুখে একে একে সব কিছু সাজিয়ে ধরলেন, ও আদর-যত্ন করলেন, তাতে মনে হল বাড়ির সকলেই এই ধরনের খেতে ও অতিথি আপ্যায়নে সদাই অভ্যস্ত। পাটিয়ালার আগে নীলোখেরি এবং পরে বাটালা, লুধিয়ানা, অমৃতসর ইত্যাদি দেখে আমরা গেলুম পাঠানকোট, কাংড়া, মণ্ডি, কুলু ও মানালি। প্রত্যেক জায়গায় লোকেদের স্বাচ্ছল্য ও সুন্দর অবস্থা-ব্যবস্থা দেখে আমরা মুগ্ধ হলুম। অবাক হলুম মণ্ডি থেকে শুরু করে মানালি পর্যন্ত একের পর এক নানাবিধ ফলের বাগান দেখে। সেরকম সুন্দর ফলন আমি ১৯৩৯-৪০-এ ইংলণ্ডে কট্‌স্‌ওল্ড কাউন্টিগুলিতেও দেখিনি। ফিরতি পথে আমরা একদিনের জন্য চণ্ডীগড়ে থেমে নতুন শহরটি ঘুরে দেখলুম। দেখলুম রাজধানীর ক্যাপিটল অঞ্চল, মন্ত্রী ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর কর্মচারিদের বাড়ি, মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারি, কেরানি ও পিয়নদের পাড়া ও বাসস্থান। বুঝতে পারলুম না কর্বুসিয়েরের মত স্থপতি বিশ শতকের মাঝামাঝি আনকোরা নতুন শহরে নতুন দিল্লীর মত সামাজিক ও সরকারি পদানুসারে ঐ ধরনের ছুঁৎমার্গধর্মী আলাদা আলাদা বাসস্থান অঞ্চল কেন তৈরি করলেন।

১৯৫৪-র ২৮ অক্টোবর যখন পল ম্যানশনে ফিরলুম, জয়ন্তী তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। আমাদের অবর্তমানে শাশুড়ীঠাকরুন পল ম্যানশনে এসে ছিলেন, জয়ন্তীকে দেখাশোনা করার জন্য। আমার ছোটশালা বিশু (পূর্ণেন্দু)-ও প্রায় রাত্রিতে পল ম্যানশনে কাটাত। শাশুড়ীঠাকরুন বললেন সর্বত্র খুব গুজব আমি নাকি ডেভেলাপ-মেণ্ট বিভাগ থেকে জেলায় বদলি হয়ে গেছি। কোন্ জেলা বলতে পারলেন না। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে যখন অফিস গেলুম তখন দেখি চীফ সেক্রেটারি জানিয়ে-ছেন, ট্যুর থেকে ফিরলেই যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। যখন তাঁর ঘরে গেলুম,

দেখি মুখে বিরক্তভাব। বিরক্তির গলায় বললেন, সরকার স্থির করেছেন, আমাকে ডেভেলাপমেণ্ট বিভাগ থেকে সরিয়ে দেবেন। বললেন, সরকার ঠিক করেছেন বর্ধমান জেলাকে দু'ভাগ করে দুটি জেলা করতে হবে। কিভাবে ভাগ করতে হবে, সুপারিশ করার জন্য আমিই যোগ্যতম ব্যক্তি। কয়েক মাসের মধ্যে আমাকে এ-কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

সরাসরি জিজ্ঞেস করলুম, এতে কি আমার পদের অবনতির হুকুম হল না? বললুম, কেন আমাকে বদলি করা হল, কারণ জানতে চাই না, তবে এই বদলিতে সরকার আমার পদের অবনতি করলেন কিনা সেইটুকু আমি জানতে চাই। বদলি যদি অবনতি হিসাবেই করা হয়ে থাকে, তবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি দিয়ে আমাকে জবাব দেবার সুবিধা দেয়া হোক। আমার চাকরির শর্তানুসারে এই সুযোগ আমার প্রাপ্য অধিকার। রায় আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন, বললেন, অবনতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। জয়েণ্ট সেক্রেটারি ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সমান পদবাচ্য। কাগজে কলমে সেটা ঠিক তা আমি জানি, কিন্তু এই ধরনের সমপদ-বাচ্যতা সচরাচর প্রয়োগ হয় না, শাস্তি দেবার সময়েই হয়, নয় কি? কথার মোড় ঘুরিয়ে রায় বললেন, প্রশাসনের উন্নতির জন্য বর্ধমানকে দু'ভাগ করা কত প্রয়োজন, আমার থেকে বেশি আর কে বুঝবে? পাঠকই জানেন, এই উন্নতির কামনায় বর্ধমান এখনও কেঁদে মরছে! বুঝলুম, রায় আগডুম বাগডুম বকছেন, আমি তাঁকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলেছি, আর নয়।

আমার মনোভাব বুঝিয়ে দেবার জন্য, তাঁর কথার পিঠে ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত স্বরে থ্যাঙ্ক ইউ বললুম। তিনি চুপ করে রইলেন। বললুম, ১৯৪৭ অগাস্ট থেকে আমি একদিনও ছুটি না নিয়ে মুখ গুঁজে কাজ করেছি, নতুন কাজে যোগ দেবার আগে আমার কিছু ছুটির প্রয়োজন। আমি দু-মাসের জন্য ছুটির দরখাস্ত করছি, এবং এই প্রশস্ত সময়। প্রত্যুত্তরে তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখে কিছু কথা জুগোল না। আমি চলে গেলুম। মৃগাঙ্কমৌলী বসু ছিলেন গৃহবিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারি। কয়েক-দিন পরে তিনি বললেন, মিঃ দে জেদ ধরেছিলেন, হয় আমাকে পদাবনতির মত দেখাবে এমনভাবে তাঁর দপ্তর থেকে বদলি করা হোক, না হলে তিনি নিজেই আই-সি-এস চাকরি থেকে ইস্তফা দেবেন। দে ছিলেন আমার থেকে দশ বছরের সিনিয়র। আমার মান রাখতে গিয়ে তাঁকে চাকরি থেকে ইস্তফা দেবার অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়। আই-সি-এসের ইস্পাত কাঠামোয় তাতে চিড় ধরবে। সুতরাং খাঁড়ার ঘা আমার উপরেই পড়ল।

বিদায়

পরের দশদিন উন্নয়ন দপ্তরে রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরে বসে জানালার কাছে চেয়ার টেনে আকাশে মেঘ দেখা, আর কেউ যদি ঘরে ঢোকে তার সঙ্গে খোসগল্প করা ছাড়া আমার কোন কাজই রইল না। দপ্তরে হুকুম হয়েছে আমাকে যেন কোন কাগজ বা ফাইল দেয়া বা দেখানো না হয়। আমার ছুটি মঞ্জুরের হুকুম আসছে না বলে আমি দপ্তর ছাড়তে পারছি না। অবশেষে হুকুম এল ৭ নভেম্বর, অর্থাৎ দে সাহেব স্বয়ং গিয়ে সত্যেন রায়কে যখন জানান যে হুকুম তখনও যায়নি, তারপর। এদিন বেলা বারোটায় আমি কাগজে সই করে সেন্সাস অফিসে গিয়ে বসলুম। ৮ নভেম্বর থেকে ছুটি শুরু হল। আমি ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি চেয়েছিলুম, আমার কথা থাকল না, চীফ সেক্রেটারির কথাই রইল। ছুটি মঞ্জুর হল ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। নতুন কাজে যোগদানের জন্য সাতদিন অবসর যোগ করে ২৬ ডিসেম্বর বর্ধমানে পৌঁছতে হবে।

কোন একটি বই লেখায় ডুবে থাকার মত অপমানের জ্বালা ঝেড়ে ফেলার উৎকৃষ্ট উপায় আর দ্বিতীয় নেই। পশুরা যেমন মারামারির পর গায়ের ক্ষত জিভ দিয়ে চেটে চেটে সারায়। এই সময়ে আমার ছোট বই 'পশ্চিম ইউরোপের চিত্র-কলা' লিখি। কবি কামাক্ষীপ্রসাদের ভাই, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টো-পাধ্যায় এটি ১৯৫৫ সালের মে মাসে তাঁর 'স্বাক্ষর' সংস্থা থেকে প্রকাশ করেন।

আরোগ্যের একই বিধান দ্বিতীয়বার পালন করি ১৯৬৯ সালে। আমি তখন কেন্দ্রে ইনফর্মেশন ও ব্রডকাস্টিং মন্ত্রণালয়ের সচিব। আমার মন্ত্রীর সঙ্গে আকাশ-বাণীর প্রচারের নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে গুরুতর মতানৈক্য চলেছে। এ সময়ে মন শান্ত করার জন্য আমার 'দিল্লী ক্যাপিটাল সিটি' বইটি লেখা শুরু করি। এই-বারে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে আমার মন্ত্রীকে অন্য মন্ত্রীপদে বদলি করে দিলেন। সাতদিন পরে আমিও অন্য মিনিস্ট্রিতে সেক্রেটারি পদে বদলি হলুম। তবে আমার মনে এইটুকু শান্তি হল যে মন্ত্রী বদলি হবার অন্তত সাতদিন পরে আমি বদলি হই।

১৯৫০-এর সংবিধানবলে প্রাপ্তবয়স্করা ভোটাধিকার পাবার পর ১৯৫২-র ৩ জানু-য়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারাভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। ১৯৫৩-র ২৯ মে এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে: তেনজিং নরগে ও এডমণ্ড হিলারি এভারেস্ট পর্বতের শীর্ষে ওঠেন। এই প্রথম গৌরীশৃঙ্গের পরাজয় ঘটে। ১৯৫৩-র ২৩ জুন

শ্রীনগরে গৃহবন্দীরূপে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যু হয়। মেদিনীপুর ঘূর্ণিঝড়ে ও দুর্ভিক্ষের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন আমার বীরপুরুষ। ১৯৫৪ সালে দেশের স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে মনে পড়ে কল্যাণীতে ১৬ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সভা। ১৯৫৪-র ২৫ জানুয়ারি মানবেন্দ্রনাথ রায় মারা যান।

ঘরের কথা বলতে গিয়ে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত যে-সব আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি আমার মনে দাগ কাটে তাদের কথা বলা হয়নি। ১৯৫১-র ২৭ অক্টোবর উইন্স্টন চার্চিল আবার বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ১৯৫৩-র প্রথম প্রধান ঘটনা হয় ২০ জানুয়ারি ডোয়াইট আইজেনহাওয়ারের আমেরিকার রাষ্ট্রপতিপদে অভিষেক। ১৯৫২ সালে নির্বাচনের সময়ে তাঁর বিষয়ে একটি সুন্দর বর্ণনা রটে: প্রেসিডেণ্ট পদে প্রার্থী হিসাবে তিনি ছিলেন প্রতিটি আমেরিকান মেয়ের স্বপ্নের স্বামী। তবে ১৯৫৩-র ৫ মার্চে স্টালিনের মৃত্যুই আমাকে সবথেকে বেশী বিচলিত করে। তাঁর মৃত্যুতে হল ইতিহাসের একটি যুগের অবসান। তখন মোটেই ভাবিনি তাঁর মৃত্যুতে সারা বিশ্বময় এত তিক্ততা ও বিরোধের সৃষ্টি হবে। ধারণা ছিল না তাঁর জীবিতকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন কীভাবে শাসিত হত। যত কিছু অত্যাচার-অনাচারের কথা দেশত্যাগী অথবা পার্টিত্যাগী রাশিয়ানরা তার আগে লিখেছেন সবই মনে হত সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনার ফল।

১৯৫৪-র সবথেকে স্মরণীয় ঘটনা হয় কম্যুনিস্ট ভিয়েৎনামের হাতে ফরাসী ডিয়েন বিয়েন ফু'র পতন। তারিখটি ৭ মে, ত্রিপুরা থেকে ফিরে পরের দিনটি আমরা রাজভবনে রবীন্দ্রজন্মতিথি পালন করছি। আবৃত্তিও করলুম 'দামামা ঐ বাজে'। এরপর আসে ১৯৫৪-র ২০ জুলাইয়ে জেনিভায় ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি। চুক্তির ফলে ফ্রান্স উত্তর ভিয়েৎনাম ছেড়ে যায়, প্রতিদানে কম্যুনিস্টরা ছাড়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস। ফ্রান্স কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনামের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করে।

জয়ন্তী

১৯৫৩-র শেষে দার্জিলিং-এর লোরেটো কনভেণ্ট থেকে আমরা জয়তীকে ছাড়িয়ে এনে কলকাতার লোরেটো হাউসে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিই। আশা ছিল কলকাতা ডেভেলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের চাকরিটা পাকা হবে, কলকাতা থেকে আর নড়তে হবে না। তখন উন্নয়নবিভাগে খুব হৈচৈ যাচ্ছে, জয়তীর ভর্তি নিয়ে কর্তৃপক্ষের

সঙ্গে দেখা করার ফুরসৎ আমার নেই। অভিমান করে আভা বলল, সে নিজেই ব্যবস্থা করবে। শিক্ষাসচিব ডি-এম সেন, ইওরোপীয় স্কুলগুলির ইন্স্পেকটর ইত্যাদির সঙ্গে বারবার দেখাসাক্ষাৎ করে আভা সব কাগজ ও অনুরোধপত্র জোগাড় করে লোরেটোর মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে দেখা করে ভর্তির আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করেছে, কিন্তু মাদার সুপিরিয়র একটা না একটা ছুতো দেন। এমন সময়ে দেখলুম এখন কিস্তিমাত না করলে আমার মুখ থাকে না। আভার সঙ্গে লোরেটোতে গিয়ে আমার কার্ডটি দিলুম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ে জয়তীর ভর্তির ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল। মাদার সুপিরিয়রের এমন নমনীয়তা দেখে আভা তো রেগে কাঁই। আমি নিমিত্তমাত্র ভাব দেখিয়ে খুব নম্রভাবে কয়েকদিন বাড়িতে ঘুরে বেড়ালুম।

লোরেটো হাউসে এসে মাস-তিনেকের মধ্যে জয়তীর শরীরে ও মনে অনেক পরিবর্তন হল। তখন এগারো বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে। দেখতে দেখতে সে যেন সবদিক দিয়ে বড় ও সাব্যস্ত হল। মায়ের কাছে অঙ্ক কষা শিখে সে অঙ্কেও ভাল হল, সাহিত্যে ও অন্যান্য বিষয়ে আগে থেকেই ভাল করছিল। কয়েকটি বন্ধুও খুব ভাল জুটল, তাদের মধ্যে ছিল ব্যারিস্টার সুবিমল রায়ের কন্যা সুনন্দা রায়, দেশ-প্রিয় যতীন্দ্রমোহনের পৌত্রী কমলিনী, গ্যাংজি পরিবারের নসীম গ্যাংজি, কৃষি-বিশারদ এস-সি রায়ের কন্যা উমা রায় (এখন উমা দাশগুপ্ত), মীরা মিশ্রর মেয়ে রূপা মিশ্র। করুণা হাজরা মহাশয়ের মেয়ে মধুমতী ছিল জয়তীর থেকে বড় ও ক্লাসে উঁচু শ্রেণীতে। তবে শ্রী ও শ্রীমতী হাজরা জয়তীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বলে জয়তীও মধুমতীর প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠল। মধুমতীকে আমি 'মেডো' বলে উল্লেখ করতুম, আর জয়তী ক্ষেপে টং হত। লোরেটোতে শুধু যে পড়াশোনায় তা নয়, পিয়ানো, ভাওলিন, আবৃত্তি, গান ও অপেরার অভিনয়ে ও গানেও বেশ পার-দর্শিতা এল। খুব নাম হল গিলবার্ট ও'সালিভান অপেরার 'মিকাডো'তে অভিনয় করে। তার বিখ্যাত 'টিটু-উইলো' গান গলার কলরাটুরার গুণে স্মরণীয় হয়ে রইল। দ্বিতীয় বিজয়োল্লাস আসে 'বয় গুবার্ট' অপেরায় গুবার্টের চরিত্রে অভিনয় ও গান করে। বড় আপশোষ হয় তখনকার দিনে, ছোট টেপরেকর্ডার চালু হয়নি। সে যাই হোক ১৯৫৪ সালে ফিরে আসা যাক।

এক বছর যেতে না যেতে জয়তীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির আশঙ্কায় আমাদের মন খুবই খারাপ হল। তাছাড়া, একবার বাইরে গেলে কবে কলকাতায় ফিরে আসব তার তো কোন স্থিরতা নেই। আভার মা আমাদের অভয় দিলেন। জয়তীকে এন্টালিতে নিজের বাড়িতে রেখে লোরেটোতে রোজ পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

যা-কিছু অসুবিধায় পড়তুম, তাল পড়ত ওঁর আর আমার ছোট শ্যালক বিশুর ঘাড়ে। এই ভারটি দেবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উপায় নেই। জয়তীর তো পোয়া বারো, মা-বাবার হাত থেকে নিষ্কৃতি! দিদিমার কাছে আদরের সীমা নেই। জয়তীর জন্য শাশুড়ীঠাকুরন একটি রিক্‌শা ঠিক করলেন। রোজ সকালে নিরাপদে পৌঁছে দেবে, স্কুলের শেষে ফিরিয়ে আনবে। রিক্‌শাওলার আনুগত্য ও মেজাজ খুশি রাখার জন্য শাশুড়ীঠাকুরন নিজের হাতে রসগোল্লা তৈরি করে, রোজ বিকেলে জয়তীকে নিয়ে ফিরে এলে, রিক্‌শাওলাকে চায়ের সঙ্গে দুটি রসগোল্লা খেতে দিতেন। অন্য-দিকে এত সুন্দর পল ম্যানশনের ফ্ল্যাট ও সেই সঙ্গে কলকাতার বন্ধুবান্ধবকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবে নিজেকে ছিন্নমূল মনে হল। বিশেষ করে কলকাতায় কবে ফিরব, তার যখন স্থিরতা নেই। সবকিছুই কেমন অনিশ্চিত হয়ে গেল।

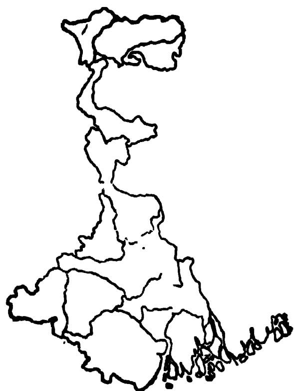
১৯৪৬ সালে জয়তীর বয়স হয় চার বছর। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের বিভীষিকা, তারপর ১৯৪৪-৪৬ সালের আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয় সন্তানের পথে বাধা পড়ে। ১৯৪৬-৪৭ সালে আমার অসুখবিসুখ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সে সাধে আরো বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার উত্তেজনা ও দেশগড়ার নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তিগত দায়িত্ব বাড়ানোর ইচ্ছা স্তিমিত হয়। ১৯৪৯-এর শেষে যখন কলকাতায় এলুম তখন মনে হল দ্বিতীয় সন্তান হলে ভাল হয় কি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এল ভারতীয় টাকার আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাস, তার ফলে সন্তান মানুষ করার খরচে অহেতুক বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দমে গেলুম। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার ফলশ্রুতি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে অসুবিধা আরো বাড়ল। শেষে, ১৯৫৪-এর ডিসেম্বরে কলকাতা থেকে উৎখাত হয়ে বর্ধমানে যখন বদলি হলুম, তখন ভয় হল এই ভবঘুরে জীবনই হয়তো অনিশ্চিতকাল ধরে চলবে। সুতরাং দ্বিতীয় সন্তানের চিন্তা মন থেকে দূর করাই শ্রেয়। জয়তীর বয়স তখন বারো। সন্তান থেকে মানুষ যা-কিছু আশা করে, মনে হল, জয়তী তার সবকিছুই পূর্ণ করবে। উপরন্তু এই আটত্রিশ বছর বয়সে সন্তান হলে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই আমাকে চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে। জয়তী কিন্তু বরাবরই আমাদের ভর্ৎসনা করেছে এবং এখনও করে যে নিতান্ত স্বার্থপর হয়ে তাকে আমরা ভাই বা বোন থেকে বঞ্চিত করেছি।

যা হবার যখন হয়েছে, তখন ভালর দিকটা ভেবে নিজেকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করলুম। কলকাতা থেকে বর্ধমান মাত্র বাহাত্তর মাইল দূরে, এবং সে পর্যন্ত রাস্তাও খুব ভাল। জ্যাক গ্রে আমার ফ্ল্যাটটি নিলেন, সুতরাং আশা হল তিনি চলে যাবার

আগে যদি কলকাতায় ফিরে আসি, ফ্ল্যাটটি হয়তো ফিরে পাব। বর্ধমান আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ। সেখানে আমার ছেলেবেলাও কাটে, বড় হই। সেখানকার বন্ধুবান্ধব আমাকে পেয়ে হয়তো খুশি হবে। আসানসোল শিল্পে ও অন্যান্য সুব্যবস্থায় ফেঁপে ফুলে উঠেছে, সে অঞ্চলেও নিশ্চয় ভাল বন্ধুবান্ধব পাব। উপরন্তু বর্ধিষ্ণু জেলায় দুর্ভিক্ষ বা খরার আশঙ্কা নেই। আভা আমাকে সাহস জোগালো, যদিও বুঝতুম জয়ন্তীকে ছেড়ে যেতে তার কত কষ্ট হবে। তার উপর যে-বাড়ি সে এত সুন্দর করে নিজের হাতে পরিপাটি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে একনাগাড়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর ছিল, সে-বাড়ির মায়া এককথায় ছেড়ে যাওয়া সহজ নয়। সবথেকে কষ্ট হল, বাড়ির দুজন অত্যন্ত ভাল ও কাজের পরিচারকদের বিদায় দিতে। যদি ফিরে আসি, তাদের কি আবার ফিরে পাব? মনে মনে বললুম 'ভইলা' : অর্থাৎ সেই হল কথা।

পড়া ও ওঠা : বর্ধমান, কলকাতা, হাওড়া ১৯৫৫

বর্ধমানে গমন



১৯৫৪-এর ২৬ ডিসেম্বর ভোরে যখন নিজেদের গাড়ি চালিয়ে বর্ধমানের পথে রওনা হলুম, সংকল্প করলুম, জীবনে প্রথম জেলায় যে আগ্রহে কাজ করতে গেছলুম, বর্ধমানেও যেন একই আগ্রহে কাজ শুরু করি। নিজেকে বললুম, বুকে নালিশ নিয়ে মনখারাপ করা পরাজয়ের চিহ্ন। শাস্তিকে জয়ের টীকা হিসাবে নেয়াই উচিত, বিশেষত যেখানে আমি কোন অপরাধ করিনি, বিবেকানুযায়ী কাজ করেছি। প্রফুল্লমনে নতুন কাজ উৎসাহের সঙ্গে করলে যাঁরা আমাকে শাস্তি দিয়েছেন তাঁদের বিবেকে আঘাত দেয়া হবে, বিশেষত সেইসব সহকর্মীকে যাঁরা শাস্তি পেয়েছি বলে আমাকে এড়িয়ে যাবেন। ২৭ ডিসেম্বর সকালে কালেক্টরেটে গিয়ে আমি যখন কাজে যোগ দিলুম তখন যাঁরই সঙ্গে দেখা হয় অত্যন্ত স্নেহ ও আন্তরিকতা দেখিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, বহুদিন ধরে কোন আই-সি-এস অফিসার তাঁদের জেলায় আসেননি, অন্তত স্বাধীনতার পরে তো নয়ই। সকলের মুখে খুশিভাব দেখলুম, বুঝলুম লোকের মনে আই-সি-এস কথাটি কত সমীহ আনে। উপরন্তু আমি যে অল্প-বয়সে এই জেলায় মানুষ হয়েছি, স্কুলে পড়েছি, এবং জেলার যাকে বলে জামাই, সে কারণগুলিও আমার স্বপক্ষে গেল। ফলে আমার মুখের তিক্তস্বাদ চলে গেল।

১৯৫২ সালের নির্বাচনে বর্ধমানের মহারাজা প্রথম হেরে যান। ফলে তিনি শহরে বেশী আসতেন না, কলকাতাতেই বেশীর ভাগ থাকতেন। রাজবাড়িতে গিয়ে আভা আর আমি তাঁর ও মহারানীর উদ্দেশে আমাদের কার্ড রেখে এসেছি জেনে খুশি হলেন। সরকারের অনুমোদিত আচরণবিধি অনুসারে বর্ধমানের মহারাজা ও মহারানীই একমাত্র দম্পতি ছিলেন যাঁদের উদ্দেশে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর স্ত্রী

স্বয়ং গিয়ে কার্ড রেখে আসার নির্দেশ ছিল। বর্ধমানের মহারাজার হাতে ছাত্রাবস্থায় আমি স্কুলের প্রাইজ নিই। তবে আমরা বর্ধমান যাওয়াতে যিনি সবথেকে খুশি হয়েছিলেন মনে হল তিনি সন্তোষকুমার বসু। বয়স তখন আশি পেরিয়ে গেছে। আমি যখন বর্ধমান টাউন স্কুলে পড়তুম তখন তিনিও একবার আমার হাতে প্রাইজ দেন। আমার সময়ে বর্ধমানের গোলাপবাগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। মধ্যবয়সে স্ত্রীবিয়োগ হয়, প্রৌঢ় বয়সে তাঁর মার যখন রোগ হয় তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে নিজের হাতে শুশ্রূষা করেন। সেই থেকে সারাদিন না-খাওয়া অভ্যাস হয়ে যায়। সকালে দুপুরের কিছু আগে বড় দেড় কাপ কফি খেতেন, সারাদিন আর কিছু খেতেন না, রাত্রে আটটার সময়ে পেটভরে খেতেন।

'ওরা যে আমাকে চায়' কল্পনা করে আমার খুব ভাল লাগল। ১৯৫৫-র ১ জানুয়ারির মধ্যে অর্থাৎ চারদিনে আমার মনের ক্ষত সেরে গেছে মনে হল। ঐ-দিন সকালে বর্ধমানের বিরাট কালেক্টরেটের ঘরে গিয়ে প্রত্যেক কর্মিকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালুম।

তার দু'দিন আগে, অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর আমি আসানসোলের এস-ডি-ও কে-পি-এ মেননকে ফোন করে বলি আমি ৪ জানুয়ারি আসানসোলে পৌঁছে পরের চারদিন সেখানে থাকব। থাকব ইন্স্পেক্শন বাংলায়। প্রতিদিন সকালে মহকুমার যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তাঁরই সঙ্গে আলাপ করব। আসানসোল তখন বিরাট শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আসান-সোলকে পশ্চিমবঙ্গের রূঢ় (Ruhr) বলে অভিহিত করতে ভালবাসতেন। আমার মতলব ছিল প্রতিটি বড় শিল্পসংস্থার মুখ্য পরিচালকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করা। ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে সংকটমুহূর্তে দু'পক্ষের সুবিধা হয়। বলা বাহুল্য আসানসোলে সংকট বা দুর্ঘটনা প্রায় লেগেই থাকত, হয় কারখানায় না-হয় কয়লাখনিতে।

একটানা চারদিন আসানসোলে থাকার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। আইভান সুরিটার কাছে শুনেছিলুম আমার কমিশনারের একটি বাতিক ছিল : কী করে তাঁর অধীনের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের ট্যুরের বিল কম করানো যায়। অন্য সব ব্যাপারেই তিনি 'মাইডিয়ার' লোক। তাছাড়া, কোন অফিসার যদি বিপাকে পড়ে, তার হয়ে লড়তে, ছিল তাঁর বিশেষ অনিচ্ছা। তাতে আমার আপত্তি নেই, সে বিষয়ে জীবনে আমার আগে থেকেই অভিজ্ঞতা আছে। ট্যুর বিলের ব্যাপারে আইভান নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলল। কমিশনার ভদ্রলোক ১৯৩৮ সালে বর্ধমানের

ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আইভান যখন ১৯৫০-এ বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট, একমাসে সে চারবার আসানসোলে যায়। তিনি আইভানকে লিখলেন, তিনি যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন আসানসোলে বলে পাঠাতেন, অনেকগুলি কাজ যেন একত্রে পরের পর জমিয়ে রাখে, যার ফলে তিনি আসানসোলে মাসে কি ছয় সপ্তাহে একবার গিয়ে, একনাগাড়ে কয়েকদিন থেকে সব কাজ একলপ্তে সেরে আসতে পারেন। এতে সময় ও সরকারের টাকা দুইই বাঁচত। আইভান উত্তরে লিখল, কমিশনার যদি আরেকবার তার ট্যুর ডায়েরি দেখেন, দেখতে পাবেন, আইভান আগের মাসে প্রথম যখন আসানসোলে যায় তার ঠিক আগে দিশের-গড়ে দাঙ্গা হয়ে গেছে; দ্বিতীয়বার যখন যায়, বার্নপুর ইস্পাত কারখানায় বিনা নোটিসে আচমকা হরতাল হয়; তৃতীয়বার যখন যায়, জামুরিয়া কয়লাখনিতে বিরাট ধ্বস নেমে অনেক লোক ধ্বসে চাপা ও আটকা পড়ে। সেই মাসেই চতুর্থ-বার যায় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে, তিনি শান্তিনিকেতন যাবার উদ্দেশ্যে পানাগড় হাওয়াই আড্ডায় নামেন। চিঠির শেষে আইভান লেখে, সে আশা করে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনাগুলি যাতে সব একত্রে বা পরপর ঘটে কমিশনার তার ব্যবস্থা করবেন। এর উত্তরে কমিশনারের তরফ থেকে এল নীরবতা।

৩ জানুয়ারি সকালে কমিশনার হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে হাজির। ৪-৫ তারিখে ধানবাদে একটি মিটিং ছিল তারই পথে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপদেশ দিলেন বার্নপুরের ইস্পাত কারখানার ম্যানেজার মিঃ ম্যাকক্রাকেনের উপর আমি যেন 'কল' করি, অর্থাৎ কার্ড রেখে আসি। বললেন, ম্যাকক্রাকেনের ভীষণ প্রতিপত্তি। সার বীরেন মুখার্জি তাঁর হাতে খান, ওদিকে ডাঃ রায় সার বীরেনকে খুব খাতির করেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম বর্ধমানের মহারাজাই কি জেলায় একমাত্র ব্যক্তি নন যাঁর উপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম 'কল' করার কথা? কমিশনার বললেন, তে হি নো দিবসা গতাঃ।

৫ থেকে ৮ জানুয়ারির প্রতি সকালে অনেকে এলেন। মেনন আগে থেকে সকলের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছিলেন প্রতিদিন কোন্ ছয় সাতজন একে একে আসবে। এইভাবে দিনে মোটামুটি কুড়ি-বাইশজন ভদ্রলোক প্রতি সকালে এসে দেখা করতেন। একে একে ছয়-সাতজন জড়ো হলেই ঘণ্টাখানেক ধরে বৈঠকী আড্ডার মত হত। বাংলার হাতায় একটি বড় অশ্বত্থগাছের তলায় টেবিল-চেয়ার পেতে বসার ব্যবস্থা হত। আসানসোলের শীতের পক্ষে আদর্শ ব্যবস্থা। আমরা চা কিংবা কফি দিতুম। ভালই কাটল। প্রথম দিনে প্রথম অতিথিদের মধ্যে ম্যাককাকেন

ছিলেন। সব থেকে মনে ছাপ পড়ল কুলটি কারখানার প্রধান ম্যানেজারকে দেখে। বেঁটেখাটো একজন স্কট্‌স্‌ম্যান, কোমরের মাপ বোধহয় চুয়াল্লিশ, ছেচল্লিশ ইঞ্চি। কথায় চড়া ব্রোগ টান। কুলটিতে বিশ বছরের বেশী কাটিয়েছেন, অর্থাৎ কারখানা স্থাপনার প্রথম থেকেই আছেন। চেহারায় সবথেকে উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল তাঁর প্রকাণ্ড, মোটা পেঁয়াজের রঙের নাকটি। ঘন বেগ্‌নি সরু সরু শিরে সারা নাক চিত্রিত। কত বছর ধরে কত শত শত গ্যালন বিয়ার খেলে তবে ঐ ধরনের বিচিত্র উদ্ভাস ও রূপান্তর হয়, ভাবলে এখনও অবাক লাগে।

জামুরিয়ার উদ্বাস্তু শিবির

৪ জানুয়ারি বর্ধমান থেকে অপরাহ্ণে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসানসোলে আসার সময়ে সত্যই খুব ঠাণ্ডা ছিল। তোপোসি ও জামুরিয়া রোডের মোড়ের কাছাকাছি গাড়ি পৌঁছেছে এমন সময়ে হঠাৎ দেখি একদল মহিলা ও অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে রাস্তার মাঝে ভিড় করে আছে। পরনে মলিন কাপড়, শীতের মোটেই উপযোগী নয়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। শুনেছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিকালে এই পথে আসানসোল যাবেন তাঁর জন্যই অপেক্ষা। তাদের মধ্যে অনেক ষোল থেকে আঠারো বছর বয়সের অবিবাহিতা মেয়ে ছিল। একেবারে কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যস্থলে, চারদিকে কয়লাখনি মজুরদের লাইন বা বাসস্থান, কোনমতেই মহিলা বা অল্পবয়সী মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ স্থান বলা যায় না। গাড়ি থামিয়ে নেমে সমুখের দুজন বয়স্কা মহিলাকে বললুম, আমিই সেই লোক। ততক্ষণে সারা ভীড়ে সজোরে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। মহিলা ও ছেলেমেয়েদের পরনে বলতে গেলে শতছিন্ন বস্ত্র। এদিকে আমার গায়ে মোটা পুলোভার আর হ্যারিস টুইডের জ্যাকেট। নিজেকে এমন গর্দভ মনে হচ্ছিল বলার নয়।

রাস্তার কিছু ভিতরে, রেলওয়ে সাইডিং-এর ধারে, খোলা মাঠে, চারদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা কয়েকটি বড় টিনের চাল দেয়া মাল রাখার খালি গুদাম। সেই ঘেরা এলাকায় ও গুদামগুলিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত নিরাশ্রয় অভিভাবকহীন বিধবা, উদ্বাস্তু নারীদের, তাদের পুত্রকন্যাসহ, বলা যায় পুরে রাখা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, কাঁটাতারের বেড়া চারদিকের গুণ্ডাদের কৌতূহলের বিরুদ্ধে বিশেষ নিরাপত্তা দেয় না। সারা ক্যাম্পে মোটামুটি শ'খানেক বয়স্কা নারী বা বিধবা, এবং তার দু'গুণ-সংখ্যক নাবালক ছেলেমেয়ে আছে। মেয়েদের বয়স, আগেই

বলেছি, অধিকাংশই ষোল থেকে আঠারো। ক্যাম্পে সবসুদ্ধ আট কি নয়জন বিভিন্ন বয়সের পুরুষ পরিচারক ও পরিচালক হিসাবে ছিল। সারা ক্যাম্পে মাত্র দু'জন মহিলা পরিদর্শক ছিলেন।

মহিলারা আমাকে ও আভাকে জোর করে কিছুক্ষণের জন্য ক্যাম্পের ভিতর নিয়ে গেলেন। যে-অবহেলায় আছেন বলতে গিয়ে মনের সমস্ত দুঃখ ও ক্ষোভ যেন ফেটে পড়ল। দুজনে ক্যাম্পের প্রতিটি গুদাম, রান্নাঘর, স্নানের জায়গা, পায়খানা, নামমাত্র স্কুল ও ডিস্পেন্সারি ঘুরে ঘুরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটালুম। অধিকাংশ ব্যবস্থা নামমাত্র, পাকা ব্যবস্থা বলে কিছু নেই, সবই যেন ভেঙে পড়ছে, ব্যবহারের অযোগ্য। কোথাও কোন আব্রু নেই, চতুর্দিক থেকে সব কিছু দেখা যায়। ওখানে বাস করতে নিশ্চয় সর্বদা গা ছমছম করে।

শীঘ্রই আবার আসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় চাইলুম। বললুম ইতিমধ্যে সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করব। মুখের কাঁচুমাচু অপরাধীভাব দেখে সাহস পেয়ে তাঁরা বললেন, ওসব ধাপ্পা এত-দিন ধরে তাঁরা অনেক শুনেছেন। আরো আধঘণ্টা ধরে মনের ঝাল মিটিয়ে তাঁরা সরকারের বাপান্ত করে বুঝলেন, আর আমাদের আটকে রাখা বৃথা। যেতে দিলেন।

যেদিন আসানসোল পৌঁছলুম, সেদিন রাত্রে খাবার পর মেননের সঙ্গে বসে পুনর্বাসন সেক্রেটারি হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি বড় রেডিওগ্রাম পাঠালুম। ক্যাম্পটির জন্য কী কী, কত সংখ্যায়, কত পরিমাণে প্রয়োজন বিশদভাবে তালিকা করে। নকল পাঠালুম চীফ সেক্রেটারি ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়কে। ফর্দের মধ্যে ছিল কাপড়, জামা, শাড়ি, কম্বল, বিছানার চাদর, অন্যান্য ধরনের কাপড়, শতরঞ্চি, রান্নার হাঁড়িকুঁড়ি, বাসন, বালতি, ড্রাম, মগ, স্নানাদি-শৌচকার্যের জন্য অন্যান্য উপকরণ, শেলাইয়ের কল, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় নানা-রকম জিনিসপত্র। ক্যাম্পের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র, তারসঙ্গে স্কুল ও ডিস্পেন্সারির প্রয়োজনীয় আসবাব, ঔষধপত্রাদির ফর্দও দেয়া হল। আরো লোক ও কর্মচারি চাইলুম, বিশেষত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, হস্তশিল্প শেখানর শিক্ষক, চিকিৎসক, ধাত্রী, পরিদর্শক। লিখলুম, ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ছয়দিন উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সস্ত্রীক একত্রে ক্যাম্পে থেকে আমি নিজে তদারকি করে সব কিছু চালু করব, অতএব আমার বিশেষ অনুরোধ সমস্ত কিছু যেন ১৯ জানুয়ারির অন্তত এক সপ্তাহ আগে এসে ক্যাম্পে পৌঁছয়।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সেক্রেটারি হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন যেমন উদারহৃদয় তেমন সংবেদনশীল। অনুকম্পা ও দ্রুত কাজ করার জন্য সুবিখ্যাত। আমার রেডিওগ্রাম পেয়ে জামুরিয়া ক্যাম্পের অবস্থা কল্পনা করে তিনি নিশ্চয় বিশেষ বিচলিত হন। নিজের বিভাগকে রাতদিন খাটিয়ে নিজে তদারক করে সব কিছু পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের আদেশ করলেন স্বয়ং ক্যাম্পে যেতে। একজন ছিলেন প্রৌঢ়া মিসেস মিত্র, অন্যজন মধ্যবয়সী, মিসেস গুপ্ত, ১০ ও ১১ জানুয়ারি পর পর বর্ধমানে এসে আমাকে জানালেন, কী কী ব্যবস্থা হয়েছে, কী কী জিনিস তাঁরা পাঠিয়েছেন বা পাঠাচ্ছেন। বললেন, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, মেট্রন, পরিদর্শক পাঠাতে আরো কিছুদিন লাগবে। সে বিলম্ব অবশ্য ন্যায্য।

১৯ জানুয়ারি আভা আর আমি সকালে যখন ক্যাম্পে পৌঁছলুম, তখন দেখি সব কিছুই অনেক পরিষ্কার; ব্যস্তসমস্তভাবে কাজ হচ্ছে। নতুন শাড়ি, জামা, কাপড় এসে গেছে, তার সঙ্গে অল্পবয়স্কদের জন্য বোনা পশমের জামা ইত্যাদি ও সকলের জন্য কম্বল। এসেছে অনেকগুলি শেলাইয়ের কল এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল। স্পষ্টই বোঝা গেল, পুনর্বাসনের গুদামে সব মালই মজুত ছিল, অথবা কেনার টাকাও মঞ্জুর করা ছিল, অথচ কাজকর্ম কিছুই হয়নি। আরো দুঃখের বিষয়, যাঁরা এ-বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত, তাঁরা মোটেই তৎপর ছিলেন না, উল্টে উদাসীন ও কর্মবিমুখ ছিলেন বলা যায়, কারণ প্রথম যখন তাঁরা বর্ধমানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন, কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল তাঁরা যেন ঝামেলায় পড়েছেন। ক্যাম্পে শুনলুম, মিসেস মিত্র বা মিসেস গুপ্ত কেউই তার আগে ক্যাম্পে আসেননি। যখন কথামত ক্যাম্পে কয়দিন থাকার জন্য গেলুম তখন সকলেরই মুখে দেখি স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনার হাসি ও কৃতজ্ঞতার চাউনি। বিশেষত তাঁদের মুখে যাঁরা ৪ জানুয়ারি আমাদের উপর সব থেকে বেশী তর্জনগর্জন করেছিলেন। তাঁদের দুরবস্থার কথা আমাকে জানিয়েছিলেন ও নিজের চোখে আমাকে সব কিছু দেখতে বলেছিলেন, বলে তাঁদের ধন্যবাদ জানালুম। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের থাকার জন্য একটি লম্বা গুদামঘরের এককোণে তাঁরা আভা আর আমার জন্য মেঝেতে জায়গা করে দিলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে শোবার ব্যবস্থায় আমরা খুশি হলুম।

যে-দিন পৌঁছলুম, সারাদিন ধরে জোর কাজ হল। বুড় মেয়েরা স্কুল খুলে ক্লাস করার জন্য ব্যস্ত। তাদের মধ্যে প্রায় দশ বারো জন আগে স্কুলে নয় বা দশ

ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল। তাদের বলা হল, যতদিন না পাসকরা শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী আসছেন, ততদিন তাদের ক্লাস ছয় পর্যন্ত পড়াতে হবে। ত্রিপুরার জিরানিয়ায় আগের বছর যা দেখে ও শিখে এসেছি, কাজে লেগে গেল। আরো কয়টি বয়স্ক মেয়ে, যারা অত লেখাপড়া শেখেনি, তাদের কাজ হল ছেলেমেয়ে ধরে এনে ক্লাসে ঢুকিয়ে দেয়া, এবং নজর রাখা তারা যেন ক্লাস থেকে না পালায়। এক থেকে ছয় পর্যন্ত কে কোন ক্লাসে ভর্তি হবে, বড় মেয়েরাই দেখেশুনে পরীক্ষা করে ঠিক করল। পড়াশোনার বই না থাকলেও, বড় মেয়েরাই ক্লাস টীচার সেজে ঠিক করল নিজেরা যা শিখেছে তার থেকে কোনটি কীভাবে শেখাবে। ঝোঁক পড়ল অক্ষর পরিচয়, সরল বাক্য, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, হাতের লেখা, বোর্ডে লিখে সেটি স্লেটে নকল করানো, ইত্যাদির উপর; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ, 'কথামালা'র শিক্ষার ধারায়। তারপর হত সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান, পঞ্চতন্ত্র' থেকে গল্প ও 'কথা ও কাহিনী'র পদ্য আবৃত্তি।

প্রথম দিনেই সকলে মিলে আরেকটি বড় সিদ্ধান্ত নিলুম। যথাসাধ্য সমারোহে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিবস পালিত হবে। সমারোহ শুরু হবে সকালে পতাকা উত্তোলন দিয়ে। এস-ডি-ও, কে-পি মেনন সকালে পতাকা তুলবেন। সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে চারদিক থেকে চারটি ছেলেমেয়ের দল পতাকাদণ্ডের চারপাশে এসে কুচকাওয়াজ করবে। তারপরে হবে ড্রিল ও নানা খেলার প্রতিযোগিতা। উৎসব শেষ হবে সকলে মিলে একসঙ্গে মুড়ি আর মুগের লাড্ডু খেয়ে।

আমরা যে হলে থাকতুম সেটি এবং আরো দুটি হলে দিনের বেলা ছয়টি ক্লাস হত। ২০ জানুয়ারি থেকে ২৩-এর উৎসবের জন্য পুরোদমে তোড়জোড় শুরু হল। সে-আনন্দের স্মৃতি যতদিন বাঁচব মনে থাকবে। আগে কল্পনাই করতে পারিনি মাতৃপিতৃহীন শিশুদের মধ্যে কি সংগঠনশক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে। অভাবে তাদের সৃজন ও সংগঠনশক্তি যেন বাড়ে। ঠিক যেন রূপকথার ফিনিক্স পাখি, ভস্মের মধ্যে থেকে অমিত সৌন্দর্যে জেগে ওঠে পাখা মেলে। শুধু একটু উৎসাহের অপেক্ষা। ছেলেমেয়েরা চারটি কুচকাওয়াজ ব্রিগেড তৈরি করল, নামকরণ হল, লক্ষ্মীবাঈ, শা'নওয়াজ, ঢিলঁ ও সায়গল। ২১ ও ২২ জানুয়ারি তারা সময় করে কুচকাওয়াজ অভ্যাস করল। মোটামুটি ভালই করল। ২৩ জানুয়ারি যার যা ভাল কাপড়জামা ছিল পরল। যে যা পরল, তার উপর যখন প্রত্যেকে ক্যাম্পের মহিলা-দের হাতে কলে-শেলাই-করা দু'ইঞ্চি চওড়া উজ্জ্বল গেরুয়া রঙের কোমরবন্ধ

কোমরে বেঁধে পাশে ফাঁস লাগিয়ে বাঁধল, তখন মনে হল সকলে ইউনিফর্ম পরে জবরদস্ত পেশাদারি সৈনিক হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। প্রথমে ছোট্ট মাঠের চার-কোণে চারদিক আলাদা আলাদা দলে ড্রিল করে তারা কোণাকুণিভাবে এসে ধ্বজস্তম্ভের তলায় চারকোণে তেরছা তীরের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেনন ধ্বজ-স্তম্ভের উপর পতাকা তুললেন। হাওয়ায় পতাকা উঁচু স্তম্ভে গর্বভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কুচকাওয়াজের সমবেত গীত হল : 'কদম কদম বাড়ায়ে যা', তারপরে 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা'। সমারোহ শেষ হল জাতীয় সঙ্গীতে।

বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারা মুড়ি ও মুগের লাড্ডু বিতরণ করলেন। তারপরে শুরু হল খেলার প্রতিযোগিতা, চলল বেলা বারোটা পর্যন্ত। অপরাহ্নে সকলে মিলে আমরা ধ্বজস্তম্ভ ঘিরে একের পর এক দুটি গোল চক্র করে বসে গাইলুম সমবেত সঙ্গীত, তারপর যে যা পারল তামাশা, হাসির গল্প ও ছড়া আবৃত্তি করলে। কারোকে রেহাই দেয়া হল না। সারাদিন নিখুঁতভাবে কাটল।

সরকার ২৩ জানুয়ারির মধ্যে কাজ চালাবার মত ব্যবস্থা করে স্থানীয় জেলা বোর্ড ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে শিক্ষক ও চিকিৎসার কর্মিদের আনিয়ে ক্যাম্পের কাজে লাগিয়ে দিলেন। ২৫ জানুয়ারি দুপুরে আমরা বিদায় নিলুম, কারণ পরের দিন, অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি, আমাকে বর্ধমানে প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে হাজির থাকতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হবার আগে কারিগরি ও হস্তশিক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য সমস্ত শিক্ষকরা তিনমাসের মত প্রশিক্ষার কাঁচা মাল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্যাম্পে যোগ দিলেন। আমার জীবনে এই ছয় দিন হল এক স্মরণীয় কাল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না যে দশবছরে একটি সারা দেশকে দৈনন্দিন সমস্ত কাজের উপযুক্ত লেখাপড়া শিখিয়ে, স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়ে, আমাদের মত নিতান্ত গরীব অবস্থাতেই আট-পৌরে অথচ স্থায়ী ব্যবস্থা করে সাধারণের জীবনমানে যথেষ্ট উন্নতি করা যায়, যার জন্য আমরা জগৎসভায় সকলের কাছে গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি। যখন দুজনে বিদায় নিলুম, সারা ক্যাম্পের অধিবাসী 'আবার আসবেন' বলে আকাশ কাঁপিয়ে দিল। মনে হল ৪ জানুয়ারি যে অন্যায়ের ভাগী হয়েছিলুম, তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছি। আশ্চর্য, জীবনে মানুষ এইভাবে অনেক অপ্রত্যাশিত উপহার অযাচিতভাবে পায়, যার কৃপায় জীবন এত ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে।

একটি ইলেক্ট্রোলাক্স রেফ্রিজারেটর কিনলুম। আমার চাকরি জীবনে এই হল আমার 'বিড়ালের চতুর্থ জীবনপ্রাপ্তি'। তৃতীয় জীবনপ্রাপ্তি হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলের অনশন ধর্মঘটজনিত ঘটনার অবসানে।

২১ জুন থেকে ২৯ অগাস্ট পর্যন্ত ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনারের কাজ করার সময়ে আমি ডাঃ রায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। এই সময়ে আমি রাজ্যের পাঁচসালা পরিকল্পনার পুরো ধারণা পাই। ডি-ভি-সি ও ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি সেচ প্রকল্পের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে পারি। বিদ্যুৎপ্রসার, রাস্তাঘাট, বম্বে প্ল্যান, পরিবহন, হরিণঘাটা দুগ্ধকেন্দ্র ও পশুপালন প্রকল্প, কল্যাণীর বিস্তার, সমুদ্রে মাছ ধরার প্রকল্প, হলদিয়া বন্দরের পত্তন; লবণহ্রদ শহরের প্রতিষ্ঠা; কলকাতা শহর ঘিরে চক্ররেলের ব্যবস্থা; কলকাতার ভূগর্ভে মেট্রো রেল প্রকল্প ইত্যাদি। ৩০ অগাস্ট দে সাহেব পুনরায় কাজে যোগ দিলেন।

পাঞ্জাব ও পেপসু ১৯৫৪

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস বিশেষ সুখে কাটল না। অক্টোবর মাসে দে সাহেব আমাকে পাঠালেন পাঞ্জাব আর পেপ্‌সু (এখনকার হিমাচল প্রদেশ) দেখে আসতে। সঙ্গে দিলেন সুখময় রায় ও মুকুল গুপ্তকে।

পাঞ্জাবে গিয়ে প্রথমেই যা আমাকে মুগ্ধ করে তা হচ্ছে প্রতি জমি-মালিকের পূর্বের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড জমি একলপ্তে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বড় জমি করে দেয়া। একে ইংরেজিতে বলে কন্‌সলিডেশন অভ হোল্ডিংস। এই ব্যবস্থায়, এক নিমেষে চাষের কত যে উন্নতি ও সুবিধা হল বলার নয়। ফসল তোলার পর জমি নতুন করে তৈরি করা থেকে শুরু করে সেই ফসল তোলা পর্যন্ত। চল্লিশ দশকের শেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চাষের মালিকানা জমি একলপ্তে করাই নতুন কৃষিনীতির ফতোয়া। কিন্তু এই ফতোয়ার জিগির পশ্চিমবঙ্গে আদৌ ওঠেনি।

কিন্তু, যে দৃশ্যের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না, এমন-কি মহীশূরে যাবার পরও, তা হল ভারতবর্ষের মত দেশে পাঞ্জাবের সাধারণ গ্রামে সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি। যতদূর চোখ যায় মাঠেঘাটে ফসলের প্রাচুর্যের তো কথাই নেই, মহীশূরে যেমন দূরের আকাশ ছেয়ে বিদ্যুতের তারের সর্বত্র যাতায়াত, পাঞ্জাবে তেমনি সেচের জন্য জলভরা খাল। ব্যক্তিগত স্বাচ্ছল্য ও শ্রীবৃদ্ধির অভাবিত প্রমাণও পেলুম। পাটিয়ালা যোয়ার সময়ে জীপ থামিয়ে সকালে একজন শিখ কৃষকের সঙ্গে আলাপ

করলুম। মনে হল মাঝারি অবস্থার কৃষক। অন্তত তাঁর ঘরবাড়ি, ছোট ট্র্যাক্টর ও গোশালা দেখে তাই মনে হল। দেড় ঘণ্টা ধরে তিনি আগ্রহভরে আমাদের হাঁটিয়ে তাঁর ক্ষেত খামার দেখিয়ে বেড়ালেন। শেষে খুব ভদ্রতা করে একটু চা খেতে বললেন। আমাদেরও চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল, বেলা এগারোটাও বাজে। তাড়াতাড়ি বাড়ির সমুখে নিমগাছের ছায়ায় একটি বড় টেবিল নিজেই এনে পেতে, তার উপরে সাদা দামাস্ক-করা টেবিলের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর আনলেন ঝকঝকে ধোয়ামোছা চায়ের বাসনপত্র, কাঁটাচামচ। খাবার পরিবেশনের আগে এল সদ্য তৈরি করা বড় গ্লাসভর্তি বাড়ির দইয়ে করা মাখনভর্তি লস্‌সি, সেঁকা টোস্ট, অমলেট, সসেজ, বেক্‌ড্ বীন। সঙ্গে বাড়ির তৈরি টাটকা মাখন, ছানা, জ্যাম ও মার্মালেড। তারপর কফি, তাতে মাদ্রাজী কফির মত কফির থেকে দুধই বেশী। যে-ভাবে তিনি ও বাড়ির সকলে সমুখে একে একে সব কিছু সাজিয়ে ধরলেন, ও আদর-যত্ন করলেন, তাতে মনে হল বাড়ির সকলেই এই ধরনের খেতে ও অতিথি আপ্যায়নে সদাই অভ্যস্ত। পাটিয়ালার আগে নীলোখেরি এবং পরে বাটালা, লুধিয়ানা, অমৃতসর ইত্যাদি দেখে আমরা গেলুম পাঠানকোট, কাংড়া, মণ্ডি, কুলু ও মানালি। প্রত্যেক জায়গায় লোকেদের স্বাচ্ছল্য ও সুন্দর অবস্থা-ব্যবস্থা দেখে আমরা মুগ্ধ হলুম। অবাক হলুম মণ্ডি থেকে শুরু করে মানালি পর্যন্ত একের পর এক নানাবিধ ফলের বাগান দেখে। সেরকম সুন্দর ফলন আমি ১৯৩৯-৪০-এ ইংলণ্ডে কটস্‌ওল্ড কাউন্টিগুলিতেও দেখিনি। ফিরতি পথে আমরা একদিনের জন্য চণ্ডীগড়ে থেমে নতুন শহরটি ঘুরে দেখলুম। দেখলুম রাজধানীর ক্যাপিটল অঞ্চল, মন্ত্রী ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর কর্মচারিদের বাড়ি, মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারি, কেরানি ও পিয়নদের পাড়া ও বাসস্থান। বুঝতে পারলুম না কর্বুসিয়েরের মত স্থপতি বিশ শতকের মাঝামাঝি আনকোরা নতুন শহরে নতুন দিল্লীর মত সামাজিক ও সরকারি পদানুসারে ঐ ধরনের ছুঁৎমার্গধর্মী আলাদা আলাদা বাসস্থান অঞ্চল কেন তৈরি করলেন।

১৯৫৪-র ২৮ অক্টোবর যখন পল ম্যানশনে ফিরলুম, জয়তী তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। আমাদের অবর্তমানে শাশুড়ীঠাকরুন পল ম্যানশনে এসে ছিলেন, জয়তীকে দেখাশোনা করার জন্য। আমার ছোটশালা বিশু (পূর্ণেন্দু)-ও প্রায় রাত্রিতে পল ম্যানশনে কাটাত। শাশুড়ীঠাকরুন বললেন সর্বত্র খুব গুজব আমি নাকি ডেভেলাপ-মেন্ট বিভাগ থেকে জেলায় বদলি হয়ে গেছি। কোন্ জেলা বলতে পারলেন না। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে যখন অফিস গেলুম তখন দেখি চীফ সেক্রেটারি জানিয়ে-ছেন, ট্যুর থেকে ফিরলেই যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। যখন তাঁর ঘরে গেলুম,

দেখি মুখে বিরক্তভাব। বিরক্তির গলায় বললেন, সরকার স্থির করেছেন, আমাকে ডেভেলাপমেন্ট বিভাগ থেকে সরিয়ে দেবেন। বললেন, সরকার ঠিক করেছেন বর্ধমান জেলাকে দু'ভাগ করে দুটি জেলা করতে হবে। কিভাবে ভাগ করতে হবে, সুপারিশ করার জন্য আমিই যোগ্যতম ব্যক্তি। কয়েক মাসের মধ্যে আমাকে এ-কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

সরাসরি জিজ্ঞেস করলুম, এতে কি আমার পদের অবনতির হুকুম হল না? বললুম, কেন আমাকে বদলি করা হল, কারণ জানতে চাই না, তবে এই বদলিতে সরকার আমার পদের অবনতি করলেন কিনা সেইটুকু আমি জানতে চাই। বদলি যদি অবনতি হিসাবেই করা হয়ে থাকে, তবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি দিয়ে আমাকে জবাব দেবার সুবিধা দেয়া হোক। আমার চাকরির শর্তানুসারে এই সুযোগ আমার প্রাপ্য অধিকার। রায় আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন, বললেন, অবনতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। জয়েন্ট সেক্রেটারি ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সমান পদবাচ্য। কাগজে কলমে সেটা ঠিক তা আমি জানি, কিন্তু এই ধরনের সমপদ-বাচ্যতা সচরাচর প্রয়োগ হয় না, শাস্তি দেবার সময়েই হয়, নয় কি? কথার মোড় ঘুরিয়ে রায় বললেন, প্রশাসনের উন্নতির জন্য বর্ধমানকে দু'ভাগ করা কত প্রয়োজন, আমার থেকে বেশি আর কে বুঝবে? পাঠকই জানেন, এই উন্নতির কামনায় বর্ধমান এখনও কেঁদে মরছে! বুঝলুম, রায় আগডুম বাগডুম বকছেন, আমি তাঁকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলেছি, আর নয়।

আমার মনোভাব বুঝিয়ে দেবার জন্য, তাঁর কথার পিঠে ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত স্বরে থ্যাঙ্ক ইউ বললুম। তিনি চুপ করে রইলেন। বললুম, ১৯৪৭ অগাস্ট থেকে আমি একদিনও ছুটি না নিয়ে মুখ গুঁজে কাজ করেছি, নতুন কাজে যোগ দেবার আগে আমার কিছু ছুটির প্রয়োজন। আমি দু-মাসের জন্য ছুটির দরখাস্ত করছি, এবং এই প্রশস্ত সময়। প্রত্যুত্তরে তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখে কিছু কথা জুগোল না। আমি চলে গেলুম। মৃগাঙ্কমৌলী বসু ছিলেন গৃহবিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারি। কয়েক-দিন পরে তিনি বললেন, মিঃ দে জেদ ধরেছিলেন, হয় আমাকে পদাবনতির মত দেখাবে এমনভাবে তাঁর দপ্তর থেকে বদলি করা হোক, না হলে তিনি নিজেই আই-সি-এস চাকরি থেকে ইস্তফা দেবেন। দে ছিলেন আমার থেকে দশ বছরের সিনিয়র। আমার মান রাখতে গিয়ে তাঁকে চাকরি থেকে ইস্তফা দেবার অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়। আই-সি-এসের ইস্পাত কাঠামোয় তাতে চিড় ধরবে। সুতরাং খাঁড়ার ঘা আমার উপরেই পড়ল।

বিদায়

পরের দশদিন উন্নয়ন দপ্তরে রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরে বসে জানালার কাছে চেয়ার টেনে আকাশে মেঘ দেখা, আর কেউ যদি ঘরে ঢোকে তার সঙ্গে খোসগল্প করা ছাড়া আমার কোন কাজই রইল না। দপ্তরে হুকুম হয়েছে আমাকে যেন কোন কাগজ বা ফাইল দেয়া বা দেখানো না হয়। আমার ছুটি মঞ্জুরের হুকুম আসছে না বলে আমি দপ্তর ছাড়তে পারছি না। অবশেষে হুকুম এল ৭ নভেম্বর, অর্থাৎ দে সাহেব স্বয়ং গিয়ে সত্যেন রায়কে যখন জানান যে হুকুম তখনও যায়নি, তারপর। এদিন বেলা বারোটায় আমি কাগজে সই করে সেন্সাস অফিসে গিয়ে বসলুম। ৮ নভেম্বর থেকে ছুটি শুরু হল। আমি ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি চেয়েছিলুম, আমার কথা থাকল না, চীফ সেক্রেটারির কথাই রইল। ছুটি মঞ্জুর হল ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। নতুন কাজে যোগদানের জন্য সাতদিন অবসর যোগ করে ২৬ ডিসেম্বর বর্ধমানে পৌঁছতে হবে।

কোন একটি বই লেখায় ডুবে থাকার মত অপমানের জ্বালা ঝেড়ে ফেলার উৎকৃষ্ট উপায় আর দ্বিতীয় নেই। পশুরা যেমন মারামারির পর গায়ের ক্ষত জিভ দিয়ে চেটে চেটে সারায়। এই সময়ে আমার ছোট বই 'পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা' লিখি। কবি কামাক্ষীপ্রসাদের ভাই, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এটি ১৯৫৫ সালের মে মাসে তাঁর 'স্বাক্ষর' সংস্থা থেকে প্রকাশ করেন।

আরোগ্যের একই বিধান দ্বিতীয়বার পালন করি ১৯৬৯ সালে। আমি তখন কেন্দ্রে ইনফর্মেশন ও ব্রডকাস্টিং মন্ত্রণালয়ের সচিব। আমার মন্ত্রীর সঙ্গে আকাশবাণীর প্রচারের নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে গুরুতর মতানৈক্য চলেছে। এ সময়ে মন শান্ত করার জন্য আমার 'দিল্লী ক্যাপিটাল সিটি' বইটি লেখা শুরু করি। এইবারে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে আমার মন্ত্রীকে অন্য মন্ত্রীপদে বদলি করে দিলেন। সাতদিন পরে আমিও অন্য মিনিস্ট্রিতে সেক্রেটারি পদে বদলি হলুম। তবে আমার মনে এইটুকু শান্তি হল যে মন্ত্রী বদলি হবার অন্তত সাতদিন পরে আমি বদলি হই।

১৯৫০-এর সংবিধানবলে প্রাপ্তবয়স্করা ভোটাধিকার পাবার পর ১৯৫২-র ৩ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারাভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। ১৯৫৩-র ২৯ মে এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে: তেনজিং নরগে ও এডমণ্ড হিলারি এভারেস্ট পর্বতের শীর্ষে ওঠেন। এই প্রথম গৌরীশৃঙ্গের পরাজয় ঘটে। ১৯৫৩-র ২৩ জুন

শ্রীনগরে গৃহবন্দীরূপে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যু হয়। মেদিনীপুর ঘূর্ণিঝড়ে ও দুর্ভিক্ষের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন আমার বীরপুরুষ। ১৯৫৪ সালে দেশের স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে মনে পড়ে কল্যাণীতে ১৬ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সভা। ১৯৫৪-র ২৫ জানুয়ারি মানবেন্দ্রনাথ রায় মারা যান।

ঘরের কথা বলতে গিয়ে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত যে-সব আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি আমার মনে দাগ কাটে তাদের কথা বলা হয়নি। ১৯৫১-র ২৭ অক্টোবর উইন্স্টন চার্চিল আবার বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ১৯৫৩-র প্রথম প্রধান ঘটনা হয় ২০ জানুয়ারি ডোয়াইট আইজেনহাওয়ারের আমেরিকার রাষ্ট্রপতিপদে অভিষেক। ১৯৫২ সালে নির্বাচনের সময়ে তাঁর বিষয়ে একটি সুন্দর বর্ণনা রটে : প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসাবে তিনি ছিলেন প্রতিটি আমেরিকান মেয়ের স্বপ্নের স্বামী। তবে ১৯৫৩-র ৫ মার্চে স্টালিনের মৃত্যুই আমাকে সবথেকে বেশী বিচলিত করে। তাঁর মৃত্যুতে হল ইতিহাসের একটি যুগের অবসান। তখন মোটেই ভাবিনি তাঁর মৃত্যুতে সারা বিশ্বময় এত তিক্ততা ও বিরোধের সৃষ্টি হবে। ধারণা ছিল না তাঁর জীবিতকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন কীভাবে শাসিত হত। যত কিছু অত্যাচার-অনাচারের কথা দেশত্যাগী অথবা পার্টিত্যাগী রাশিয়ানরা তার আগে লিখেছেন সবই মনে হত সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনার ফল।

১৯৫৪-র সবথেকে স্মরণীয় ঘটনা হয় কম্যুনিস্ট ভিয়েৎনামের হাতে ফরাসী ডিয়েন বিয়েন ফু'র পতন। তারিখটি ৭ মে, ত্রিপুরা থেকে ফিরে পরের দিনটি আমরা রাজভবনে রবীন্দ্রজন্মতিথি পালন করছি। আবৃত্তিও করলুম 'দামামা ঐ বাজে'। এরপর আসে ১৯৫৪-র ২০ জুলাইয়ে জেনিভায় ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি। চুক্তির ফলে ফ্রান্স উত্তর ভিয়েৎনাম ছেড়ে যায়, প্রতিদানে কম্যুনিস্টরা ছাড়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস। ফ্রান্স কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনামের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করে।

জয়ন্তী

১৯৫৩-র শেষে দার্জিলিং-এর লোরেটো কনভেন্ট থেকে আমরা জয়ন্তীকে ছাড়িয়ে এনে কলকাতার লোরেটো হাউসে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিই। আশা ছিল কলকাতা ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চাকরিটা পাকা হবে, কলকাতা থেকে আর নড়তে হবে না। তখন উন্নয়নবিভাগে খুব হৈচৈ যাচ্ছে, জয়ন্তীর ভর্তি নিয়ে কর্তৃপক্ষের

সঙ্গে দেখা করার ফুরসৎ আমার নেই। অভিমান করে আভা বলল, সে নিজেই ব্যবস্থা করবে। শিক্ষাসচিব ডি-এর সেন, ইওরোপীয় স্কুলগুলির ইন্স্পেকটর ইত্যাদির সঙ্গে বারবার দেখাসাক্ষাৎ করে আভা সব কাগজ ও অনুরোধপত্র জোগাড় করে লোরেটোর মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে দেখা করে ভর্তির আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করেছে, কিন্তু মাদার সুপিরিয়র একটা না একটা ছুতো দেন। এমন সময়ে দেখলুম এখন কিস্তিমাত না করলে আমার মুখ থাকে না। আভার সঙ্গে লোরেটোতে গিয়ে আমার কার্ডটি দিলুম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ে জয়তীর ভর্তির ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল। মাদার সুপিরিয়রের এমন নমনীয়তা দেখে আভা তো রেগে কাঁই। আমি নিমিত্তমাত্র ভাব দেখিয়ে খুব নম্রভাবে কয়েকদিন বাড়িতে ঘুরে বেড়ালুম।

লোরেটো হাউসে এসে মাস-তিনেকের মধ্যে জয়তীর শরীরে ও মনে অনেক পরিবর্তন হল। তখন এগারো বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে। দেখতে দেখতে সে যেন সবদিক দিয়ে বড় ও সাব্যস্ত হল। মায়ের কাছে অঙ্ক কষা শিখে সে অঙ্কেও ভাল হল, সাহিত্যে ও অন্যান্য বিষয়ে আগে থেকেই ভাল করছিল। কয়েকটি বন্ধুও খুব ভাল জুটল, তাদের মধ্যে ছিল ব্যারিস্টার সুবিমল রায়ের কন্যা সুনন্দা রায়, দেশ-প্রিয় যতীন্দ্রমোহনের পৌত্রী কমলিনী, গ্যাংজি পরিবারের নসীম গ্যাংজি, কৃষি-বিশারদ এস-সি রায়ের কন্যা উমা রায় (এখন উমা দাশগুপ্ত), মীরা মিশ্রর মেয়ে রূপা মিশ্র। করুণা হাজরা মহাশয়ের মেয়ে মধুমতী ছিল জয়তীর থেকে বড় ও ক্লাসে উঁচু শ্রেণীতে। তবে শ্রী ও শ্রীমতী হাজরা জয়তীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বলে জয়তীও মধুমতীর প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠল। মধুমতীকে আমি 'মেডো' বলে উল্লেখ করতুম, আর জয়তী ক্ষেপে টং হত। লোরেটোতে শুধু যে পড়াশোনায় তা নয়, পিয়ানো, ভাওলিন, আবৃত্তি, গান ও অপেরার অভিনয়ে ও গানেও বেশ পার-দর্শিতা এল। খুব নাম হল গিলবার্ট ও'সালিভান অপেরার 'মিকাডো'তে অভিনয় করে। তার বিখ্যাত 'টিট্-উইলো' গান গলার কলরাটুরার গুণে স্মরণীয় হয়ে রইল। দ্বিতীয় বিজয়োল্লাস আসে 'বয় গুবার্ট' অপেরায় গুবার্টের চরিত্রে অভিনয় ও গান করে। বড় আপশোষ হয় তখনকার দিনে, ছোট টেপরেকর্ডার চালু হয়নি। সে যাই হোক ১৯৫৪ সালে ফিরে আসা যাক।

এক বছর যেতে না যেতে জয়তীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির আশঙ্কায় আমাদের মন খুবই খারাপ হল। তাছাড়া, একবার বাইরে গেলে কবে কলকাতায় ফিরে আসব তার তো কোন স্থিরতা নেই। আভার মা আমাদের অভয় দিলেন। জয়তীকে এন্টালিতে নিজের বাড়িতে রেখে লোরেটোতে রোজ পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

যা-কিছু অসুবিধায় পড়তুম, তাল পড়ত ওঁর আর আমার ছোট শ্যালক বিশুর ঘাড়ে। এই ভারটি দেবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উপায় নেই। জয়তীর তো পোয়া বারো, মা-বাবার হাত থেকে নিষ্কৃতি! দিদিমার কাছে আদরের সীমা নেই। জয়তীর জন্য শাশুড়ীঠাকুরন একটি রিক্‌শা ঠিক করলেন। রোজ সকালে নিরাপদে পৌঁছে দেবে, স্কুলের শেষে ফিরিয়ে আনবে। রিক্‌শাওলার আনুগত্য ও মেজাজ খুশি রাখার জন্য শাশুড়ীঠাকুরন নিজের হাতে রসগোল্লা তৈরি করে, রোজ বিকেলে জয়তীকে নিয়ে ফিরে এলে, রিক্‌শাওলাকে চায়ের সঙ্গে দুটি রসগোল্লা খেতে দিতেন। অন্য-দিকে এত সুন্দর পল ম্যানশনের ফ্ল্যাট ও সেই সঙ্গে কলকাতার বন্ধুবান্ধবকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবে নিজেকে ছিন্নমূল মনে হল। বিশেষ করে কলকাতায় কবে ফিরব, তার যখন স্থিরতা নেই। সবকিছুই কেমন অনিশ্চিত হয়ে গেল।

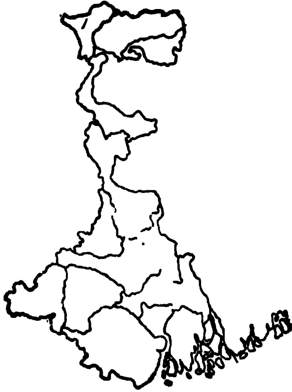
১৯৪৬ সালে জয়তীর বয়স হয় চার বছর। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের বিভীষিকা, তারপর ১৯৪৪-৪৬ সালের আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয় সন্তানের পথে বাধা পড়ে। ১৯৪৬-৪৭ সালে আমার অসুখবিসুখ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সে সাধে আরো বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার উত্তেজনা ও দেশগড়ার নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তিগত দায়িত্ব বাড়ানোর ইচ্ছা স্তিমিত হয়। ১৯৪৯-এর শেষে যখন কলকাতায় এলুম তখন মনে হল দ্বিতীয় সন্তান হলে ভাল হয় কি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এল ভারতীয় টাকার আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাস, তার ফলে সন্তান মানুষ করার খরচে অহেতুক বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দমে গেলুম। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার ফলশ্রুতি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে অসুবিধা আরো বাড়ল। শেষে, ১৯৫৪-এর ডিসেম্বরে কলকাতা থেকে উৎখাত হয়ে বর্ধমানে যখন বদলি হলুম, তখন ভয় হল এই ভবঘুরে জীবনই হয়তো অনিশ্চিতকাল ধরে চলবে। সুতরাং দ্বিতীয় সন্তানের চিন্তা মন থেকে দূর করাই শ্রেয়। জয়তীর বয়স তখন বারো। সন্তান থেকে মানুষ যা-কিছু আশা করে, মনে হল, জয়তী তার সবকিছুই পূর্ণ করবে। উপরন্তু এই আটত্রিশ বছর বয়সে সন্তান হলে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই আমাকে চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে। জয়তী কিন্তু বরাবরই আমাদের ভর্ৎসনা করেছে এবং এখনও করে যে নিতান্ত স্বার্থপর হয়ে তাকে আমরা ভাই বা বোন থেকে বঞ্চিত করেছি।

যা হবার যখন হয়েছে, তখন ভালর দিকটা ভেবে নিজেকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করলুম। কলকাতা থেকে বর্ধমান মাত্র বাহাত্তর মাইল দূরে, এবং সে পর্যন্ত রাস্তাও খুব ভাল। জ্যাক গ্রে আমার ফ্ল্যাটটি নিলেন, সুতরাং আশা হল তিনি চলে যাবার

আগে যদি কলকাতায় ফিরে আসি, ফ্ল্যাটটি হয়তো ফিরে পাব। বর্ধমান আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ। সেখানে আমার ছেলেবেলাও কাটে, বড় হই। সেখানকার বন্ধুবান্ধব আমাকে পেয়ে হয়তো খুশি হবে। আসানসোল শিল্পে ও অন্যান্য সুব্যবস্থায় ফেঁপে ফুলে উঠেছে, সে অঞ্চলেও নিশ্চয় ভাল বন্ধুবান্ধব পাব। উপরন্তু বর্ধিষ্ণু জেলায় দুর্ভিক্ষ বা খরার আশঙ্কা নেই। আভা আমাকে সাহস জোগালো, যদিও বুঝতুম জয়তীকে ছেড়ে যেতে তার কত কষ্ট হবে। তার উপর যে-বাড়ি সে এত সুন্দর করে নিজের হাতে পরিপাটি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে একনাগাড়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর ছিল, সে-বাড়ির মায়া এককথায় ছেড়ে যাওয়া সহজ নয়। সবথেকে কষ্ট হল, বাড়ির দুজন অত্যন্ত ভাল ও কাজের পরিচারকদের বিদায় দিতে। যদি ফিরে আসি, তাদের কি আবার ফিরে পাব? মনে মনে বললুম 'ভইলা' : অর্থাৎ সেই হল কথা।

পড়া ও ওঠা : বর্ধমান, কলকাতা, হাওড়া ১৯৫৫

বর্ধমানে গমন



১৯৫৪-এর ২৬ ডিসেম্বর ভোরে যখন নিজেদের গাড়ি চালিয়ে বর্ধমানের পথে রওনা হলুম, সংকল্প করলুম, জীবনে প্রথম জেলায় যে আগ্রহে কাজ করতে গেছলুম, বর্ধমানেও যেন একই আগ্রহে কাজ শুরু করি। নিজেকে বললুম, বুকে নালিশ নিয়ে মনখারাপ করা পরাজয়ের চিহ্ন। শাস্তিকে জয়ের টীকা হিসাবে নেয়াই উচিত, বিশেষত যেখানে আমি কোন অপরাধ করিনি, বিবেকানুযায়ী কাজ করেছি। প্রফুল্লমনে নতুন কাজ উৎসাহের সঙ্গে করলে যাঁরা আমাকে শাস্তি দিয়েছেন তাঁদের বিবেকে আঘাত দেয়া হবে, বিশেষত সেইসব সহকর্মীকে যাঁরা শাস্তি পেয়েছি বলে আমাকে এড়িয়ে যাবেন। ২৭ ডিসেম্বর সকালে কালেক্টরেটে গিয়ে আমি যখন কাজে যোগ দিলুম তখন যাঁরই সঙ্গে দেখা হয় অত্যন্ত স্নেহ ও আন্তরিকতা দেখিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, বহুদিন ধরে কোন আই-সি-এস অফিসার তাঁদের জেলায় আসেননি, অন্তত স্বাধীনতার পরে তো নয়ই। সকলের মুখে খুশিভাব দেখলুম, বুঝলুম লোকের মনে আই-সি-এস কথাটি কত সমীহ আনে। উপরন্তু আমি যে অল্প-বয়সে এই জেলায় মানুষ হয়েছি, স্কুলে পড়েছি, এবং জেলার যাকে বলে জামাই, সে কারণগুলিও আমার স্বপক্ষে গেল। ফলে আমার মুখের তিক্তস্বাদ চলে গেল।

১৯৫২ সালের নির্বাচনে বর্ধমানের মহারাজা প্রথম হেরে যান। ফলে তিনি শহরে বেশী আসতেন না, কলকাতাতেই বেশীর ভাগ থাকতেন। রাজবাড়িতে গিয়ে আভা আর আমি তাঁর ও মহারানীর উদ্দেশে আমাদের কার্ড রেখে এসেছি জেনে খুশি হলেন। সরকারের অনুমোদিত আচরণবিধি অনুসারে বর্ধমানের মহারাজা ও মহারানীই একমাত্র দম্পতি ছিলেন যাঁদের উদ্দেশে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর স্ত্রী

স্বয়ং গিয়ে কার্ড রেখে আসার নির্দেশ ছিল। বর্ধমানের মহারাজার হাতে ছাত্রাবস্থায় আমি স্কুলের প্রাইজ নিই। তবে আমরা বর্ধমান যাওয়াতে যিনি সবথেকে খুশি হয়েছিলেন মনে হল তিনি সন্তোষকুমার বসু। বয়স তখন আশি পেরিয়ে গেছে। আমি যখন বর্ধমান টাউন স্কুলে পড়তুম তখন তিনিও একবার আমার হাতে প্রাইজ দেন। আমার সময়ে বর্ধমানের গোলাপবাগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। মধ্যবয়সে স্ত্রীবিয়োগ হয়, প্রৌঢ় বয়সে তাঁর মার যখন রোগ হয় তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে নিজের হাতে শুশ্রূষা করেন। সেই থেকে সারাদিন না-খাওয়া অভ্যাস হয়ে যায়। সকালে দুপুরের কিছু আগে বড় দেড় কাপ কফি খেতেন, সারাদিন আর কিছু খেতেন না, রাত্রে আটটার সময়ে পেটভরে খেতেন।

'ওরা যে আমাকে চায়' কল্পনা করে আমার খুব ভাল লাগল। ১৯৫৫-র ১ জানুয়ারির মধ্যে অর্থাৎ চারদিনে আমার মনের ক্ষত সেরে গেছে মনে হল। ঐ-দিন সকালে বর্ধমানের বিরাট কালেক্টরেটের ঘরে গিয়ে প্রত্যেক কর্মিকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালুম।

তার দু'দিন আগে, অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর আমি আসানসোলের এস-ডি-ও কে-পি-এ মেননকে ফোন করে বলি আমি ৪ জানুয়ারি আসানসোলে পৌঁছে পরের চারদিন সেখানে থাকব। থাকব ইন্‌স্পেক্‌শন বাংলায়। প্রতিদিন সকালে মহকুমার যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তাঁরই সঙ্গে আলাপ করব। আসানসোল তখন বিরাট শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আসান-সোলকে পশ্চিমবঙ্গের রূঢ় (Ruhr) বলে অভিহিত করতে ভালবাসতেন। আমার মতলব ছিল প্রতিটি বড় শিল্পসংস্থার মুখ্য পরিচালকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করা। ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে সংকটমুহূর্তে দু'পক্ষের সুবিধা হয়। বলা বাহুল্য আসানসোলে সংকট বা দুর্ঘটনা প্রায় লেগেই থাকত, হয় কারখানায় না-হয় কয়লাখনিতে।

একটানা চারদিন আসানসোলে থাকার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। আইভান সুরিটার কাছে শুনেছিলুম আমার কমিশনারের একটি বাতিক ছিল : কী করে তাঁর অধীনের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের ট্যুরের বিল কম করানো যায়। অন্য সব ব্যাপারেই তিনি 'মাইডিয়ার' লোক। তাছাড়া, কোন অফিসার যদি বিপাকে পড়ে, তার হয়ে লড়তে, ছিল তাঁর বিশেষ অনিচ্ছা। তাতে আমার আপত্তি নেই, সে বিষয়ে জীবনে আমার আগে থেকেই অভিজ্ঞতা আছে। ট্যুর বিলের ব্যাপারে আইভান নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলল। কমিশনার ভদ্রলোক ১৯৩৮ সালে বর্ধমানের

ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আইভান যখন ১৯৫০-এ বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট. একমাসে সে চারবার আসানসোলে যায়। তিনি আইভানকে লিখলেন, তিনি যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন আসানসোলে বলে পাঠাতেন, অনেকগুলি কাজ যেন একত্রে পরের পর জমিয়ে রাখে, যার ফলে তিনি আসানসোলে মাসে কি ছয় সপ্তাহে একবার গিয়ে, একনাগাড়ে কয়েকদিন থেকে সব কাজ একলপ্তে সেরে আসতে পারেন। এতে সময় ও সরকারের টাকা দুইই বাঁচত। আইভান উত্তরে লিখল, কমিশনার যদি আরেকবার তার ট্যুর ডায়েরি দেখেন. দেখতে পাবেন, আইভান আগের মাসে প্রথম যখন আসানসোলে যায় তার ঠিক আগে দিশের-গড়ে দাঙ্গা হয়ে গেছে; দ্বিতীয়বার যখন যায়, বার্নপুর ইস্পাত কারখানায় বিনা নোটিসে আচমকা হরতাল হয়; তৃতীয়বার যখন যায়, জামুরিয়া কয়লাখনিতে বিরাট ধ্বস নেমে অনেক লোক ধ্বসে চাপা ও আটকা পড়ে। সেই মাসেই চতুর্থ-বার যায় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে, তিনি শান্তিনিকেতন যাবার উদ্দেশ্যে পানাগড় হাওয়াই আড্ডায় নামেন। চিঠির শেষে আইভান লেখে, সে আশা করে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনাগুলি যাতে সব একত্রে বা পরপর ঘটে কমিশনার তার ব্যবস্থা করবেন। এর উত্তরে কমিশনারের তরফ থেকে এল নীরবতা।

৩ জানুয়ারি সকালে কমিশনার হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে হাজির। ৪-৫ তারিখে ধানবাদে একটি মিটিং ছিল তারই পথে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপদেশ দিলেন বার্নপুরের ইস্পাত কারখানার ম্যানেজার মিঃ ম্যাকক্রাকেনের উপর আমি যেন 'কল' করি, অর্থাৎ কার্ড রেখে আসি। বললেন, ম্যাকক্রাকেনের ভীষণ প্রতিপত্তি। সার বীরেন মুখার্জি তাঁর হাতে খান, ওদিকে ডাঃ রায় সার বীরেনকে খুব খাতির করেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম বর্ধমানের মহারাজাই কি জেলায় একমাত্র ব্যক্তি নন যাঁর উপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম 'কল' করার কথা? কমিশনার বললেন, তে হি নো দিবসা গতাঃ।

৫ থেকে ৮ জানুয়ারির প্রতি সকালে অনেকে এলেন। মেনন আগে থেকে সকলের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছিলেন প্রতিদিন কোন্ ছয় সাতজন একে একে আসবে। এইভাবে দিনে মোটামুটি কুড়ি-বাইশজন ভদ্রলোক প্রতি সকালে এসে দেখা করতেন। একে একে ছয়-সাতজন জড়ো হলেই ঘণ্টাখানেক ধরে বৈঠকী আড্ডার মত হত। বাংলার হাতায় একটি বড় অশ্বত্থগাছের তলায় টেবিল-চেয়ার পেতে বসার ব্যবস্থা হত। আসানসোলের শীতের পক্ষে আদর্শ ব্যবস্থা। আমরা চা কিংবা কফি দিতুম। ভালই কাটল। প্রথম দিনে প্রথম অতিথিদের মধ্যে ম্যাকক্রাকেন

ছিলেন। সব থেকে মনে ছাপ পড়ল কুলটি কারখানার প্রধান ম্যানেজারকে দেখে। বেঁটেখাটো একজন স্কটস্‌ম্যান, কোমরের মাপ বোধহয় চুয়াল্লিশ, ছেচল্লিশ ইঞ্চি। কথায় চড়া ব্রোগ টান। কুলটিতে বিশ বছরের বেশী কাটিয়েছেন, অর্থাৎ কারখানা স্থাপনার প্রথম থেকেই আছেন। চেহারায় সবথেকে উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল তাঁর প্রকাণ্ড, মোটা পেঁয়াজের রঙের নাকটি। ঘন বেগ্‌নি সরু সরু শিরে সারা নাক চিত্রিত। কত বছর ধরে কত শত শত গ্যালন বিয়ার খেলে তবে ঐ ধরনের বিচিত্র উদ্ভাস ও রূপান্তর হয়, ভাবলে এখনও অবাক লাগে।

জামুরিয়ার উদ্বাস্তু শিবির

৪ জানুয়ারি বর্ধমান থেকে অপরাহ্ণে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসান-সোলে আসার সময়ে সত্যই খুব ঠাণ্ডা ছিল। তোপোসি ও জামুরিয়া রোডের মোড়ের কাছাকাছি গাড়ি পৌঁছেছে এমন সময়ে হঠাৎ দেখি একদল মহিলা ও অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে রাস্তার মাঝে ভিড় করে আছে। পরনে মলিন কাপড়, শীতের মোটেই উপযোগী নয়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। শুনেছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিকালে এই পথে আসানসোল যাবেন তাঁর জন্যই অপেক্ষা। তাদের মধ্যে অনেক ষোল থেকে আঠারো বছর বয়সের অবিবাহিতা মেয়ে ছিল। একেবারে কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যস্থলে, চারদিকে কয়লাখনি মজুরদের লাইন বা বাসস্থান, কোন-মতেই মহিলা বা অল্পবয়সী মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ স্থান বলা যায় না। গাড়ি থামিয়ে নেমে সমুখের দুজন বয়স্থা মহিলাকে বললুম, আমিই সেই লোক। ততক্ষণে সারা ভীড়ে সজোরে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। মহিলা ও ছেলেমেয়েদের পরনে বলতে গেলে শতছিন্ন বস্ত্র। এদিকে আমার গায়ে মোটা পুলোভার আর হ্যারিস টুইডের জ্যাকেট। নিজেকে এমন গর্দভ মনে হচ্ছিল বলার নয়।

রাস্তার কিছু ভিতরে, রেলওয়ে সাইডিং-এর ধারে, খোলা মাঠে, চারদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা কয়েকটি বড় টিনের চাল দেয়া মাল রাখার খালি গুদাম। সেই ঘেরা এলাকায় ও গুদামগুলিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত নিরাশ্রয় অভিভাবকহীন বিধবা, উদ্বাস্তু নারীদের, তাদের পুত্রকন্যাসহ, বলা যায় পুরে রাখা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, কাঁটাতারের বেড়া চারদিকের গুণ্ডাদের কৌতুহলের বিরুদ্ধে বিশেষ নিরাপত্তা দেয় না। সারা ক্যাম্পে মোটামুটি শ'খানেক বয়স্থা নারী বা বিধবা, এবং তার দু'গুণ-সংখ্যক নাবালক ছেলেমেয়ে আছে। মেয়েদের বয়স, আগেই

বলেছি, অধিকাংশই ষোল থেকে আঠারো। ক্যাম্পে সবসুদ্ধ আট কি নয়জন বিভিন্ন বয়সের পুরুষ পরিচারক ও পরিচালক হিসাবে ছিল। সারা ক্যাম্পে মাত্র দু'জন মহিলা পরিদর্শক ছিলেন।

মহিলারা আমাকে ও আভাকে জোর করে কিছুক্ষণের জন্য ক্যাম্পের ভিতর নিয়ে গেলেন। যে-অবহেলায় আছেন বলতে গিয়ে মনের সমস্ত দুঃখ ও ক্ষোভ যেন ফেটে পড়ল। দুজনে ক্যাম্পের প্রতিটি গুদাম, রান্নাঘর, স্নানের জায়গা, পায়খানা, নামমাত্র স্কুল ও ডিস্পেন্সারি ঘুরে ঘুরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটালুম। অধিকাংশ ব্যবস্থা নামমাত্র, পাকা ব্যবস্থা বলে কিছু নেই, সবই যেন ভেঙে পড়ছে, ব্যবহারের অযোগ্য। কোথাও কোন আব্রু নেই, চতুর্দিক থেকে সব কিছু দেখা যায়। ওখানে বাস করতে নিশ্চয় সর্বদা গা ছমছম করে।

শীঘ্রই আবার আসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় চাইলুম। বললুম ইতিমধ্যে সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করব। মুখের কাঁচুমাচু অপরাধীভাব দেখে সাহস পেয়ে তাঁরা বললেন, ওসব ধাপ্পা এত-দিন ধরে তাঁরা অনেক শুনেছেন। আরো আধঘণ্টা ধরে মনের ঝাল মিটিয়ে তাঁরা সরকারের বাপান্ত করে বুঝলেন, আর আমাদের আটকে রাখা বৃথা। যেতে দিলেন।

যেদিন আসানসোল পৌঁছলুম, সেদিন রাত্রে খাবার পর মেননের সঙ্গে বসে পুনর্বাসন সেক্রেটারি হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি বড় রেডিওগ্রাম পাঠালুম। ক্যাম্পটির জন্য কী কী, কত সংখ্যায়, কত পরিমাণে প্রয়োজন বিশদভাবে তালিকা করে। নকল পাঠালুম চীফ সেক্রেটারি ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়কে। ফর্দের মধ্যে ছিল কাপড়, জামা, শাড়ি, কম্বল, বিছানার চাদর, অন্যান্য ধরনের কাপড়, শতরঞ্চি, রান্নার হাঁড়িকুঁড়ি, বাসন, বালতি, ড্রাম, মগ, স্নানাদি-শৌচকার্যের জন্য অন্যান্য উপকরণ, শেলাইয়ের কল, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় নানা-রকম জিনিসপত্র। ক্যাম্পের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র, তারসঙ্গে স্কুল ও ডিস্পেন্সারির প্রয়োজনীয় আসবাব, ঔষধপত্রাদির ফর্দও দেয়া হল। আরো লোক ও কর্মচারি চাইলুম, বিশেষত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, হস্তশিল্প শেখানর শিক্ষক, চিকিৎসক, ধাত্রী, পরিদর্শক। লিখলুম, ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ছয়দিন উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সস্ত্রীক একত্রে ক্যাম্পে থেকে আমি নিজে তদারকি করে সব কিছু চালু করব, অতএব আমার বিশেষ অনুরোধ সমস্ত কিছু যেন ১৯ জানুয়ারির অন্তত এক সপ্তাহ আগে এসে ক্যাম্পে পৌঁছয়।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সেক্রেটারি হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন যেমন উদারহৃদয় তেমন সংবেদনশীল। অনুকম্পা ও দ্রুত কাজ করার জন্য সুবিখ্যাত। আমার রেডিওগ্রাম পেয়ে জামুরিয়া ক্যাম্পের অবস্থা কল্পনা করে তিনি নিশ্চয় বিশেষ বিচলিত হন। নিজের বিভাগকে রাতদিন খাটিয়ে নিজে তদারক করে সব কিছু পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের আদেশ করলেন স্বয়ং ক্যাম্পে যেতে। একজন ছিলেন প্রৌঢ়া মিসেস মিত্র, অন্যজন মধ্যবয়সী, মিসেস গুপ্ত, ১০ ও ১১ জানুয়ারি পর পর বর্ধমানে এসে আমাকে জানালেন, কী কী ব্যবস্থা হয়েছে, কী কী জিনিস তাঁরা পাঠিয়েছেন বা পাঠাচ্ছেন। বললেন, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, মেট্রন, পরিদর্শক পাঠাতে আরো কিছুদিন লাগবে। সে বিলম্ব অবশ্য ন্যায্য।

১৯ জানুয়ারি আভা আর আমি সকালে যখন ক্যাম্পে পৌঁছলুম, তখন দেখি সব কিছুই অনেক পরিষ্কার; ব্যস্তসমস্তভাবে কাজ হচ্ছে। নতুন শাড়ি, জামা, কাপড় এসে গেছে, তার সঙ্গে অল্পবয়স্কদের জন্য বোনা পশমের জামা ইত্যাদি ও সকলের জন্য কম্বল। এসেছে অনেকগুলি শেলাইয়ের কল এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল। স্পষ্টই বোঝা গেল, পুনর্বাসনের গুদামে সব মালই মজুত ছিল, অথবা কেনার টাকাও মঞ্জুর করা ছিল, অথচ কাজকর্ম কিছুই হয়নি। আরো দুঃখের বিষয়, যাঁরা এ-বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত, তাঁরা মোটেই তৎপর ছিলেন না, উল্টে উদাসীন ও কর্মবিমুখ ছিলেন বলা যায়, কারণ প্রথম যখন তাঁরা বর্ধমানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন, কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল তাঁরা যেন ঝামেলায় পড়েছেন। ক্যাম্পে শুনলুম, মিসেস মিত্র বা মিসেস গুপ্ত কেউই তার আগে ক্যাম্পে আসেননি। যখন কথামত ক্যাম্পে কয়দিন থাকার জন্য গেলুম তখন সকলেরই মুখে দেখি স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনার হাসি ও কৃতজ্ঞতার চাউনি। বিশেষত তাঁদের মুখে যাঁরা ৪ জানুয়ারি আমাদের উপর সব থেকে বেশী তর্জনগর্জন করেছিলেন। তাঁদের দুরবস্থার কথা আমাকে জানিয়েছিলেন ও নিজের চোখে আমাকে সব কিছু দেখতে বলেছিলেন, বলে তাঁদের ধন্যবাদ জানালুম। অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের থাকার জন্য একটি লম্বা গুদামঘরের এককোণে তাঁরা আভা আর আমার জন্য মেঝেতে জায়গা করে দিলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে শোবার ব্যবস্থায় আমরা খুশি হলুম।

যে-দিন পৌঁছলুম, সারাদিন ধরে জোর কাজ হল। বড় মেয়েরা স্কুল খুলে ক্লাস করার জন্য ব্যস্ত। তাদের মধ্যে প্রায় দশ বারো জন আগে স্কুলে নয় বা দশ

ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল। তাদের বলা হল, যতদিন না পাসকরা শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী আসছেন, ততদিন তাদের ক্লাস ছয় পর্যন্ত পড়াতে হবে। ত্রিপুরার জিরানিয়ায় আগের বছর যা দেখে ও শিখে এসেছি, কাজে লেগে গেল। আরো কয়টি বয়স্ক মেয়ে, যারা অত লেখাপড়া শেখেনি, তাদের কাজ হল ছেলেমেয়ে ধরে এনে ক্লাসে ঢুকিয়ে দেয়া, এবং নজর রাখা তারা যেন ক্লাস থেকে না পালায়। এক থেকে ছয় পর্যন্ত কে কোন ক্লাসে ভর্তি হবে, বড় মেয়েরাই দেখেশুনে পরীক্ষা করে ঠিক করল। পড়াশোনার বই না থাকলেও, বড় মেয়েরাই ক্লাস টীচার সেজে ঠিক করল নিজেরা যা শিখেছে তার থেকে কোনটি কীভাবে শেখাবে। ঝোঁক পড়ল অক্ষর পরিচয়, সরল বাক্য, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, হাতের লেখা, বোর্ডে লিখে সেটি স্লেটে নকল করানো, ইত্যাদির উপর ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ, 'কথামালা'র শিক্ষার ধারায়। তারপর হত সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান, পঞ্চতন্ত্র' থেকে গল্প ও 'কথা ও কাহিনী'র পদ্য আবৃত্তি।

প্রথম দিনেই সকলে মিলে আরেকটি বড় সিদ্ধান্ত নিলুম। যথাসাধ্য সমারোহে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিবস পালিত হবে। সমারোহ শুরু হবে সকালে পতাকা উত্তোলন দিয়ে। এস-ডি-ও, কে-পি যেমন সকালে পতাকা তুলবেন। সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে চারদিক থেকে চারটি ছেলেমেয়ের দল পতাকাদণ্ডের চারপাশে এসে কুচকাওয়াজ করবে। তারপরে হবে ড্রিল ও নানা খেলার প্রতিযোগিতা। উৎসব শেষ হবে সকলে মিলে একসঙ্গে মুড়ি আর মুগের লাড্ডু খেয়ে।

আমরা যে হলে থাকতুম সেটি এবং আরো দুটি হলে দিনের বেলা ছয়টি ক্লাস হত। ২০ জানুয়ারি থেকে ২৩-এর উৎসবের জন্য পুরোদমে তোড়জোড় শুরু হল। সে-আনন্দের স্মৃতি যতদিন বাঁচব মনে থাকবে। আগে কল্পনাই করতে পারিনি মাতৃপিতৃহীন শিশুদের মধ্যে কি সংগঠনশক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে। অভাবে তাদের সৃজন ও সংগঠনশক্তি যেন বাড়ে। ঠিক যেন রূপকথার ফিনিক্স পাখি, ভস্মের মধ্যে থেকে অমিত সৌন্দর্যে জেগে ওঠে পাখা মেলে। শুধু একটু উৎসাহের অপেক্ষা। ছেলেমেয়েরা চারটি কুচকাওয়াজ ব্রিগেড তৈরি করল, নামকরণ হল, লক্ষ্মীবাঈ, শা'নওয়াজ, ঢিলঁ ও সায়গল। ২১ ও ২২ জানুয়ারি তারা সময় করে কুচকাওয়াজ অভ্যাস করল। মোটামুটি ভালই করল। ২৩ জানুয়ারি যার যা ভাল কাপড়জামা ছিল পরল। যে যা পরল, তার উপর যখন প্রত্যেকে ক্যাম্পের মহিলা-দের হাতে কলে-শেলাই-করা দু'ইঞ্চি চওড়া উজ্জ্বল গেরুয়া রঙের কোমরবন্ধ

কোমরে বেঁধে পাশে ফাঁস লাগিয়ে বাঁধল, তখন মনে হল সকলে ইউনিফর্ম পরে জবরদস্ত পেশাদারি সৈনিক হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। প্রথমে ছোট মাঠের চার-কোণে চারদিক আলাদা আলাদা দলে ড্রিল করে তারা কোণাকুণিভাবে এসে ধ্বজস্তম্ভের তলায় চারকোণে তেরছা তীরের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। যেমন ধ্বজ-স্তম্ভের উপর পতাকা তুললেন। হাওয়ায় পতাকা উঁচু স্তম্ভে গর্বভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কুচকাওয়াজের সমবেত গীত হল : 'কদম কদম বাড়ায়ে যা', তারপরে 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা'। সমারোহ শেষ হল জাতীয় সঙ্গীতে।

বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারা মুড়ি ও মুগের লাড্ডু বিতরণ করলেন। তারপরে শুরু হল খেলার প্রতিযোগিতা, চলল বেলা বারোটা পর্যন্ত। অপরাহ্নে সকলে মিলে আমরা ধ্বজস্তম্ভ ঘিরে একের পর এক দুটি গোল চক্র করে বসে গাইলুম সমবেত সঙ্গীত, তারপর যে যা পারল তামাশা, হাসির গল্প ও ছড়া আবৃত্তি করলে। কারোকে রেহাই দেয়া হল না। সারাদিন নিখুঁতভাবে কাটল।

সরকার ২৩ জানুয়ারির মধ্যে কাজ চালাবার মত ব্যবস্থা করে স্থানীয় জেলা বোর্ড ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে শিক্ষক ও চিকিৎসার কর্মিদের আনিয়ে ক্যাম্পের কাজে লাগিয়ে দিলেন। ২৫ জানুয়ারি দুপুরে আমরা বিদায় নিলুম, কারণ পরের দিন, অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি, আমাকে বর্ধমানে প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে হাজির থাকতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হবার আগে কারিগরি ও হস্তশিক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য সমস্ত শিক্ষকরা তিনমাসের মত প্রশিক্ষার কাঁচা মাল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্যাম্পে যোগ দিলেন। আমার জীবনে এই ছয় দিন হল এক স্মরণীয় কাল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না যে দশবছরে একটি সারা দেশকে দৈনন্দিন সমস্ত কাজের উপযুক্ত লেখাপড়া শিখিয়ে, স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়ে, আমাদের মত নিতান্ত গরীব অবস্থাতেই আট-পৌরে অথচ স্থায়ী ব্যবস্থা করে সাধারণের জীবনমানে যথেষ্ট উন্নতি করা যায়, যার জন্য আমরা জগৎসভায় সকলের কাছে গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি। যখন দুজনে বিদায় নিলুম, সারা ক্যাম্পের অধিবাসী 'আবার আসবেন' বলে আকাশ কাঁপিয়ে দিল। মনে হল ৪ জানুয়ারি যে অন্যায়ের ভাগী হয়েছিলুম, তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছি। আশ্চর্য, জীবনে মানুষ এইভাবে অনেক অপ্রত্যাশিত উপহার অযাচিতভাবে পায়, যার কৃপায় জীবন এত ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে।

বর্ধমানে ঘোরাঘুরি : বার্নপুর

বর্ধমান জেলার কালেক্টররা মফঃস্বলে ঘোরার সময়ে বহুদিন সুইস কটেজ তাঁবু ব্যবহার করেননি বোঝা গেল। নাজিরখানায় একটিও সুইস কটেজ তাঁবু এবং তার সংলগ্ন পরিজনদের জন্য পাল তাঁবু ছিল না। শেষ যে অফিসার তাঁবু নিয়ে ঘুরেছেন, নথিতে পাওয়া গেল, তিনি কে-এ-এল হিল, সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার। তাঁর রিপোর্ট ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। আলিগড় সেণ্ট্রাল জেলে আমি একটি বড় সুইস কটেজ তাঁবু ফরমায়েস দিলুম। তার সঙ্গে পরিজনদের জন্য কয়েকটি আলপাইন বা পাল তাঁবু। খোঁজ নিয়ে জানলুম, বর্ধমানে এমন কোন পিওন নেই, যে তাঁবু কি করে খাটাতে হয় জানে। মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করায় তিনি ওলাম আর মৌলাবক্সকে পাঠিয়ে দিলেন, বর্ধমানের পিওনদের তাঁবু খাটানো ও গুটিয়ে তুলতে হয় শিখিয়ে দিতে।

১৯৪৯-এর শেষে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করি। এই পাঁচ বছরে অর্থাৎ ১৯৫৫-র শুরুতে দেখলুম অনেক কিছুর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪৯ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উন্নয়নের খাতে কোন টাকাই থাকত না। কালেক্টরের নিজস্ব তহবিলে, খয়রাতি বা বিশেষ জরুরী অবস্থার খাতে, সরকার বড়জোর কয়েক শ' টাকা দিতেন, দুঃস্থ বা বিপদ্‌গ্রস্তদের দান করতে। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে দেখলুম, কালেক্টরের দায়িত্ব হল ৩১ মার্চের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নানা স্থানীয় উন্নয়ন ও লোকহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে, যেমন রাস্তার পুল, সেচের খাল, পানীয় জলের কূয়া ও পুষ্করিণী। সেই কাজগুলি সম্পূর্ণ করে বরাদ্দ টাকা খরচের হিসাবসুদ্ধ সমস্ত পাওনা মেটানোর রসিদ তার পনেরো দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ১৫ এপ্রিলের মধ্যে, সরকারের কাছে দাখিল করতে হবে। এই সামান্য হিসাবেই বোঝা যাবে ১৯৫২ সালে প্রারব্ধ পাঁচসালা পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কাজের বহর কত দ্রুত আর কতদিকে বেড়েছিল। জানুয়ারি মাসের শেষ থেকে পরের দুই মাস তাঁবু নিয়ে আভা আর আমি ক্রমাগত কাটোয়া, কালনা ও সদর মহকুমার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। দামোদরের দক্ষিণ দেশে রায়না ও খণ্ডঘোষ থানাও বাদ যায়নি। সেখানে ট্যুরের সময়ে জানলুম, ত্রিশ দশকের শুরুতে অসহযোগ আন্দোলনের পর কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সে দুই থানার কোথাও গত পঁচিশ বছরে যাননি।

১৯৫৪-র অক্টোবর থেকে বার্নপুর ইস্পাত কারখানা 'ঈসকো'য়, যাকে বলে ঘুসঘুসে ধর্মঘট চলেছিল, কখনও কারখানা খোলে, কখনও বন্ধ হয়। সেই সূত্রে সরকার থেকে একটি বিরাট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী বার্নপুরে বরাবরের জন্য মোতায়েন

হয়। বার্নপুরের জেনরল ম্যানেজার, ম্যাকক্রাকেন এমন ভাব দেখাতেন যেন অতো বড় পুলিশবাহিনী তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদার অঙ্গ। আমার অনুরোধে রাজ্যের লেবার কমিশনার ধর্মঘটের ব্যাপারটি নতুন করে খুলে এক মীমাংসায় এলেন। চুক্তির প্রথম ধাপ হিসাবে ইউনিয়ন কারখানার কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে বিনাশর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহার করবে। তাঁর দিক থেকে ম্যাকক্রাকেন কথা দিলেন ট্রেড ইউ-নিয়ন কর্তৃক ধর্মঘট তুলে নেবার পুরো তিনদিন পর, চতুর্থ দিন বেলা ১২টার সময়ে চারজন বরখাস্ত-করা কর্মিকে কাজে পুনর্বহাল করবেন, যাতে মনে হয় ধর্মঘট তোলার সঙ্গে কর্মি ফেরৎ নেবার কোন সম্পর্ক নেই; কর্তৃপক্ষ সমবেদনাপরবশ হয়ে বরখাস্ত হুকুম প্রত্যাবর্তন করছেন। নির্দিষ্ট সময়ে ইউনিয়ন ধর্মঘট তুলে নিল। চতুর্থ দিনে বিকেলে ইউনিয়ন থেকে আমার কাছে একটি চিঠি এল, ঐ দিন নির্দিষ্ট সময়ে মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে চারজন কর্মিকে কাজে ফেরৎ নেয়া হয়নি। এই পত্র পেয়ে আমার অন্য কোন পথ রইল না। বিশেষ পত্রবাহক মারফৎ ম্যাকক্রাকেনকে একটি শীলমোহর করা চিঠি এই মর্মে পাঠালুম, যে সেদিন রাত বারোটার মধ্যে তিনি ভদ্রলোকের প্রতিশ্রুতিমত নিজের কথা না মান্য করেন, এবং বরখাস্ত কর্মি-দের ফেরৎ নেবার কথা তিনি যদি ভোর ছ'টার মধ্যে স্থানীয় এস-ডি-ওকে লিখিত-ভাবে না জানান তাহলে জেলা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আসানসোলের এস-ডি-ও পরের দিন বেলা বারোটার মধ্যে মোতায়েন করা সব সশস্ত্র পুলিশ তুলে নেবেন। প্রত্যাহারের পর কারখানায় যদি কোন গণ্ডগোল হয় বা লোকজনের নিরাপত্তা বিপন্ন হয় তবে কারখানার কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবেন, এবং মালিকদের নিরাপত্তার থেকে শ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষাই জেলা প্রশাসনের প্রথম কর্তব্য হবে। ম্যাকক্রাকেনকে লেখা চিঠির নকল সেই সঙ্গে একই পত্রবাহকের হাতে মেননের নামে পাঠিয়ে তাঁকে ফোন করে আমার লিখিত নির্দেশের প্রতি শর্ত যাতে মানা হয়, সেই নির্দেশ দিলুম। বললুম পত্রবাহক যখন ম্যাকক্রাকেনের কাছে আমার চিঠি নিয়ে যাবে, সঙ্গে যেন একজন পুলিশ সাব-ইন্স্পেক্টরকে দেয়া হয়।

পরের দিন সকাল ৮টায় মেনন ফোন করে বললেন ম্যাকক্রাকেন আগের রাত্রি ১১টায় চারজন বরখাস্ত শ্রমিকের বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। আরো বললেন, তিনি নিজে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন চারজনই ভোর ছ'টার শিফ্‌টে কাজে যোগ দিয়েছে এবং সবকিছু ঠিক ও শান্ত আছে, এর ফলে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীও আগের মত মোতায়েন আছে।

পরের সপ্তাহে রাইটার্স বিল্ডিংসে কলকাতা থেকে কাজে গেছি; সত্যেন

রায় বললেন, সার বীরেন পুলিশ প্রত্যাহারের হুমকির রাত্রে সাড়ে নটার সময়ে বিচলিত হয়ে ডাঃ বি-সি রায়কে ফোন করে বলেন, ম্যাকক্রাকেন তাঁকে বলেছে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে শাসিয়েছে, রাত বারোটার মধ্যে যদি চুক্তি পালিত না হয় তাহলে সকালে সব পুলিশ সরিয়ে নেবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চয়ই উন্মাদ, না হলে কখনও এরকম কথা বলে! ডাঃ রায় ধৈর্য ধরে সার বীরেনের সব কথা শোনেন, তারপর বলেন তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের কথা শোনাই উচিত। এস-এন রায় আরো বললেন, পরের দিন সার বীরেনের সঙ্গে আগের রাত্রে যে কথাবার্তা হয় ডাঃ রায় সত্যেন রায়কে বলে শেষে বলেন, 'অশোককে কলকাতা থেকে বর্ধমানে নির্বাসন দিলুম, ওখান থেকে ওকে আবার কোথায় নির্বাসনে পাঠাবো তা তো জানি না।'

ভূমিসংস্কার বানচাল

এপ্রিলের শেষে আমি সারা জেলা ঘোরা শেষ করেছি। সরেজমিনে জমিদারী উচ্ছেদ আইনের ফলাফল যা দেখলুম তাতে আগের খণ্ডে যা লিখেছি সেই মতামতই আমার দৃঢ় হল। তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করে হরেকৃষ্ণ কোঙারকে চিঠি লিখলুম। তিনি আসতে বাধ্য নন, চিঠির উত্তর পাইনি। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী তখন বর্ধমানের এম-এল-এ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি তাঁর কিছু কর্তব্যও আছে। চিঠিতে অনুরোধ করায় তিনি এসে দেখা করলেন। স্বভাবসিদ্ধ নম্রতায় বর্গাদার রেজিস্ট্রেশন না-হওয়ার প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন। কয়েকদিন পরে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের নিমন্ত্রণ জানিয়ে আবার লিখলুম। এলেন এবং স্বীকার করলেন বর্ধমানের অধিকাংশ সি-পি-আই সভ্য জোতদার শ্রেণীর, সুতরাং মালিকচাষী। নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধতা করে তারা বর্গা রেজিস্ট্রেশনে আগ্রহী হয়ে অগ্রসর হবে সে আশা করা বোধহয় সঙ্গত হবে না। পার্টি এতগুলি সভ্য হারাতে পারে না। প্রসঙ্গত বলি বিনয় চৌধুরী ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের আত্মীয়-স্বজন ছিলেন বড় মালিকচাষী। মেমারি স্টেশনের প্রায় উপরে ছিল হরেকৃষ্ণবাবুদের ভিটা ও প্রকাণ্ড খামারবাড়ি।

তাঁর সমুখে পরিসংখ্যানের অত্যন্ত সরল যুক্তি তুলে ধরলুম। বর্গা রেজিস্ট্রেশনে সাহায্য না করলে বিধানসভার নির্বাচনে সি-পি-আই কত ভোট হারাতে পারে, আর করলে কত বেশী জিততে পারে। মালিকচাষীর থেকে চাষী-ভাগীদার আর ভূমিহীন মজুরচাষী বা ভাগচাষীর সংখ্যা কত বেশী, সেই হল সহজ হিসাব।

বললুম তাঁকে যে শ্রদ্ধা করতুম এবং এখনও করি তারই জোরে বলছি, ১৯৫২-র নির্বাচনে বর্ধমানের মহারাজাকে যে তিনি হারিয়েছিলেন তা ছিল জমিদারী উচ্ছেদ আইন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের উপহার। বললুম, 'আপনাকে এও বলছি যে আমি ভুল প্রমাণিত হলে আমার থেকে ব্যক্তিগতভাবে এত খুশী আর কেউ হবে না, তবুও আমার আশঙ্কা, আপনার পার্টি যদি এই সহজ স্বচ্ছ যুক্তির বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলে আপনি ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে হেরে যাবেন, এবং আপনার সে পরাজয় হবে আপনার পার্টির উপহার।' বস্তুত, উনি যখন ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে সত্যিই হেরে গেলেন তখন আমি বিশেষ দুঃখ পেয়েছিলুম। ভাগ্যক্রমে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যুক্তফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এল, তার কিছু পরে হরেকৃষ্ণ কোঙার সরকার-অধিকৃত অনেক জমি ভাগচাষী ও ভূমিহীন মজুরদের মধ্যে বিলি করে ১৯৭৭ সালে তাঁর পার্টির জয় কায়েম করেন। ইতিমধ্যে সত্তর দশকের রাজনৈতিক অরাজকতা এবং আশির দশকে বামফ্রন্ট গ্রামে গ্রামে নানা উপায়ে ক্ষমতার আসন পাকা করে, যার ফলে বর্গা রেজিস্ট্রেশন আর মাথা চাড়া দেবার সুযোগ পায়নি।

বর্ধমান ত্যাগ

১৯৫৫-র মে মাসের প্রথম সপ্তাহে—চাকরিতে আমার থেকে নয় বছরের বড়, শ্রী আর-এস ত্রিবেদী—হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর আর আমার মধ্যে তখন পশ্চিমবঙ্গে আর কোন আই-সি-এস অফিসার ছিলেন না যিনি তাঁর পদ অধিকার করতে পারেন। মারা যাবার সময়ে তিনি ছিলেন দুর্নীতিনিরোধ বিভাগের সেক্রেটারি। একজন অফিসারকে হয় ধাক্কা দিয়ে নিচে পাঠানো যায়, নয় উপরে, অথবা বাঁয়ে বা ডাইনে। হিরাক্লাইটাস তো বহুযুগ আগেই বলে গেছেন যে-রাস্তায় উপরে যাওয়া যায় সে-রাস্তায় নিচেও যাওয়া যায়। গতবার ছিল নিচে যাবার পালা, এবার এল উপরে যাবার। আমাকে ত্রিবেদীর শূন্য আসন পূর্ণ করতে আদেশ করা হল, সেই সঙ্গে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসক পদে। নির্বাসনের দিনগুলি আপাতত শেষ হল। আমি কলকাতায় নতুন পদে যোগ দিলুম ১৯৫৫-র ১৭ মে।

কলকাতা ফিরে যাবার নামে যেমন আনন্দ হল, বর্ধমান ছেড়ে যেতে তেমন কষ্টও হল। পুরনো স্কুলের বন্ধু যাদু সামন্ত, আর্য মিত্র, খেলোয়াড় মথুরা দে, টাউন স্কুলের পুরনো মাস্টারমশায়দের মধ্যে চণ্ডীবাবু, সুচাঁদবাবুর সঙ্গে পুনরায়

আলাপ হয়ে পুরনো দিনগুলি যেন ফেরত পেলুম। বর্ধমানে থাকাকালে আমাদের একটি বড় পুরস্কার হল জৌগ্রাম স্টেশনের কাছে কলানবগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দম্পতি শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী সাধনা দেবীর সঙ্গে পরিচয়। গ্রাম-সমাজ ও শিক্ষাউন্নয়নব্রতে দুজনে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। আমাদের অশেষ সৌভাগ্য ১৯৯২ সালেও তাঁরা সমান উদ্যমে সেবাব্রতে উৎসর্গিত। বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে, বিশেষত বাগানে আভা অনেক কিছু ঢেলে সাজায়। কলকাতায় পাঁচবছর চারতলা উঁচু ফ্ল্যাটে বন্দী থাকার ক্ষোভ আভা মিটিয়ে নিল। হাতার মধ্যে দুটি বড় পুকুর ছিল, সে-দুটি ছেঁচিয়ে আভা মাছের পোনা ছাড়ার ব্যবস্থা করে। সমুখের হাতা পরিষ্কার করিয়ে একটি বড় গোলাপ বাগান আর তার সঙ্গে মৌসুমী ফুলের কেয়ারি তৈরি করে। ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির সংলগ্ন সার্কিট হাউসটি এত অন্ধকার ও এলোমেলোভাবে সজ্জিত ছিল যে কলকাতা থেকে কেউ এসে সেখানে রাত কাটাতে সহজে রাজি হতেন না। পূর্ত বিভাগকে বলে সার্কিট হাউসের আমূল সংস্কার করিয়ে, প্রতি ঘরে আরো জানলা ফুটিয়ে, কলকাতার টমলিনের বাড়ি থেকে নতুন আসবাবপত্র ও চাদর-পর্দা আনিয়ে সেটির আকর্ষণ বাড়ানো হয়। নতুন খাট, বিছানা, তোষক, গদি, বালিশও করানো হয়। বাবুর্চিখানা ছাড়া অন্যত্র রান্না বা আগুন জালানো নির্দেশ দিয়ে বন্ধ করা হয়। সে নির্দেশ অমান্য করে একবার এক অত্যন্ত প্রবীণ আই-সি-এস অফিসার শোবার ঘরের টেবিলে স্টোভ জালিয়ে ভাত রান্না করিয়েছিলেন বলে, টেবিলের যে ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি-পূরণ তাঁর কাছ থেকে আদায় করার জন্য আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তাঁরই বিছানার সঙ্গে নতুন ডানলোপিলো বালিশ চলে গেছে, এই তথ্য আবিষ্কার করে, আসানসোলে এস-ডি-ও মেননকে ফোন করে তাঁর বিছানা থেকে সেই বালিশ উদ্ধার করা হয়। এইসব নানা ধরনের কৌতুকপ্রদ ঘটনা না ঘটলে বর্ধমানে আনন্দ উপভোগের হানি হত।

তুচ্ছ অথচ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি ঘটনার কথা না বললে বর্ধমানবাসের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ঘটনাটিকে আপনি হয় কৃপণতা নয় সতর্কতার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন হিসাবে দেখতে পারেন, কীভাবে দেখবেন তা আপনার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। জয়ন্তীকে দেখতে গিয়ে আভা প্রায়ই দিন-দুয়েক করে কলকাতায় তার মায়ের কাছে থেকে আসত। কলকাতা থেকে আমার বন্ধুদের আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। আভা থাকলে কোন অসুবিধাই হত না, আভার অনুপস্থিতিতে বন্ধুবান্ধব এসে পড়লে আমাকে সংসারের ভার নিতে হত। একবার

আভা একনাগাড়ে দিন সাতেক কলকাতা থাকল। সেই সময়ে দুই কিস্তিতে বন্ধুর দল এলেন। তার মধ্যে একপ্রস্থের মধ্যে ছিলেন সমর সেন, তাঁর স্ত্রী সুলেখা, কামাক্ষী, সুনীল জানা ও তাঁর স্ত্রী শোভা, সম্ভবত কামাক্ষীর ভাই দেবীও (সেই-সময়ে আমার বই 'পশ্চিম-ইওরোপের চিত্রকলা' দেবী ছাপাচ্ছিলেন)। যাবার আগে আভা আমাদের মগ বাবুর্চি সুধীরকে ও অন্ধ্র বেয়ারা লছমনকে সংসার ও ভাঁড়ার বুঝিয়ে দিয়ে সুধীরকে বলে যায়, আমি রোজ ভাঁড়ারের চাবি খুলে দেব, সে যেন ভাঁড়ার বার করে নেয়। এবং মাঝে মাঝে সংসার ও বাজার-খরচের হিসাব আমাকে দেয়। আমি রোজ সকালে চা খাবার পর চাবি দিয়ে সুধীরকে ভাঁড়ার বার করতে দিতুম আর বলতুম, দেখো যেন বেশি খরচ না হয়। সেবার সমর, সুনীল, কামাক্ষীরা চলে যাবার পর সুধীরের কাছে বাজার ও ভাঁড়ার খরচের হিসাব লিখতে গিয়ে দেখি ছাপান্নটি ডিমের মধ্যে তিনটি ডিমের হিসাব পাচ্ছি না। সুধীরকে বললুম, কি হল? সুধীর কিছুতে হিসাব মেলাতে না পেরে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'আমরা খেয়ে ফেলেছি।' আভা ফিরে এসে দেখে জিনিসপত্র খুব কম খরচ হয়েছে। এমন-কি সুধীরদের জন্য আলাদা চা ও চিনিও খুব কম খরচ হয়েছে। খায়নি, এই আশঙ্কায় আভা সুধীরকে জেরা করায়, লছমন মুখ নিচু করে অস্ফুটস্বরে বলল, 'মা, সাহেবের খুব হিসেব, আপনি আর কয়দিন দেরি করলে, আমরা কলকাতায় আপনার কাছে চলে যেতুম।' অথচ, আমার বরাবর ধারণা আমার হাত বেশ দরাজ!

আমাদের বরাত খুব ভাল যে কলকাতায় ফিরে এসে কয়েক সপ্তাহ আমরা লী রোডে আর-এস ত্রিবেদী যে বাড়িতে থাকতেন. সে বাড়িতে থাকতে পাই। সে বাড়ি থেকে উঠে আমরা পল ম্যানশনের ২০ নম্বর ফ্ল্যাটে মাসখানেক থাকি। সে সময়ে জ্যাক গ্রে আমেরিকায় ফিরে গেলেন, ফলে আমরা বোধহয় সেপ্টেম্বর মাসে ৮ নং পল ম্যানশন, পুরনো ফ্ল্যাটে ফিরে যাই।

হাওড়া ও দুর্নীতিদমন বিভাগ

১৯৫০-এর মারাত্মক দাঙ্গার সময়ে হাওড়াকে আমি যে চোখে দেখেছিলুম, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসক হিসাবে শহরটি অন্য চোখে দেখলুম। পুরসভার কাজে হাওড়ার কতগুলি নিজস্ব সমস্যা ছিল যা একদিকে কলকাতা অন্যদিকে অন্যান্য ছোট শহরের পুরসভার সমস্যার থেকে ভিন্ন। হাওড়ায় উভয় আকার ও চরিত্রের

পুরসভার নেতিবাচক দোষগুলি সব তো ছিলই, উপরন্তু সেগুলি কয়েকগুণ বেশী করে ছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল, এবং সে প্রতীতি আমার এখন আরো দৃঢ় হয়েছে যে কলকাতা পুবদিকে না বাড়িয়ে ডাঃ রায় যদি হাওড়ার পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মহানগরীটি বাড়াবার ব্যবস্থা করতেন, তাহলে সব-দিক দিয়ে অনেক ভাল হত। ধাপা ও পুবের জলাভূমিগুলি বেঁচে যেত, উপরন্তু হুগলি, মেদিনীপুর, হাওড়া এমন-কি বাঁকুড়া জেলার গ্রামগুলিরও অনেক উন্নতি হত। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা প্রশস্ত হত, উপরন্তু আদি কলকাতা শহরের আশেপাশে জনস্ফীতি কমত। হাওড়ায় আমার দিন শুরু হত সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাস্তাঘাট, ড্রেন ইত্যাদি কতখানি পরিষ্কার হয়েছে তাই পরিদর্শন করে, তারপর বেলা এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত হাওড়া পুরসভার যাবতীয় বিভাগের হিসাবপত্র দেখে। সপ্তাহে দুদিন এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত নানারকম পৌর-সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলা শুনতে হত। মাঝে মাঝে মজার মজার অভিযোগ চিত্রবৎ ভাষায় উকিলরা ব্যক্ত করতেন। একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। দুই বাড়ির মধ্যস্থিত দূষিতজল-নিকাশের নালিটি বন্ধ করার অভিযোগে এক বাড়ির মালিক পাশের বাড়ির বারবনিতা মালিকের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন। ম্যাপটিতে আঙুল দেখিয়ে বাদীর উকিল বললেন, 'ইয়োর অনার, এই বারবনিতাটি আমার স্বাভাবিক জলস্রোতের পথটি বন্ধ করেছে।' এইসব মুহূর্তে মুখে কোন বিকার না এনে চুপ করে শোনা মাঝে মাঝে দুঃসাধ্য হত।

দুর্নীতি নিবারণের কাজে আমার সহকর্মী ছিলেন কলকাতা পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনার, সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি। তাঁর দৌলতে আমি কলকাতার তলার জগতের অনেককিছু বিষয়ে জানলুম, শিখলুম: রাজনৈতিক নেতাদের হাতে পাড়ায় পাড়ায় কী ধরনের গুণ্ডা থাকে, পুলিশ তাদের খবর কীভাবে রাখে, চুরি-ডাকাতির মাল ধরতে গেলে কার কাছে গিয়ে চাপ দিতে হবে, এ-সব লোকদের সবিশদ খবর কীভাবে রাখা হয়, হাজতে ধৃতব্যক্তির উপর কী ধরনের ব্যবহার করে কী ধরনের স্বীকারোক্তি বার করতে হয়, কলকাতা মেডিকাল কলেজে ও অন্যত্র ব্লাড ব্যাঙ্ক পরিচালনার কাজে কী ধরনের অপচয় ও দুর্নীতি হয়, সে-সব তথ্য তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা করেন। কল-কাতার বিখ্যাত লালবাতি অঞ্চলগুলি, বিশেষত সোনাগাছি ও রামবাগান তিনি আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখান, সে-সব অঞ্চলে অন্তর্শাসনের ব্যবস্থা কীরকম, কিছু

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাড়িউলীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দেন। প্রবাদ ছিল তাঁর নামে বাঘে-গরুতে জল খেত।

দুর্নীতি নিবারণ কাজে বিশেষ আগ্রহ পাইনি। তার কারণ একটিও রুই-কাতলা তুলতে পারিনি, সবই চুনোপুঁটি। একটি গল্প বললে বোঝা যাবে খুচরো দুর্নীতি সম্বন্ধে ডাঃ বি-সি রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল। তখনকার দিনে যে দুর্নীতি সবথেকে সহজে ধরা যেত, সে ছিল, ট্যুর না করে মিথ্যা ট্রেনভাড়া ও অন্যান্য খরচের হিসাব দেখিয়ে সেই বাবদে বিল করে টাকা নেয়া। অনেক সময়ে যে-সব কর্মচারির দুর্নীতিপরায়ণ হিসাবে দুর্নাম ছিল, তাদের আর কিছুতে ধরতে না পারলে, মিথ্যা ট্যুর বিল করার অভিযোগে ধরা ও শাস্তি দেয়া অনেক সময়ে সহজ হত। এরকম কেস প্রমাণ হলে চাকরিসুদ্ধ যেতে পারত। ডাঃ রায় ছিলেন দুর্নীতিদমনের মন্ত্রী। একদিন এই ধরনের এক দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারকে অন্য কোন অপরাধে ধরতে না পেরে মিথ্যা ট্যুর বিল পেশ করে টাকা নেবার অপরাধে ধরে ডাঃ রায়ের কাছে কাগজপত্র পাঠালুম। অফিসারটিকে সঙ্গে করে আনতে বললেন। অফিসারটি ঘরে ঢুকলে ডাঃ রায় মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'ভেবেছিলে দু-শ' টাকায় তোমার সব অভাব মিটে যাবে? সারাজীবন কাজ করে এর থেকে কত হাজারগুণ মাইনে পাবে, তার কথা একবারও মনে হল না? তোমার মত নির্বোধ আমি কমই দেখেছি, যাও, আর কখনও এরকম কোরো না।'

এই ধরনের ব্যবহারে ডাঃ রায় তাঁর অফিসারদের আনুগত্য রাখতেন। আরেক ধরনে আনুগত্য রাখতেন, তার কথা এখানে বলি; পরে হয়তো ভুলে যাব। ১৯৫৬ সালে ডাঃ রায় আমাকে পাঁচটি বিভাগের সচিব করেন। সম্ভবত তাঁর এই ধরনের বিশ্বাসের প্রতি কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে আমি একটি ফাইলে কতগুলি মন্তব্য লিখি যা লিখে মনে হয়েছিল এগুলি পড়ে ডাঃ রায় আমার কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে খুশী হবেন। আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেশ এনে, অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'অশোক, আমার মনে কী আছে তা আন্দাজ করে লেখার জন্য তো তোমাকে সেক্রেটারি করে আনিনি। তোমার মনে কী আছে জানার জন্যই তোমাকে এনেছি।' শুনে এত লজ্জা হল! আরেকবার বললেন, 'জাতিহিসাবে আমরা কোন কথায় জোর করে "না" বলতে জানি না। দশ-টির মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রে হয়তো তুমি-আমি একমত হব। দশম ক্ষেত্রে হয়তো তোমার মত আমার মতের সঙ্গে মিলবে না। সেই দশম ক্ষেত্রে আমি প্রত্যাশা করব তুমি জোর করে "না" বলবে, এবং সেই "না" থেকে নড়বে না। মনে রেখো, দশটির

মধ্যে এই একটি ক্ষেত্রে, সজোরে "না" বলার জন্যই সরকার তোমাকে সেক্রেটারির মাইনে দেয়।' ভবিষ্যতে সর্বদা তাঁর কথা মনে রেখে কাজ করার চেষ্টা করেছি, ফল যে সবসময়ে আমার পক্ষে সুখের হয়েছে বলতে পারি না।

১৯৫৫ সালের ক্রিসমাসের সময়ে আমার 'ভারতের চিত্রকলা' বইটির পাণ্ডুলিপি ছাপাখানার জন্য প্রস্তুত হয়। ২৭ ডিসেম্বর সত্যেন রায় আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আমি কমার্স ও ইণ্ডাস্ট্রি, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, সমবায়, বিজলি ও মৎস্যবিভাগের সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছি। মেনে চলার থেকে তর্ক করা স্বভাবের জন্য যে দুর্নাম আমার হয়েছিল, সেই সম্বল করে একসঙ্গে ছয়জন মন্ত্রীর তাঁবেদারি কী করে করব ভেবে ভয় হল। সেই সঙ্গে আশা হল ছয়জনের ঘষামাজা খেয়ে আমার স্বভাবের খোঁচগুলি হয়তো মসৃণ হয়ে যাবে। আশাই তো জীবনের অবলম্বন!

ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় পাঁচসালা বন্দোবস্তের খসড়াটি চতুর্দিকে পাঠিয়েছেন। দুর্গাপুরে বছরে দশলক্ষ টন ইস্পাত তৈরির একটি প্রস্তাব এল। আগের থেকে আমাদের বিজলি উৎপাদন বাড়বে। আসন্ন রাজ্য পুনর্গঠন ঘোষণার ফলে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গে যোগ হবার সম্ভাবনা হল। ১৯৫৫ সালের প্রথমে মার্শাল টিটো বর্ধমানে আসেন, দ্বিতীয়ার্ধে বুলগানিন ও ক্রুশ্‌চেভ কলকাতায় ঘুরে গেলেন। দুর্গাপুরে বিরাট শিল্পাঞ্চল দ্রুত গড়ে উঠবে; তার জন্য অনেক অনেক কাজ করতে হবে।

১৯৫৬-র ১ জানুয়ারি আনবে এক আনকোরা নতুন দিন।

উপসংহার

লেখা যখন শুরু করি ভেবেছিলুম এ খণ্ডটি ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে শেষ করব। সে বছর জুলাই মাসে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে দিল্লীতে ভারত সরকারে কাজ করতে যাই। আমার কর্মজীবনের প্রায় অর্ধেকের কথা তাহলে সম্পূর্ণ হত: ১৯৪০ থেকে ১৯৫৮। আঠারো বছর আমি পশ্চিমবঙ্গে কাজ করি। ১৯৫৮-র জুলাই থেকে ১৯৭৫-এর মার্চ পর্যন্ত, সতেরো বছর কাজ করি দিল্লীতে ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে, শেষে রাষ্ট্রপতির সচিব হিসাবে তাঁর দপ্তরে। অর্থাৎ আই-সি-এস কর্মজীবনের অর্ধেক কাটে পশ্চিমবঙ্গে; বাকি অর্ধেক কেন্দ্রে। উপরন্তু ১৯৫৮ হত আমার তিন কুড়ি দশ বছর ব্যাপী জীবনের প্রথম দু'-কুড়ি। পরে মনে হল, বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে, ১৯৪০ থেকে ১৯৫৫, এই পনেরো বছর—বিশেষ সংকট ও ক্রান্তিকাল বলে চিহ্নিত থাকবে। ১৯৫৬ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় আবার এক ধরনের স্থিতিস্থাপকতা। অতএব ১৯৫৫-র সঙ্গে এই খণ্ড সমাপ্ত করাই স্থির করলুম।

ঘটনাসংকুল এই পনেরো বছর লেখকের জীবনে কী ছাপ রেখে গেছে তার কিছু পর্যালোচনা কৌতূহলী পাঠক হয়তো লেখকের কাছে আশা করবেন। তাছাড়া, আমি হয়তো হব একমাত্র আই-সি-এস, উপরন্তু বাঙ্গালী, যিনি এই যুগের প্রায় অর্ধেক সময় অবিভক্ত বাংলায় প্রশাসক হিসাবে কাজ করেছেন ও নিজের কথাকে উপলক্ষ্য করে সে যুগের প্রশাসন, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে নিজের চিন্তাভাবনা অনুসারে আলোচনা করেছেন, বিশেষত ১৯৪৭-এর আগে কী ধরনের অবস্থা ও ব্যবস্থা ছিল, কী ধরনের মূল্যবোধ ছিল এবং তারপর দুই বাংলায় কী কী পরিবর্তন হয় সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর মুখ্যত নির্ভর করেছেন।

১৯৪০-এর মে মাসের শেষে ডানকার্ক ও অগাস্ট মাসে লণ্ডন-ব্লিৎসের সময়ে আমার মনে ক্ষীণ আশা জাগে হয়তো কোনদিন স্বাধীন ভারতের মুক্তবায়ুতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারব। কিন্তু যখন সে সুদিন অবশেষে এল, তার আগের রাত্রেও আমি ধারণা করতে পারিনি আমার প্রাণ কী উল্লাস, উন্মাদনা, কৃতজ্ঞতানত আত্মোৎসর্গে আপ্লুত হতে পারে। ঠিক যে-ধরনের অহংবিলোপের আত্মনিবেদন আসে যখন মানুষ জীবনে প্রথম তার দেহমন অন্য একজনের দেহমনের অন্তরে

কয়েক মুহূর্তের জন্য নিঃশেষে হারায় : যার উল্লেখ বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনকের কাছে করেন। মুক্তাফলের মত দুগ্ধাভ, লাবণ্যময় ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্টের প্রশান্ত প্রত্যূষে হ্বাইনগার্টনারের পরিচালনায় আমার ই-এম-জি হাতে-গড়া বিরাট দুর্গের গহ্বর থেকে নবম সিম্ফনির আনন্দস্তব যুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত হবার আগে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রথম 'বার'গুলি ও তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে আনন্দ-সঙ্গীত যখন ধ্বনিত হল, প্রায় সে মুহূর্তে রক্তিমসূর্য সৃষ্টির আশীর্বাদ বহন করে পূর্ব-দিগন্তে যেন লাফ দিয়ে ভেসে উঠল। নবম সিম্ফনি শেষ হবার পর চিত্তশুদ্ধির প্রার্থনায় বেটোফেনের এ-মাইনর কোয়ার্টেটের লিডিয়ান মোডে-রচিত রোগ-মুক্তির কৃতজ্ঞতায় সৃষ্টিকর্তাকে অর্ঘ্যনিবেদনের সঙ্গীত বাজিয়ে দেহমন পবিত্র হল।

তারপর আমরা গেলুম চুঁচুড়ার ভূদেব ভবনের ধ্বজস্তম্ভে ভারতের নতুন পতাকা তুলতে। পর্তুগীজ গৃহস্থাপত্যের সৌম্য নিদর্শন, গঙ্গার পাড়ে প্রসিদ্ধ ব্যাণ্ডেল গির্জার প্রায় দু'মাইল দক্ষিণে, ভূদেব ভবন আমার মনে ছিল ইওরোপীয় যোগাযোগের ঐতিহাসিক প্রতীক, যা অতীতের সঙ্গে বর্তমান ভারতের নতুন সম্পর্কের বার্তা হিসাবে নবযুগের পতাকা তুলে ধরল। একান্ত বন্ধুর মত দুই বাংলা আগের রাত্রে পরস্পরের প্রতি বিদায় সম্ভাষণ শেষ করেছে।

পতাকা তোলার পর আমরা যখন ভূদেব ভবনের দোতলায় গঙ্গার বুকে বিরাট খোলা রেলিংঘেরা ছাদে চা খেতে সমবেত হলুম, তখন হঠাৎ আমার বুক কে যে বিষাদের সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরল। এতদিনকার যে-সব আত্মীয়প্রতিম সহ-কর্মিরা পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলেন, তাঁদের বিচ্ছেদে মন বিষাদে ভরে গেল। আরো কষ্ট হল এই উপলব্ধিতে, পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, শাণিত, প্রত্যুৎপন্নমতি আপামর সকলের মাঝে কাজ করার সুযোগ হয়তো আর পাব না। আরও কষ্ট হল এই ভেবে যে পূর্ববঙ্গের দিগন্তব্যাপী বিরাট বিরাট নদীর বুকে নিজের এক্তিয়ারে ঘোরাফেরার সুযোগ আর হবে না, পদ্মা, মেঘনা, বা ব্রহ্মপুত্রই হোক, অথবা অথৈ সাগরের মত আড়িয়ল খাঁয়ে। প্রকৃতির সেই তাণ্ডবলীলা আর দেখতে পাব না, যেমন দেখেছি ১৯৪২-এর ১৭ অক্টোবর, যখন মেদিনীপুর সাইক্লোনে নিজেকে আস্তে আস্তে পদ্মা-মেঘনার সঙ্গম-স্থলে নিঃশেষ করে; যেখানে আমার জাহাজ 'অস্ট্রিচ' একটি গোটা রাত্রি উত্তাল সমুদ্রের উপর মোচার খোলার মত তোলপাড় করে।

আর কখনও প্রশান্ত বিস্ময়ে দেখব না মহান পদ্মার চরে ভোরের প্রাক্কালে ঘুম ভেঙে উঠে পাখি শিকারের আশায় ম্যালার্ড হাঁসের শরের বাঁশির মত শিষ অথবা,

দূর আকাশে পিন্‌টেল হাঁসের সার ; খেলাশেষের হুইস্‌লের শব্দ করে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে গভীর রাত্রে, মেঘের ফাঁকে চাঁদ বেরিয়ে কাকজ্যোৎস্নার স্বচ্ছ সাদা চাদর ছড়িয়ে দিয়েছে। শুনব না আর চাঁদনি রাতে দূর নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসা মাঝিদের সারি, জারি, ভাটিয়ালি গান ; গাইতে গাইতে তারা দূরে, ভল্‌গা মাঝিদের মত দূরে, আরো দূরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখে দেখব না নদীর ধারে ধারে টলটলে পান্নার মত সবুজ গাছপালার ফাঁকে কুটির থেকে কুটিরে জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের পেলব চলনছন্দ। চোখে দেখব না, কানে শুনব না, ঋত্বিক ঘটকের মহাকাব্যরূপী তিতাস-নদীর প্রাণস্পন্দন, অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহসা দম-আটকে যাবার মত পদ্মানদীর মাঝিদের বলিষ্ঠ, সুরেলা কথোপকথন। এ ক্ষতি জীবনে পূরণ হবার নয়।

প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষিপ্রমতি লোকজনের বিষয়ে বলতে গিয়ে একটি কথা মনে পড়ল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কাজ করে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা কী ধরনের দুরবস্থায় উপনীত হয়, তা যদি স্বচক্ষে না দেখতুম তাহলে জানতেই পারতুম না দেশভাগের ফলে আমরা কী হারালুম। উপরন্তু, দেশভাগের আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের 'ঘটি'রা পূর্ববঙ্গের 'বাঙ্গাল'দের কাছ থেকে কী অমূল্য সম্পদ পেয়েছে। জেলায় জেলায় কাজ করে, পরে সেন্সাস করে, আমার মনে জনতত্ত্বে আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের স্থান বিষয়ে ঔৎসুক্য বাড়ে। ১৭৯০ দশকে হেনরি টেলর কোলব্রুক, এবং পরের দশকে বিউক্যানন হ্যামিলটনের সময় থেকে এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান শুরু হয়। পরে ১৮৮১ সালে যখন প্রতি দশকে নিয়মিত জনগণনা শুরু হয় তখন এই ঐতিহ্য দৃঢ় হয়। দুটি বিষয় আমার ধ্যান-ধারণার পথে সাহায্য করে। প্রথম, ১৯৫৪ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে-কোন স্থানে, হয় নিজে, না হয় তার পাঁচমাইলের মধ্যে গেছি। ঠিক ঐরকম ঘুরেছি আমি মৈমনসিংহ জেলায় ১৯৪৫ সালে, এবং আরো আতিপাতি করে তারও আগে ১৯৪২-৪৪ সালে ঢাকার মুন্সীগঞ্জে। দ্বিতীয়, ১৯৫০-৫১ সালে সেন্সাসের প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ প্যাট্রিক গেডিসের ছেলে আর্থার গেডিসের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শ্রীনিকেতনের চতুর্দিকে রাঢ় দেশে এক আঞ্চলিক সমীক্ষা শুরু করেন। তার কিছু পরে মহারাষ্ট্রের কৃষি অধ্যক্ষ হ্যারল্ড্‌ মানের নিমন্ত্রণে মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলেও অনুসন্ধান করেন। ১৯৫০-৫১ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মহলানবিশের নিমন্ত্রণে

সেখানে কাজ করতে আসেন। তখন আমার কাছে তিনি এসে আলাপ করেন। সে আলাপ আমার জীবনে সকৃতজ্ঞ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

যৌবনে পড়াশোনা, পরে মধ্যবয়স পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার বেশ কিছু জেলার শহরে ও গ্রামে ঘুরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বর্ধমান জ্বর বা ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা এবং পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে এই মহামারীর ফলাফল সম্বন্ধে আমার মোটামুটি ধারণা হয়। এই মহামারী শুরু হয় গত শতকের মাঝামাঝি, পশ্চিমবঙ্গের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত রেললাইনের বড় বড় মাটির তৈরি বাঁধ সৃষ্টির ফলে। বাঁধের দরুণ নদীমাতৃক বাংলার ঢালু উপত্যকায় জলনিকাশের পথ বহুস্থানে রুদ্ধ হয়ে বড় বড় জলা ও ঊষর লোনা অঞ্চলের সৃষ্টি হয়, ফলে সহসা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয়। তার উপরে ছিল আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত উপর্যুপরি করাল দুর্ভিক্ষের দাপট। এই দুই শক্তিশেলের মুহুর্মুহু আঘাতে পশ্চিমবঙ্গে জীবনের সব বয়সেই মৃত্যুর, বিশেষত শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার খুব বেড়ে যায়। তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে বাড়ে জন্মহার। জীবতত্ত্বে জন্ম ও মৃত্যুহার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটি ঘটে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র রাঢ় ও সমতট দেশে। জীবিকার প্রতি ক্ষেত্রে—যেমন কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, পেশা, শিক্ষা, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উদ্যমে—পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত মফঃস্বল অঞ্চল, যেমন জীর্ণ হয়ে পড়ে, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে এই মহামারী বা দুর্ভিক্ষের প্রকোপ না থাকায়, উপরন্তু কৃষি-উৎপাদনে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির ফলে মানবিক সম্পদের স্ফুরণ বাড়ে। যদি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর, অর্থাৎ তিস্তা-ভাগীরথী নদীর রেখা ধরে, বাংলাকে পুব-পশ্চিম দুটি ভাগ করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হয়। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গতির ফলে পূর্ববঙ্গের কিছু বিষয়ে শাপে বর হয়। আঠারো শতকের বাংলা পঞ্জিকার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সারা বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা ধ্বংস হয়ে যায়; এর অর্ধেকের বেশী ছিল পশ্চিমবঙ্গবাসী। এই মন্বন্তরের পর একের পর এক যে দুর্ভিক্ষ ঘটে তার ফলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু দক্ষ ও কর্মঠ চাষী-পরিবার দেশান্তরী হয়ে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত জনবিরল জেলাগুলির বন-জঙ্গল সাফ করে নতুন চাষ ও বসতি শুরু করে। এর ফলে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের অবস্থার আরো অবনতি হয়। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ১৮১৮ সালের তিন আইনের কৃপায় পশ্চিমবঙ্গের বহু বড় বড় জমিদারী টুকরো টুকরো হয়ে তাঁদের হাতে গেল যাঁরা চাষের ব্যাপারে উৎসাহের বদলে চাষীকে উৎপীড়ন করে যথাসম্ভব টাকা আদায়ে মন দিলেন। তাঁদের

অধস্তন পত্তনীদাররা জমি ভাগে বিলি করে, নিম্নজাতির চাষীর হাতে চাষের ও ফসল তোলার ভার দিয়ে যথাসম্ভব তাদের কাছ থেকে ফসল ও অর্থ আদায় করায় মন দিলেন। এই অর্থ বড় ও ছোট ভূস্বামী ও পত্তনীদার উভয়ে মিলে যথাসম্ভব শহরে আরামে থাকার পিছনে ব্যয় করা শুরু করলেন, যে হাঁস সোনার ডিম দেয় তাকে সুস্থ ও জীবিত রাখার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। জমিদারি ও চাষের জমি ছোট ছোট আলাদা আলাদা লপ্তে ভাগ হওয়ায় সে-সব ভূসম্পত্তি থেকে চাষের উৎপাদন ও আয় জমিদারি পিছু কমতে শুরু করে, বিশেষত বন্ধকী তমসুক বা ভাগচাষের জমি থেকে। এই অবস্থায় আবার আরেক ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিণাম ঘটল। গ্রামের জমিদাররা ভদ্রাসন ছেড়ে শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করে শহরে পেশায় মন দিলেন। ফলস্বরূপ আঠারো শতকের বিশের দশকে কলকাতায় দেখা দিল এক নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ যার অস্তিত্ব আগে ছিল না। তার কারণ কলকাতার মত কেন্দ্রবিন্দু শহর আগে ছিল না এবং নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ হল কলকাতাশ্রয়ী, যদিও তার নাড়ীর যোগ রইল মফঃস্বলের বড় শহরগুলিরও সঙ্গে। এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইওরোপীয়, বিশেষত বৃটিশ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও জীবনধারার সুযোগ নিয়ে, আমরা এখন যাকে বলি বাংলার পুনর্জাগরণ, তারই প্রবর্তন করলেন। সবকিছুই তর্ক-বিতর্ক করে, যাচিয়ে দেখতে হবে, নতুন এক জীবনধারায় ব্রতী হতে হবে, এই ছিল পণ। নাগরিক মন গঠনের জন্য যাবতীয় আধুনিক পেশা, বিশেষত যেগুলি বিদেশী শিক্ষানির্ভর, আয়ত্ত করতে হবে—যেমন শিক্ষকতা, আইন, ডাক্তারি, প্রশাসন ইত্যাদি। পেশা আয়ত্ত করার সঙ্গে তাঁরা ব্যবসায়েও মন দিলেন। জমিদারির খাজনা ব্যবসায়ে বা শিল্পে ঢেলে, অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁরা বিদেশী এবং ভারতের অন্যপ্রদেশের ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির সঙ্গে শরিকী সম্বন্ধ স্থাপন করলেন, যেমন, লগ্নি কারবার, ঠিকাদারি, দালালি, কারখানা প্রতিষ্ঠা, জাহাজের মাল সরবরাহ। এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা আরো বিত্তশালী, তাঁরা গেলেন নতুন নতুন শিল্পে, যেমন কয়লার খনি, জাহাজ কোম্পানি, অথবা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'হৌস'গুলির সঙ্গে শরিকী ব্যবসায়ে। বৃটিশ সম্পর্কনির্ভরতার ফলে তাঁদের মধ্যে অনেক দোষও দেখা দিল, যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা, নানা ধরনের অবাঞ্ছনীয় জাঁকজমক, সম্পত্তি নয়ছয় করা, একাধারে শ্বেতচর্মের পদলেহন, অন্যদিকে তাঁদের জীবনধারার সঙ্গে বারফট্টাই পাল্লা দেয়া। এই ধরনের প্রবৃত্তি, দুঃখের বিষয়, বৃটিশরা চলে যাবার পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও এখনও সমান দর্পে বর্তমান, বরং ক্ষমতাসীনদের পদলেহনবৃত্তি যেন বেড়েছে।

কলকাতার বাঙ্গালী ব্রাউন সাহেব এখন বৃটিশরাজের নামোচ্চারণমাত্রে ভক্তিতে গড়াগড়ি যান। এখনও দেখবেন কিছু কিছু সংবাদপত্রে, এমন-কি বাঙ্গালী সমাজের কিছু কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও, অতি সাধারণ বা স্পষ্টত অভিসন্ধি-প্রণোদিত কোন ইওরোপীয় ব্যক্তি এসে অনুগ্রহের জন্য লালায়িত বাঙ্গালীর মনে কলকাতা বিষয়ে দ্ব্যর্থক বা কপট প্রশংসার সুড়সুড়ি দিলেই, তাদের নিয়ে নাচানাচি করতে বাধে না। শ্বেতাঙ্গ সম্বন্ধে এই দাসমনোবৃত্তি কলকাতার একটি বিশেষত্ব, যা ভারতের অন্য কোন শহরে আর নেই।

গ্রামের জমিদারি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জমিদার বা পত্তনীদার কলকাতায় বসবাস করার দরুণ গ্রামে কৃষির উত্তরোত্তর অবনতি ঘটতে লাগল। পূর্ববঙ্গে কিন্তু অধিকাংশ জমিদারই তাঁদের জমিদারি ভদ্রাসনের পাট ওঠালেন না। ভাল ভাল চাষীকে ভিটেমাটি দিয়ে বসিয়ে তাদের সাহায্যে পাট, তামাক প্রভৃতি পণ্য ফসলের চাষ, তার সঙ্গে একাধিক খরিফ বা রবিশস্যের ফলনও বাড়ালেন। ফলে, পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। চাষে লাগানো পুঁজি একদিকে যেমন বাড়তে লাগল, জমিদাররা অন্যদিকে ব্যবসা, বাণিজ্যে, ব্যাঙ্কস্থাপনা ও চালনায়, উপরন্তু আধুনিক শিল্পসংস্থায় উদ্বৃত্ত পুঁজি ঢালতে লাগলেন।

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে, প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্যের যে দুটি ভিন্ন ধারা ও গতি দেখা দিল, তার কারণ অনুধাবন করা শক্ত নয়, বিশেষত যাঁদের অবিভক্ত বাংলার দুটি অংশ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। আমি নিজে সাতপুরুষে পশ্চিমবঙ্গের 'ঘটি', হুগলী জেলায় পিতৃবংশ ও বর্ধমান জেলায় মাতৃবংশসম্ভূত বলে প্রচ্ছন্ন আত্মগরিমাও আছে। সুতরাং পূর্ববঙ্গে কাজ করে, স্বচক্ষে দেখার ও জানার সুযোগ যদি না হত তাহলে যা লিখছি সে-বিষয়ে প্রত্যয় আসা শক্ত হত। বাঙ্গালী হিন্দু-দের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে শুধু জ্যেষ্ঠপুত্রেরই দাবি বলে কিছু নেই। আমরা দায়-ভাগনীতিদ্বারা চালিত, অর্থাৎ সব ছেলেই সমান ভাগ পাবে। তা সত্ত্বেও, কিছুদিন আগে পর্যন্ত, একান্নবর্তী পরিবারের ঐতিহ্যফলে জ্যেষ্ঠভ্রাতাই হতেন পরিবারের কর্তা। তাঁরই উপর পরিবারের সম্পত্তি ও জমিদারি পরিচালনার ভার পড়ত। তিনিই বৃটিশরাজের স্থানীয় প্রতিভূ কালেক্টর ও পুলিশসাহেবের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্ব নিতেন। অতএব কর্তার পক্ষে বৃটিশের রাজভক্ত প্রজা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। জমিদারী যত ছোট হত এই রাজভক্তির উপর বৃটিশের হামলা ও দাবি তত বেশী হত—চিরাচরিত শক্তের ভক্ত নরমের যম নীতি অনুসারে।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে জমিদারীগুলি পূর্ববঙ্গের গড়পড়তা জমিদারীর তুলনায় বেশ ছোট এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত হত সেহেতু তাদের মালিকদের স্বাধীনচিত্ততা প্রকাশের সামর্থ্যও কম হত ! আরেকটি কারণও মনে রাখতে হবে। পূর্ববঙ্গের জমিদারীর ছোট ছোট শরিকরাও পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় শরিকদের তুলনায় অনেক বেশী বিত্তশালী হতেন, ফলে আত্মবলে বলীয়ান বোধ করে বড় শরিকের কর্তা মশায়ের থেকে অনেক বেশী স্বাধীনচেতা হতেন। আরো একটি কথাও মনে রাখতে হবে। পূর্ববঙ্গের যে-কোন জেলায় সবশুদ্ধ বড়জোর চার-পাঁচটি বৃটিশ কর্মচারী সপরিবারে থাকতেন, তার উপরে বড়জোর আরো দু'-তিনটি সদাগরী বৃটিশ পরিবার। এদের মধ্যে আবার অধিকাংশই থাকতেন সদর শহরে। গ্রামে বা ছোট শহরে প্রায় কেউই থাকত না। সুতরাং গ্রাম দূরে থাক, সদর শহরেও শ্বেতাঙ্গদের অস্তিত্ব সাধারণ নাগরিকদের মনে এমন-কি বড় বড় জমিদারদের মনেও বিশেষ গুরুভার ফেলত না। কিন্তু কলকাতার ব্যাপার ছিল অন্যরকম। এ-শহরের মাত্র আটাশ বর্গমাইলের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের শহর ছিল আলাদা এবং সেখানেই ছিল সবরকম চোখধাঁধানো ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। অধিকন্তু দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে শাদারা সবরকমের প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে কায়েম ছিলেন। সবকিছু পুঁজি নিয়োগে তো বটেই। অধিকাংশ দপ্তরে, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে, শিল্পে, প্রশাসনে এমন-কি অসামরিক পেশাতেও ছিল তাঁদের প্রাধান্য ও আধিপত্য। আমার যৌবনেই দেখেছি, অনেক সময়ে বিধান রায় বা নীলরতন সরকারকে রোগী দেখিয়ে তৃপ্তি হত না, ডেনহ্যাম হোয়াইট সাহেবকে যতক্ষণ না ডেকে আনা হত।

নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে পশ্চিমবঙ্গের জমিদারকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজ বদান্যতা ও জনহিতব্রতের পথ দেখালেন। সেই তুলনায় পূর্ববঙ্গের জমিদার-সম্প্রদায় এই ধরনের জনহিতকর সংস্থা আরো ব্যাপক ও বড়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে পূর্ববঙ্গের গ্রাম ও শহরের সমৃদ্ধি বাড়ান। পশ্চিমবঙ্গে এ-সব কাজ শুরু হয় ১৮২০ দশকের শেষে ; পূর্ববঙ্গে শুরু হয় ১৮৫০-এর দশকে। তা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের জমিদাররা আরো বিত্তশালী, তদুপরি, ছোট-মাঝারি শরিকরা আরো স্বাধীনভাবাপন্ন ও শিরদাঁড়া-টান হবার ফলে আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সৃজনক্ষেত্রে তাঁরা হলেন আরো অগ্রণী ; কারণ ইংরেজদের সঙ্গে খাতির রাখতেন বাড়ির বড়কর্তা ; অন্য শরিকরা ততখানি পরোয়া করতেন না, কারণ তাঁরা থাকতেন বড়কর্তার ছত্রচ্ছায়ায়। উপরন্তু ছোট-মাঝারি শরিকরা জমিদারী দেখাশোনায় ততখানি আবদ্ধ না থেকে চলে যেতেন

নানাবিধ পেশায় ও জীবিকায়। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন, বৃহত্তর জগতের, বিশেষত বিদেশের ও কলকাতার সমৃদ্ধ-জীবনের আস্বাদ, নানান পেশার প্রসারের ফলে পূর্ববঙ্গের এই শ্রেণীর শরিক ও তাঁদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-কুটুম্বদের মধ্যে বিদ্রোহসূচক মানস ও তার ফলস্বরূপ বহু গুপ্ত-সংগঠন গড়ে ওঠে, বিশেষত রংপুর, মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশালের মত সমৃদ্ধ ও বড় জমিদারীপূর্ণ জেলা-গুলিতে। ওদিকে কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায়, যেখানে জমিদারির গড় আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট হত, সে-সব জেলায় শিক্ষাগত ও প্রযুক্তিগত পেশাগুলির প্রসার হয় আরো বেশী। শিক্ষার দরুণ বিদ্রোহের ভাবও বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে দ্বিতীয়োক্ত জেলাগুলির সন্তানরা ব্যবসা, শিল্প, লগ্নি ব্যাংকিং ইত্যাদি উদ্যমে কৃতিত্ব দেখান। ১৮৫০-এ শুরু করে পূর্ববঙ্গ এইসব উদ্যম ও সৃজনক্ষেত্রে এত দ্রুত এগিয়ে যায় যে উনিশ শতক শেষ হবার আগেই 'বাঙ্গাল'রা কলকাতা মহানগরীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক জগতে মধ্যমণির আসন অধিকার করেন। কলকাতার জীবনের যে-কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রের আলোচনা করলে সন্দেহ থাকবে না যে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পূর্ববঙ্গের। 'ঘটি'দের পরিণত প্রজ্ঞায় ক্লান্ত, থিতোনোভাব একটু বেশী এলেই 'বাঙ্গাল'রা সতেজে ঢুঁ মারতে শুরু করতেন, সে কংগ্রেসী বা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই বলুন বা 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ'র যুগে, 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকাই ধরুন। সমুচ্চ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববঙ্গজাত ছিলেন তো বটেই, স্বাধীনতা সংগ্রামেও পূর্ববঙ্গীয়রা হলেন অগ্রণী। আমার এই সশ্রদ্ধ নতিভাব গভীর হয় যখন আমি ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কাজ করি। মস্তিষ্ক, মন ও হৃদয়ের ব্যাপ্তি তো বটেই, দৈহিক স্বাস্থ্যেও 'বাঙ্গাল'রা ছিলেন 'ঘটি'দের থেকে বলিষ্ঠ। যখনই কোন বিক্রমপুরবাসী কথার পিঠে বলতেন, 'আমার একটা আফত্য আছে', তখনই সন্দেহ থাকত না তিনি পুরনো জিনিসে ও ভাবে নতুন আলো ফেলতে আগ্রহী। ব্যক্তিগত একটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আজ প্রায় আটচল্লিশ বছর হল আমি বিক্রমপুর ত্যাগ করেছি, তবুও এখন কোন বিষয়ে ওজস্কণ্ঠে বিরোধী মত প্রকাশ করতে গেলে গলা দিয়ে আমার অজান্তেই বিক্রমপুরী ভাষা ও টান আপনাআপনি বেরিয়ে আসে, এমনই স্থানমাহাত্ম্য।

দুঃখের বিষয়, এখনকার বাংলাদেশে, অর্থাৎ দেশবিভাগের আগেকার পূর্ববঙ্গে, মুসলমান 'বাঙ্গাল'রা ১৮৫০ থেকে হিন্দু 'বাঙ্গাল'দের মধ্যবিত্ত শ্রেণীগঠনের ধারা

থেকে দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত বাদ পড়ে বলা যায়। পূর্ববঙ্গ ছাড়ার আঠাশ বছর পরে ১৯৭৪ সালে আবার ঢাকায় গেলুম। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ তখন উৎসাহে টগবগ। আমার সব থেকে ভাল লাগল জীবনের প্রতিটি উন্নত ক্ষেত্রে, লেখাপড়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, যাবতীয় প্রযুক্তি সংস্থায়, এক কথায় আধুনিক জীবনের প্রতিটি স্তরে শিক্ষিত, পরিশ্রমী, জাগ্রত বাঙালী মুসলমানরা সবকিছু ক্ষেত্রে তাঁদের কর্তব্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করছেন, অথচ কথাবার্তায় বা ব্যবহারে বিন্দুমাত্র অহমিকা নেই। তার থেকেও যা ভাল লাগল, মাঠে, ঘাটে হাত নোংরা করে কাজ করতেও দ্বিধা নেই, যা মস্তিষ্কচর্চ্চারত মধ্যবিত্ত বাঙালীর চরিত্রে স্বাভাবিক বলে মনে হত না। অবশ্য ১৯৯০ সালে যখন পুনরায় ঢাকায় যাই তখন এই বিমুখতা কিছুটা এসেছে লক্ষ্য করি।

মাত্র আটাশ বছরে এই বিপ্লব কী করে এল, যা নাকি ভারতে আসামে, মণিপুর, ত্রিপুরা এমন-কি ওড়িষ্যাতেও তখন সম্ভব হয়নি? ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর থেকে বাঙালী মুসলমানরা যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে। বুঝলুম নতুন জোয়ার তারই ফল। তাছাড়া আটাশ বছরের মধ্যে ছাব্বিশ বছরই পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করেছে। জেহাদ ছিল নিজেব দেশে নিজে মালিক হব। স্পষ্টই বুঝলুম, নিজের ঘরে মালিক হওয়া আর সংবিধানে লেখা মৌলিক অধিকার ও নীতিমূলক নির্দেশের তালিকা বুকে ঝুলিয়ে বেড়ানোর মধ্যে অনেক তফাৎ। আইনের আশ্বাস আর অবস্থার সত্যিকারের উন্নতি এক জিনিস নয়। আগেকার সাতাশ বছরে একটি নীতি বোধহয় পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে বেশ উদ্দীপনা আনে। ইসলাম নিজ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাগতিক বা আর্থিক সমতা সাধন না করলেও, অন্তত দুটি স্পর্শগ্রাহ্য লৌকিক সমতাবোধ প্রত্যেক মুসলমানের রক্তে ও আত্মায় গেঁথে দেয়। এই সমতাবোধের দুটি বাহ্যিক, সামাজিক ও ব্যবহারগত প্রকাশ সর্বদাই বর্তমান ছিল ও আছে। এক, রাজা-প্রজা-দীন নির্বিশেষে সকলের একসঙ্গে বসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধর্মস্থানে একত্রে প্রার্থনা করার অধিকার আছে। দুই, সকলে একসঙ্গে বসে একপাত্র থেকে খাবার অধিকার আছে। এই দুটি অধিকার মনে নিশ্চয় বল যোগায়। সমাজে বৈচিত্র্য ও জটিলতা-বৃদ্ধির সঙ্গে অবশ্য অন্যান্য অনৈক্য ও অসাম্য মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৪১ সালে বরিশালে কাজ করার সময়ে একটি লৌকিক প্রবাদ শুনেছিলুম: আজ আমি জোলা বা মোমিন। অবস্থার উন্নতি হলে আগামী বছর হব

খান। পরের বছর আরো উন্নতি হলে হব শেখ। অবস্থার আরো বেশী উন্নতি হলে শেষে হব সৈয়দ, অর্থাৎ পয়গম্বরের বংশধর।

দেশভাগের পর কা হল খুব সংক্ষেপে মোটা কথাগুলি আবার বলি। পাঠকের মনে থাকতে পারে র‍্যাড্‌ক্লিফ ও বাগে রোয়েদাদের ফলে মালদা ও মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও খুলনা জেলায়, উত্তরে পূর্ব ও পশ্চিম দিনাজপুরে, নদীর জেলার দুটি ভাগে এলাকার অদল-বদল হয়। তার ফলে যখন উদ্বাস্তু আসতে শুরু করে ধরেই নিয়েছিলুম, সেগুলি হচ্ছে এলাকা অদলবদলজনিত অনিশ্চয়তা ও স্থানীয় গোলমালের ফল। সবই সেই অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। শীঘ্রই অবশ্য পূর্ব-পাকিস্তানের নানা জেলায় ছোটখাটো দাবদাহ শুরু হয়ে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। আগেই বলেছি এ-আতঙ্ক তুঙ্গে ওঠে ১৯৪৯-এর শেষে ডলারের তুলনায় বিলেতী পাউণ্ডের এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় টাকার মূল্যহ্রাসের পর। মূল্যহ্রাসের পর পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর হামলার ঢেউ ওঠে। ধুবুলিয়া ও ফুলিয়ার দুটি উদ্বাস্তু ক্যাম্প দেখতে দেখতে অ্যাটমবোমার দিগন্তব্যাপী মেঘের মত ফুঁসে ওঠে। কিছুদিনের মধ্যে উদ্বাস্তুদের প্লাবন ভাগীরথীর দু'ধারের জেলাগুলিতে দ্রুত সঞ্চারিত হয়।

উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে দিল্লী ও কলকাতার মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল সে-বিষয়ে আমি ওয়াকিবহাল ছিলুম। ফলে যে-সব সংঘাত হত তার কারণও বুঝতুম। সে-সব প্রশ্নের আলোচনার স্থান এটি নয়। তবে আমরা সবসময়ে মনে রাখি না যে দেশভাগের ঠিক পরেই কাশ্মীর আক্রান্ত হয়, এবং তার ঠিক আগেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ব্যাপক দাঙ্গা, ধ্বংসলীলা ও সার্বিক লোক বিনিময়ের ফলে নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ে। পার্থিব ঐশ্বর্যের শিরোমণি পাঞ্জাব শ্মশানে পরিণত হয়েছে। দুই দিক থেকে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল দুটি জাতি। অন্যদিকে দুই দেশের দুই জাতিই ছিল দুই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জাতি। সে-সময়ে পূর্ব-পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে তড়িৎগতিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ও স্থিতিভাব আনতে না পারলে সারা দেশের নিরাপত্তা হত নিতান্ত বিপন্ন। পশ্চিমপ্রান্তে দুই দেশেই এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য উভয়েরই লক্ষ্য হল যাতে ভারতের পূর্বপ্রান্তে নতুন করে সংঘাত না হয়। তারই উদ্দেশ্যে হল নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি।

দেশভাগের ঠিক পরে পূর্ব-পাকিস্তানের অবচেতন মনের কথা জানার দাবি

করতে পারি না, তবুও এটা ঠিক যে ১৯৪৭ সালের শেষে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে কাশ্মীর আক্রমণের পরেও পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্ত শান্ত থাকে। কলকাতার শরৎ বসু-গোষ্ঠীর আশা ছিল দুই বাংলা অচিরে একত্র হবে। বিপুল জনসংখ্যাক্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের তখন লক্ষ্য ছিল কী উপায়ে বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের ক্ষতি সামলে ওঠা যায়। তার পক্ষে নতুন করে বিপত্তি ঘাড়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। সেই হিসাবে পূর্ববঙ্গ থেকে শিক্ষিত, কুশলী, সম্পন্ন হিন্দু কলকাতায় এলে তাঁদেরকে পশ্চিমবঙ্গ সাদরে গ্রহণ করত। কিন্তু হাজার হাজার অশিক্ষিত, অদক্ষ, ছিন্নমূল, নিঃস্ব বাস্তুহারাদের ভার নিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বভাবতই বিব্রত বোধ করলেন। তা সত্ত্বেও ১৯৪৯-এর শেষভাগে, অর্থাৎ দেশভাগের মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে দশলক্ষের বেশী, এবং ১৯৫১ সালের জনগণনার সময়ে প্রায় বিশলক্ষ বাস্তুহারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিল। এত সংখ্যক বাস্তুহারার ভার নেয়া পশ্চিমবঙ্গের সাধ্যাতীত হয়। তাছাড়া, সরকারের তরফেও এ-বিষয়ে যথেষ্ট অবহেলা ছিল, বিশেষত বাস্তুহারাদের সারা পশ্চিমবঙ্গময় সুষ্ঠুভাবে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের পুনর্বাসন ব্যাপারে। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির ফলে এই আশা হল যে বাস্তুহারারা শীঘ্রই পূর্ব-পাকিস্তানে বরাবরের জন্য ফিরে যাবে। আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান অনেক হিন্দু-পরিবার এইভাবে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে বারবার যাতায়াত করেন। এর মধ্যে আবার অনেকের অভীপ্সা ছিল গাছেরও খাবেন, তলারও কুড়োবেন। অবশেষে দুটির কোনটাই না হয়ে উল্টে আরো নিঃস্ব হলেন। পশ্চিমবঙ্গে জমি জবরদখল অথবা গোপনে দখল করা ছাড়া উপায় রইল না। অবশ্য এই ধরনের বে-আইনি বসবাসের ফলে অনেক পোড়ো, বনজঙ্গলগুল্মেভরা জমি ও জলা সাফ হয়ে বসতি হয়ে গেল। তবে সেই সঙ্গে এল সুস্থ মানবজীবনের একান্ত অনুপযোগী খাওয়া-পরা, বাসস্থান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মান, যা আজও প্রায় সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনি বা বস্তিতে চলছে। উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই ভীড় করলেন ভাগীরথীর দুই তীর বরাবর কলকাতা শিল্পাঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে আর সীমান্ত জেলাগুলিতে। জীবিকা হল মুখ্যত স্বল্প-উপার্জনের মেহনতী কাজ। তার সঙ্গে বাড়ির সংলগ্ন ছোট্ট জমিতে যা কিছু সব্জি সম্ভব তার চাষ, যা তাঁরা বাজারে বিক্রি করতে পারেন। আমার অভিজ্ঞতায়, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনে আপন চেষ্টায় নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়ানোর জন্য বাস্তুহারারা যা করেছিলেন, তার তুলনায় সরকারের প্রচেষ্টা ছিল গৌণ।

১৯৫১ সালে যখন ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচন ঘোষিত হল তখন প্রতি প্রাপ্ত-

-বয়স্ক নরনারীর একটি ভোট এই নীতি গ্রহণের ফলে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজ-নিজ ভোট ব্যাংক কায়েম করার জন্য বাস্তুহারাদের খিদমতে মন দিলেন। তখন থেকে বাস্তুহারাদের কদর বাড়ল। এই মনোযোগ ক্রমে ক্রমে এখন দেশের পক্ষে হানিকর ও দুর্নীতির পর্যায়ে উঠেছে। ইদানীং গত আট-দশ বছর ধরে রাজনীতি নির্বিশেষে সব দলই চুপি চুপি বাংলাদেশ থেকে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আগন্তুকদের আমন্ত্রণ করে সাগ্রহে এদেশে বসিয়ে দিয়ে, রেশন কার্ড প্রভৃতি নাগরিক পত্রপ্রমাণ, সেইসঙ্গে তাদেরকে ভোটার তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখান। এর প্রমাণ ১৯৯১ সালের জনগণনায় কয়েকটি সীমান্ত জেলায় সুস্পষ্টভাবে পাই। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই ধরনের রেষারেষির ফলে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে প্রধান ধর্মসম্প্রদায় দুটির সংখ্যাগত, হারাহারি ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছে। উপরন্তু সারা সীমান্ত ধরেই আজ নানারকম অনাচার বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে।

১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর থেকে রাজনৈতিক দলগুলি বাস্তুহারাদের শিল্পকারখানায় কাজ অথবা কুটিরশিল্প স্থাপন, যানবাহন, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ে, চাকরি, আত্মনির্ভর পেশা, শিক্ষা ও কাজের মাধ্যমে তাদের আত্ম-মর্যাদাপূর্ণ জীবিকার ব্যবস্থার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন না। উল্টে, তাদের মধ্যে বেকার বা বাস্তুহারা ভাতার জন্য আন্দোলন করিয়ে নিজেদের তাঁবে রেখে পঙ্গু করতে চেষ্টিত হলেন। বাস্তুহারাদের মধ্যে এল আলস্য, বসে বসে খাবার অভ্যাস, নিরক্ষরতা ও চরিত্রভ্রংশ। অর্জিত অর্থের প্রতি বিতৃষ্ণা, অনার্জিত অর্থের লালসা। শুধু রাজনীতি নয়, সরকারি আমলাতন্ত্রের কার্যপদ্ধতি ও মনোভাবের উপরেও এই নীতি ও দর্শন অনেক কুফল বর্ধন করে। তাঁদের ব্যবহারে মানুষোচিত সংবেদনা, মঙ্গলকামনা ও সাহায্য করার ইচ্ছার ব্যাপক অভাব দেখা দিতে শুরু হল। তাঁরা যে-সব পরিকল্পনা চালু করলেন, তাতে মানবসংবেদনহীন যান্ত্রিক মনোভাব এল—যেন মানুষের অস্তিত্বই নেই। কী করে বরাদ্দ টাকা কত তাড়াতাড়ি খরচ করা যায় তার দিকে নজর গেল।

পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধানে এখন বলা শক্ত ১৯৪৭ সালে ইতিহাস কী ধারা নিলে ভাল হত। দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি, শান্তি, এমন-কি হৃদ্যতার আবহাওয়া ছিল, যার কল্যাণে দেশভাগের পর কিছুদিন অনাবিল শান্তির মরীচিকা দেখা দিল, তারপরে এই পঁয়তাল্লিশ বছর কিছুদিন অন্তর অন্তর যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সময়ে সময়ে মর্মান্তিক

হত্যাকাণ্ডের মালা হয়ে দাঁড়াল, দুই বাংলা ক্রমশ যে-রকম পঙ্গু থেকে পঙ্গুতর হল, সেটি ভাল হল? না, শুরুতেই উত্তর ভারতে কয়েক সপ্তাহ ধরে যে অবর্ণনীয়, ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড, নারকীয় দুরাচার, তার সঙ্গে যে অপরিসীম প্রাণ ও সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছিল – যার ফলে দুই পক্ষই পরস্পরের মুখের উপর লৌহকপাট বন্ধ করে দিল —সেটি ভাল হত! উত্তর ভারতে দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালে যে নারকীয় ঘটনাবলী কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে তার ফলাফল আমি সেই বছরের শেষের দিকে দেখেছি। সেই ধ্বংসলীলার সঙ্গে ইতিহাসের নাদির শা'র ধ্বংসলীলারই একমাত্র তুলনা চলে।

অবশ্য ১৯৭১ সালে প্রকাশিত আমার 'দিল্লী, ভারতের রাজধানী' বইতে যা লিখেছি তাও সত্য। দেশভাগের পর দিল্লীর পুরনো, বনেদী মুসলমান বাসিন্দারা দেশ ছেড়ে যাবার ফলে দিল্লীর চিরাচরিত খানদানি ভদ্রতা-সভ্যতা যেমন একদিকে রাতারাতি উঠে গেল, অন্যদিকে তার বদলে এল এক নতুন বলিষ্ঠতা, সংকল্প, আত্মনির্ভরতা, গর্ব, যার কল্যাণে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্র রাতারাতি পাল্‌টে গেল। এই গুণগুলির দরুণ সে-প্রান্তে রাজনৈতিক নেতারা বাস্তুহারাদেরকে রাজনীতির ঘুঁটি অথবা ট্যাঁকে পোরা ভোটের তাড়া হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ পেলেন না। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের বাস্তুহারারা যতদিন ন-যযৌ ন-তস্থৌ, অর্ধমৃত উদ্যমহীন অবস্থায় থাকে, তারই নানারকম ব্যবস্থা হল। বাসস্থান, আলোবাতাস, পুষ্টিকর আহার, পরিস্রুত পানীয় জল, দেহের প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের উপযুক্ত খোলামেলা জমি, স্থানীয় গোষ্ঠীনির্ভর সামাজিক কর্মকাণ্ড, নগরসুলভ যাবতীয় সুখ-সুবিধার অভাবে, উদ্বাস্তুপল্লীগুলিতে এল মানুষের অনুপযুক্ত, বঞ্চিত, কলঙ্কিত জীবনধারা। এই প্রকারের ক্লিষ্ট জীবনধারণ আবার তাঁদের ভাগ্যেই ঘটল যাঁদের পূর্বপুরুষরা এতাবৎ তাঁদের প্রতিভা, উদ্যম, সৃজনীশক্তি দিয়ে কলকাতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হিসাবে আগত মানবসম্পদের দ্রুত অবক্ষয় শুরু হল। সবথেকে ক্ষতি হল অতি আরাধ্য নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনার, এককথায় নাগরিকসুলভ মনের, যা শুধু বড় নগরের আবাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্যোচ্ছল আবহাওয়াতেই সম্ভব হয়, যা কলকাতার মত নগরীর কাছে আশা করা অনুচিত হত না। কিন্তু খোদ কলকাতার বস্তিতে, তার উপকণ্ঠে, শিল্পাঞ্চলের গ্রাম্য শহরতলীতে নগরসুলভ সুযোগ-সুবিধা ভোগ না করায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মন নিতান্ত গ্রাম্যতাদুষ্ট, সংকীর্ণ, অজ্ঞাগ্রত আচারব্যবহারে আবদ্ধ রইল, এমনকি এই গেঁয়োভাব ও

আচারব্যবহার এখন শহরের আদিবাসিন্দাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। বহু-কাল বেকার, নিষ্কর্মা, ভাতার উপর নির্ভর, মনুষ্যেতর জীবনযাপনের ফলে, এই-মুহূর্তে মেরুদণ্ডহীন, পদলেহী, পরমুহূর্তে মারমুখী ভাব ধারণ করে রাজনৈতিক 'দাদা'দের পায়ে নিজেদের সমর্পণ করলেন। উবে গেল তাঁদের সহজ গর্ব ও উদ্যম।

যে কলকাতা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের মেধা ও তাজা রক্ত শিরায় নিয়ে নবীন থাকত, দেশভাগের পর আস্তে আস্তে সেই রক্তের তেজ সে হারালো। শুধু কলকাতা শিল্পাঞ্চলেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রাম এই পুষ্টির অভাবে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ল। ১৯৪৭ সালের পর পূর্ববঙ্গেরও মফঃস্বল শহর ও গ্রাম এই পুষ্টির অভাবে একইভাবে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ল। ফলে দুই বাংলাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে তার মফঃস্বল শহরে ও গ্রামে যে অনেক দ্রুতবেগে ক্ষতিপূরণ করে নিয়েছে তার কারণ বাংলাদেশের যা-কিছু শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, পেশা, সমস্তই ছিল ও আছে বাঙালীর হাতে এবং সেগুলি বাংলাদেশের মানবিক ও মানসিক জীবন সমৃদ্ধ করেছে ও করছে। অন্যপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে এক চাকরি ও কিছু কিছু পেশা ছাড়া অধিকাংশ ধনোৎপাদনের উৎস বাঙালীর হাতে আর নেই। এর প্রত্যক্ষ ফল দেখি দুই বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে। বাংলাদেশে একটি সত্যিকারের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন হয়েছে বলা যায়, সে-স্থলে পশ্চিমবঙ্গে চলছে অবক্ষয়ের যুগ।

পূর্ববঙ্গের সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হবার ফলে দ্রুতবেগে কয়েকটি কুফল ফলল। কুমিল্লা জেলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবারের উদ্যোগে কলকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় শহরে অনেকগুলি বাঙালী মূলধনে চালিত ব্যাংক স্থাপিত হয়। ত্রিশের ও চল্লিশের দশকে কলকাতার প্রায় প্রতি রাস্তার মোড়ে একাধিক ব্যাংকের শাখা দেখা যেত। এই ব্যাংক-উদ্যম হঠাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালে শুকিয়ে যেতে শুরু করে। তারপরে শুকিয়ে গেল নগরের ভূ-সম্পত্তি ও নতুন নতুন বসতি করার উদ্যম, যার কৃপায় ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে তৈরি হয় বালিগঞ্জ প্লেস, হিন্দুস্থান পার্ক, দক্ষিণ-ভবানীপুর, কালীঘাট, যাদবপুর, নিউ আলিপুর ধরনের সুন্দর বাসসুখকর কলোনি, যার শেষ স্ফুরণ দেখি যোধপুর পার্ক, লেক গার্ড্‌ন্‌স্‌, গল্‌ফ ক্লাবে। এরই সঙ্গে ম্লান হতে লাগল বীমা ব্যবসায়, যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নলিনীরঞ্জন সরকার। বাঙালী পুঁজির অভাবে কেমিক্যাল ও ফারমাসিউটিকাল কোম্পানিগুলিও নষ্ট হতে শুরু করে। এর সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হতে শুরু করল সুতো ও কাপড়ের কল, মাঝারি-ও ছোট আকারের এঞ্জিনিয়ারিং, চিনেমাটির বাসনের কারখানা। ডাঃ বি-সি রায়

যতদিন বেঁচে ছিলেন বাঙালীর উদ্যম জিইয়ে রাখার খুবই চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই, বিশেষত গত পনেরো বছরে, রাজনৈতিক দালালদের সাহায্যে বাঙালী-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রথমে মালিকানা বদল করিয়ে, ভাঙার মহড়া চলল, এবং এখনও চলছে।

আরেকদিকে ভাঙনের কোপ পড়ল। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি আর কলকাতার মধ্যে শিল্পোদ্যমের যোগাযোগ যত না থাক, শিক্ষা, পেশা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ ওতপ্রোতভাবে ছিল। সহসা লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা সারা পশ্চিমবঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢোকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে মফঃস্বল শহরগুলি চালু অবস্থায় রাখাও দুষ্কর হল। ফলে কলকাতার সঙ্গে আদানপ্রদানের সূত্র শিথিল হওয়ায় মফস্বল শহরের শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি ও পেশাগত মর্যাদাও মলিন হতে শুরু করল। এর পরিণাম দেখি মফঃস্বলের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির দুরবস্থায়। কেবল তাই নয়। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে কলকাতার সাংস্কৃতিক লেনদেন তো কমেইছে, সামাজিক লেনদেন, যেমন বিবাহাদি, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কমে গেছে মনে হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও জেলাস্থিত নেতাদের প্রতিপত্তি কলকাতাস্থ নেতাদের তুলনায় কেমন যেন গৌণ হয়ে গেছে। মফঃস্বল সম্বন্ধে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের উৎসাহ ও ঔৎসুক্যও বিস্তর কমে গেছে। কলকাতাবাসীর কাছে মফঃস্বলবাসী এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫, অর্থাৎ আটটি বছর বড় আনন্দে ও আশায় আমার কেটেছে। তবুও এই কয় বছরে বুঝতে পারলুম প্রশাসনে থাকতে থাকতে লোকে কত সংবেদনহীন ও কল্পনারহিত হতে পারে। পরের দুঃখকষ্ট বোঝার চেষ্টা, সেবা করার ইচ্ছা, সমান চোখে এক ভারতীয়র সঙ্গে আরেক ভারতীয়কে দেখা, এই আদর্শ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অনেককে অনুপ্রাণিত করে। এই নীতিই ইংরেজ রাজত্বের কঠোরতার কিছুটা উপশম করে এবং ইংরেজ শাসন দু'শ' বছর ধরে কায়েম রাখে। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ বৃটিশ অফিসারই হতেন উদ্ধত ও সংবেদনহীন, বিশেষত ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহারে। নাগরিক হিসাবে স্বতঃসিদ্ধভাবে, অথবা স্বভাবতই, কারোর কিছু প্রাপ্য ছিল না: ন্যূনতম অধিকারও ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্য হিসাবে অনিচ্ছাসহকারে বিতরিত হত। কর্তৃত্বের নিহিত তত্ত্ব ছিল রাজকীয় জাঁকজমক ও দূরত্ব রক্ষা। সব সময়ে জনসাধারণ থেকে দূরত্ব রেখে চলতে হবে, কথা বলতে হবে। কথোপকথন হবে শাসনের সুরে, আমি যাকে বলি মোটর-হর্ন গলায়

(সাবধান, মারা পড়বে !), খটখট করে উচ্চারিত ছোট ছোট শব্দে, আদেশের স্বরে : যা বলছি সেই শেষ কথা ! তোমার মঙ্গল কিসে হবে, পিতা হিসাবে আমিই সবথেকে ভাল্ জানি। ঠিক যেমন স্বরে, আজকের দিনেও উচ্চবর্ণের হিন্দু তপশীলী হিন্দু বা উপজাতির লোকের সঙ্গে কথা বলেন। স্বাধীনতার পর দেখলুম এই ধরনের মনোভাব প্রশাসনের উঁচুস্তরে যেন মজ্জায় ঢুকে গেছে। এতদিন সেটি ছিল রাজার জাতের মজ্জায়। এখন যেহেতু আমরা সবাই রাজা, সেহেতু যারই হাতে ন্যূনতম ক্ষমতা আছে তারই মজ্জায় এই-ভাব ঢুকে গেছে। এতদিন পর্যন্ত প্রশাসনের অন্তর্নিহিত দর্শন ছিল আইন নৈর্ব্যক্তিক এবং বাছবিচার করে না। সেই আইনশৃঙ্খলার দর্শনের সঙ্গে এল সমাজ-সেবা ও সার্বিক উন্নতির পরিকল্পনা। সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে থাকবে সমতার আদর্শ, সামাজিক ন্যায়পরতা, পক্ষপাত-হীনতা, উন্নতিমূলক কার্যসূচীর অনুসরণ। এর মূলে প্রয়োজন নতুন ধরনের ঢেলে-সাজা দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা। আগেকার প্রশাসনের মূল নীতি ছিল অধীন দেশে আইন ও শৃঙ্খলা কঠোর হাতে চালু রাখা। স্বাধীন দেশের মূলনীতি হবে সমাজ-কল্যাণ ও সার্বিক উন্নতিসাধন, প্রত্যেককে সমান চোখে দেখা ও সমানভাবে ব্যবহার করা, যেহেতু ভোটার হিসাবে প্রত্যেকেরই প্রশাসনের কাছে সমান দাবি আছে। সরকার এই নতুন শিক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সূচির অবহেলা করলেন। যাঁদের এতদিন কাজ ছিল সবকিছু গৌণ করে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাঁদের আজ উন্নয়নসূচিতে ব্রতী করা শক্ত কাজ, বিশেষত যাঁরা এতকাল অসমান, বহু-জাতিক, বহু ভাষাভিত্তিক, বহুমাত্রিক সমাজে এতকাল বিদেশী ছাঁচে ঢালা নৈর্ব্যক্তিক শাসন অনাত্মীয় প্রভু হিসাবে চালনা করে এসেছেন।

এই ধরনের আশঙ্কা ১৯৪৭ সালে মালদায় প্রথম আমার মনে উদয় হয়। যতই দিন গেল বাড়তেই লাগল। এই আশঙ্কার সমর্থন পেলুম ১৯৫০ সালে দিল্লীর মেটকাফ হাউসে। সেটি ছিল তখন আই-এ-এস ট্রেনিং স্কুল। সেন্সাস কনফারেন্স উপলক্ষ্যে সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ট্রেনিং স্কুলে অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন পরিমল রায়। তাঁকে আমি ঢাকায় ও কলকাতায় দীপ্তিমান লেখক ও পণ্ডিত বলে জানতুম। তাঁকে জিজ্ঞেস করি পাঠ্যসূচিতে সরকার প্রশাসনিক-দর্শন শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন কোন নির্দেশ দিয়েছেন কিনা। অধ্যাপক রায় দুঃখ করে বললেন, না করেননি, পাঠ্য ও অনুশীলনের ধারা মোটামুটি পুরনো আই-সি-এস ধারাতেই আবদ্ধ আছে। আইনশৃঙ্খলার উপরেই জোর বেশী। সামাজিক পরি-বর্তন সাধন অথবা অর্থনৈতিক উন্নতির নীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন নতুন ধারার

প্রবর্তন হয়নি। উপরন্তু, নতুন আই-এ-এসরা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি-দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কীভাবে সামাজিক পরিবর্তন আনবে, সে-বিষয়ে কোন নতুন নীতি অনুসূচিত হয়নি। নতুন যে অঙ্গটি প্রবর্তিত হয়েছে সেটি 'ভারতদর্শন': সকলে মিলে একত্রে ভারতের নানা স্থানে ঘুরে উপমহাদেশের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করবে। নেহরুর 'ভারত আবিষ্কার' তার বাণী।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সংকেতও নজরে পড়ল যার মধ্যে ভবিষ্যতের লিখন আন্দাজ করা যায়। সরকার বৃটিশের পুরনো জাঁকজমকের প্রতীকগুলি মোটেই বর্জন করলেন না। জনসাধারণ থেকে দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থাই করলেন। রাষ্ট্রপতি থেকে গেলেন আগেকার রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে, প্রধানমন্ত্রী নিলেন আগেকার মুখ্য সেনাপতির সরকারি বাসগৃহ। একই নীতি অনুযায়ী নতুন যুগের গভর্নররা পুরনো গভর্নমেণ্ট হাউস দখল করে চললেন। আরো দুঃখের বিষয়, গভর্নররা হলেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব প্রতিনিধি—তাঁদের চোখ, কান, হাত। রাজ্যের অধিবাসীর কাছে তাঁদের আনুগত্য নয়। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছায়, তাঁর আদেশে এক কলমের খোঁচায় তিনি নির্বাচিত রাজ্যমন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করতে পারেন, এমন-কি নিজেই পারেন। আমেলবদ্ধ বা ফেডরল গণতন্ত্র হিসাবে ঘোষিত হলেও ভারত মূলত থেকে গেল কেন্দ্রীয় শাসনাধীন, রাজ্যগুলি থাকল কেন্দ্রের ইচ্ছাধীন হয়ে। সংবিধাননির্মাতারা হয়তো ভারতে বৃটিশ-শাসনের পরিবর্তে একই রাজনৈতিক দলের সার্বভৌম আধিপত্য সারা দেশে থাকবে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তবে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে যা আমাদের মনে সবথেকে বেশী দুঃখ ও খেদ আনে, তা হচ্ছে আমাদের এই জাতপাতে, উচ্চনীচে শতধাখণ্ডিত দেশে এখনও কোনরকম সামাজিক সমতা ও সব কাজে সমভাবে একজোট হয়ে কাজ করা, চিন্তা করা, সেই পরিবেশসৃষ্টির অনুকূল বাতাবরণ একেবারেই গড়ে উঠল না। এক কথায় বলতে গেলে দারিদ্র্যরেখা বা তার নিচে যে-সব অধিবাসী বরাবর দেশে আছেন, যাঁদের অধিকাংশই অনুন্নত, তপশীলী জাতি ও উপজাতি ও নানান সংখ্যা-লঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়, তাঁদের বৃহত্তর, বিশেষ করে সচ্ছলতর সমাজের সামিল করার ব্যবস্থা বা বিধি ভালভাবে পূরণ করা তো হলই না, বরং তাঁদের যতদিন সম্ভব, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগে ও অত্যাচারে, পদানত করে রাখার চেষ্টা এখনও অব্যাহত। এঁরাই হলেন মার্ক্স যাকে বলেছিলেন উচ্চ ও সচ্ছল সমাজের পক্ষে তাদের জীবন নিংড়িয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করার কাঁচামাল, মানুষ হিসাবে যাঁদের প্রশাসনের

কাছে বিশেষ অস্তিত্বই নেই। অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অসহ্য উঁচু জন্ম ও মৃত্যুহার, অপুষ্টি, জীবিকা, প্রযুক্তি, বাসস্থান, বসন এবং যাবতীয় আধুনিক সুখসুবিধা থেকে যাদের বঞ্চিত রেখে, তাদের থেকে যত বেশী সম্ভব শ্রম, যত কম সম্ভব মজুরিতে আদায় করতে পারা যায়। এবং সেই বঞ্চনা ও মিথ্যা ঢাকার যতপ্রকার ফন্দিফিকির, দু-মুখো কথা, দুমুখো কাজ করা যায়, তার আশ্রয় নিতে দ্বিধা হয় না। 'গরীবী হাটাও' জিগির তুলে তার উদ্দেশ্যে ও কাগজে-কলমে আলাদা-রাখা টাকা যাতে উপরস্থ স্তরের কোঁচড়ে নানা ফন্দিফিকিরে আবার ফিরে আসে। এখনও দেশের অর্ধেক অধিবাসী—যাদের মধ্যে অধিকাংশই অনুন্নত, তপশীলী জাতি বা উপজাতি, বঞ্চিত, অনুন্নত ভৌগোলিক অঞ্চলের অধিবাসী—নিরক্ষর, ভগ্নস্বাস্থ্য, রোগগ্রস্ত, কর্মহীন, বাসহীন, এবং সর্বপ্রকার সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত। অথচ এই অবস্থা নিরাকরণের পক্ষে যে উপকরণগুলি একান্ত আবশ্যিক, সেগুলি যেমন সরল, তেমনি সহজসাধ্য: প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতি গ্রাম ও শহরে পরিস্রুত নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, সদ্যপ্রসূত, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, যথাবিহিত পুষ্টির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থা, মৌলিক ভূমিসংস্কার যার কৃপায় চাষী তার নিজের চাষজমি পাবে, চাষীমজুররা পাবে অধিকতর ফলনে উৎসাহ, বাসস্থান, সামাজিক উন্নতি ও উন্নত প্রযুক্তির নিয়োগে উপার্জন ও কর্মসংস্থার প্রসার। সংবেদনশীল প্রশাসন, যা হবে মূলত ভবিষ্যৎমুখী, ঐতিহ্যের নাগপাশমুক্ত, রাশিরাশি 'না'-এর নিগড়ে আবদ্ধ নয়, আধুনিক জগতের দিকে আশায় এগিয়ে চলে, পুরনো জিনিস নতুনভাবে করায় আগ্রহী হবে। আরেকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন: এ-সবই সম্ভবপর আমাদের মত গরীব, সীমাবদ্ধ সামর্থ্যে ও অর্থসঙ্গতিতে। ১৯৫৫ সালে বর্ধমানের অসহায় নারীশিশুদের ক্যাম্পে যা মাত্র কয়েকদিনে তাঁরা সম্ভব করেছিলেন, তার কথা যখন ভাবি, তখন ক্ষোভ ও উষ্মা আরো বাড়ে।

এই সব চিন্তা বা কার্যপদ্ধতি এখনও সুদূরপরাহত। তার পরিবর্তে এল অনুন্নত তপশীলী জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু, ভৌগোলিক অনুন্নত অঞ্চলের জন্য বিচিত্র সব সংরক্ষণ-নীতি। এই ধরনে সংরক্ষিত প্রতি গোষ্ঠী যেন অনির্দিষ্টকালের জন্য মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, সামিল না হয়ে যায়, ফলে দুর্নীতি ও পার্থক্য, ও বিভেদভাব সঞ্জীবিত থাকে। অধিকাংশ সংরক্ষণ-নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদের অস্ত্র, অনুগত, নির্ভরশীল ঠুঁটো ভোট ব্যাংক করে রাখার কল-কাঠি, দায়বদ্ধ বেকার মজুত রাখার অস্ত্র। যতদিন কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতৃত্ব ছিল, ততদিন এর কুফলগুলি প্রকট হয়নি। যতই কংগ্রেসের আধিপত্য ম্লান হল ততই

সংরক্ষণের খারাপ দিকগুলি সমাজে সারাগায়ে দুষ্টব্রণের মত দেখা দিল। রাজনৈতিক দলগুলি যতই নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে ভোটব্যাংকগুলিকে কুক্ষিগত করার জন্য সচেষ্ট হল, ততই এই সব গোষ্ঠীর ও অঞ্চলগুলির অবস্থা খারাপ হতে লাগল। এই হল একদিক। অন্যদিকে তেমনি শোষিত সম্প্রদায়গুলির অন্তরে আপন ঘরে রাজা হবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেল, স্বায়ত্ত-শাসনের আশায় স্থানীয় প্রশাসনকে নিজেদের অধীনে আনার জন্য স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি সোচ্চার হল। এই সংঘাত ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে, তা অনুমানসাপেক্ষ মাত্র। কেউ সঠিক বলতে পারে না।

সব কিছু বলার পরেও বলতে হয়, এহো বাহ্য। স্বাধীনতালাভের তুলনায় এ-সব কিছুই নয়। ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্টে দীনতম পুরুষ, নারী, শিশুও যেন হঠাৎ সাত ফুট লম্বা হয়ে দাঁড়াল; নেহরু যাকে বললেন, নিয়তির সঙ্গে অভিসারের আশায়। চারপাশের হাওয়া সুদ্ধ যেন হাল্কা ও মধুময় হয়ে গেল। গা থেকে শিকলগুলি যেন সব খসে খসে পড়ল। প্রত্যেকের মুখে নম্র, শান্ত, আত্মসম্মান, যার স্বাদ তারা আগে কখনও পায়নি। ঐদিন বেঁচে থাকাই হল যেন একান্ত সুখের। সমুখে বাধা-বিপত্তির অন্ত নেই জেনেও মনে এল সাহস ও গর্ব। কোন কিছু অসাধ্য মনে হল না, এমন-কি শত শত বছরের ইতিহাসের বোঝা পিঠে বয়ে যে-সমাজের শিরদাঁড়া নুয়ে গেছে তাকেও ঝাঁকিয়ে তুলে সকলের মনে হল যা-কিছু বাধা-বিপত্তিই আসুক, তাকে জয় করবই।

লেখার শেষে কেবলই মনে হচ্ছে, অহংকে ঝেড়ে ফেলা দুষ্কর। ক্রিস্টোফার ঈশারউডের কথায় নিজেকে শুধু এই বলে সান্ত্বনা দিতে পারি: 'অহং নেই ভাণ করা মিথ্যা অহমিকা, অহং আপনার প্রতিপদে সঙ্গে ঘুরছে: অহং আপনার নাকের সাইনাসের মত, তার আত্মঘোষণা হাঁচির মতই স্বাভাবিক, ঘাবড়াবার কিছু নেই।' পাঠকের পক্ষে আমার অহং এর থেকে বেশী অস্বস্তিকর হয়নি এই আশা নিয়ে শেষ করি।

পরিশিষ্ট

১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে উপর থেকে নিচে কর্তৃত্বের সিঁড়ি

১. মন্ত্রীসভা

সব কিছুর জন্য দায়ী। নীতি এবং সেটি কাজে পরিণত করা। রাজ্য বিধানসভা ও আইন কাউন্সিলের প্রতি দায়ী।



২. ক্যাবিনেট সেক্রেটারি

প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মচারি। মন্ত্রিসভারও সচিব। মন্ত্রিসভার পরামর্শক। নীতি ও রীতিবিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি মন্ত্রিসভা থেকে কাজে পরিণত করার আদেশ ও নির্দেশ তাঁর মারফৎ নিচে যাবে। বিভাগে বিভাগে কাজ ভাগ করে দেন, নিয়মানু-বর্তিতা ও অনুশাসনের উপর লক্ষ্য রাখেন। বিভিন্ন সার্ভিসের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় আনেন। বিভাগীয় কর্তাদের কর্তৃত্ব সত্ত্বেও যে-কোন বিভাগ যে-কোন অফি-সারের কাজ নিজে বিচার ও যাচাই করার ক্ষমতা আছে।



৩. বিভাগীয় সচিব

বিভাগীয়, উপবিভাগীয় সব কর্মচারি ও তাদের কাজের তদারক, নীতি, নিয়ন্ত্রণ, ও কার্যসিদ্ধি, প্রত্যেকের কাজের তদারক ও অর্থবণ্টন। কোন্ কাজ আগে বা পরে হবে নির্ণয় করেন। সারা রাজ্যময় বিভাগীয় কাজের দেখাশোনা করেন।



৪. ডিরেক্টর

বিভাগের, উপবিভাগের জন্য দায়ী। উপবিভাগের প্রকল্প কার্যকরী ও সিদ্ধির জন্য দায়ী। নতুন প্রকল্প প্রস্তাব করবেন। উপবিভাগের সদরে ও মফঃস্বলে যত কর্ম-চারি আছেন, তাঁদের কর্তব্যপালনের জবাবদিহির জন্য দায়ী।

এই চারটি স্তর রাজ্যের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে কাজ করে। সারা রাজ্যে যে-কোন

বিভাগে যে-সব কাজ হয়; তার সম্পাদন এই স্তরগুলির দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় দপ্তর-গুলির বাইরে মফঃস্বল প্রশাসনের স্তরভাগ নিচে দেয়া হল।

৫. ডিভিশনাল কমিশনার

একই ভৌগোলিক অঞ্চলে কয়েকটি জেলার উপর তাঁর দায়িত্ব। এলাকায় গড়ে পাঁচ-ছয়টি বা তার থেকে কম জেলা থাকে। ডিভিশনাল কমিশনার একদিকে রাজ্য সরকার অন্যদিকে জেলার প্রশাসন-নীতি ও প্রশাসনিক কার্যাবলীর জন্য সংযোগসূত্রের কাজ করেন। আইনশৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণে তিনি ডি-আই-জি পুলিশের সাহায্য নেন।



৬ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/কালেক্টর

জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ অফিসার। কালেক্টর হিসাবে তিনি জেলার রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা, উন্নতি-প্রকল্পগুলিতে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পরস্পর সংযোগ রাখেন। এই বিভাগীয় সংযোগরক্ষার্থে তাঁর পদের ঐতিহ্য যতটা দায়ী, বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারিদের চাকরিতে উন্নতি-অবনতির বিষয়ে তাঁর ক্ষমতা ১৯৫৫ সালেই লুপ্তপ্রায়। ১৯৫৫ সালের পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/কালেক্টরের অনেক ক্ষমতা আস্তে আস্তে খর্ব করা হয়। অথচ ঐতিহ্যক্রমে তাঁকে লোকে এখনও অনেক কিছুর জন্য দায়ী মনে করে। ১৯৫৫ সালেও এস-পির ব্যক্তিগত কাজ ও নেতৃত্বের মূল্যায়ন করে জেলা ম্যাজি-স্ট্রেটকে গোপন রিপোর্ট দিতে হত।



৭. মহকুমা অফিসার

প্রতি জেলায় কয়েকটি মহকুমা থাকে। মহকুমার ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক ঐক্য কিছুটা থাকে। সাব-ডিভিশনাল অফিসার আইনশৃঙ্খলার ও দেশগঠনের প্রকল্প-গুলির তদারক করতেন। এই কর্তৃত্বের পিছনে থাকে অলিখিত কর্তৃত্ব। ১৯৫৫ সালের পর এই কর্তৃত্ব অনেক কমে গিয়েছে।



৮. থানা: মহকুমার অংশ

কয়েকটি থানা মিলিয়ে মহকুমা। থানায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি হন

সার্কল্ অফিসার। ১৯৫৫ সালে সার্কল্ অফিসার ছিলেন সব উন্নতিমূলক প্রকল্পের তদারক।



৯. ইউনিয়ন বোর্ড

থানার একটি অংশ। বোর্ডের সভ্যরা জনগণের নির্বাচিত। স্থানীয় ট্যাক্স ও শুল্ক তোলার অধিকার ছিল। নিজস্ব দপ্তর ছিল। তাছাড়া ছিল এলাকার কাজকর্ম করার জন্য চৌকিদার ও দফাদার, যারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় পুলিশ ও থানার কাছেও দায়ী থাকত। তারাই ছিল পুলিশ ও প্রশাসনের সংযোগসূত্র।

পাদটীকা :

১. এখনকার বাংলাদেশে আগেকার মহকুমাগুলি সব জেলাপদে উন্নীত হয়েছে, থানাগুলি হয়েছে মহকুমা। যেমন ১৯৪৪ সালে, এমন-কি ১৯৭৫ সালেও মুন্সীগঞ্জ ছিল মহকুমা, এখন সেটি জেলা। আগেকার লৌহজঙ্গ থানা যেমন এখনকার উপজেলা।

২. অবিভক্ত বঙ্গে, এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সব বিভাগের অফিসারদের উপর অনুশাসন ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন, তাঁদের সকলের সারাবছরের কাজের গোপন পর্যালোচনা করে লিখিত রিপোর্ট দিয়ে; যার উপর যে-কোন অফিসারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করত। এই ক্ষমতার অনেকখানি এখন অপসারিত হয়েছে।

৩. এই মন্তব্যগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আক্ষরিক হিসাবে নেয়া উচিত হবে না। প্রতি স্তরে কর্তৃত্বের ওজন নির্ভর করত বিশেষ অফিসারের ব্যক্তিত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতার সুনামের উপর।

নির্দেশিকা

* লালমোহন ঘোষ হবে।

—